রকিব হাসান
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম-৬
কিশোর
থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী
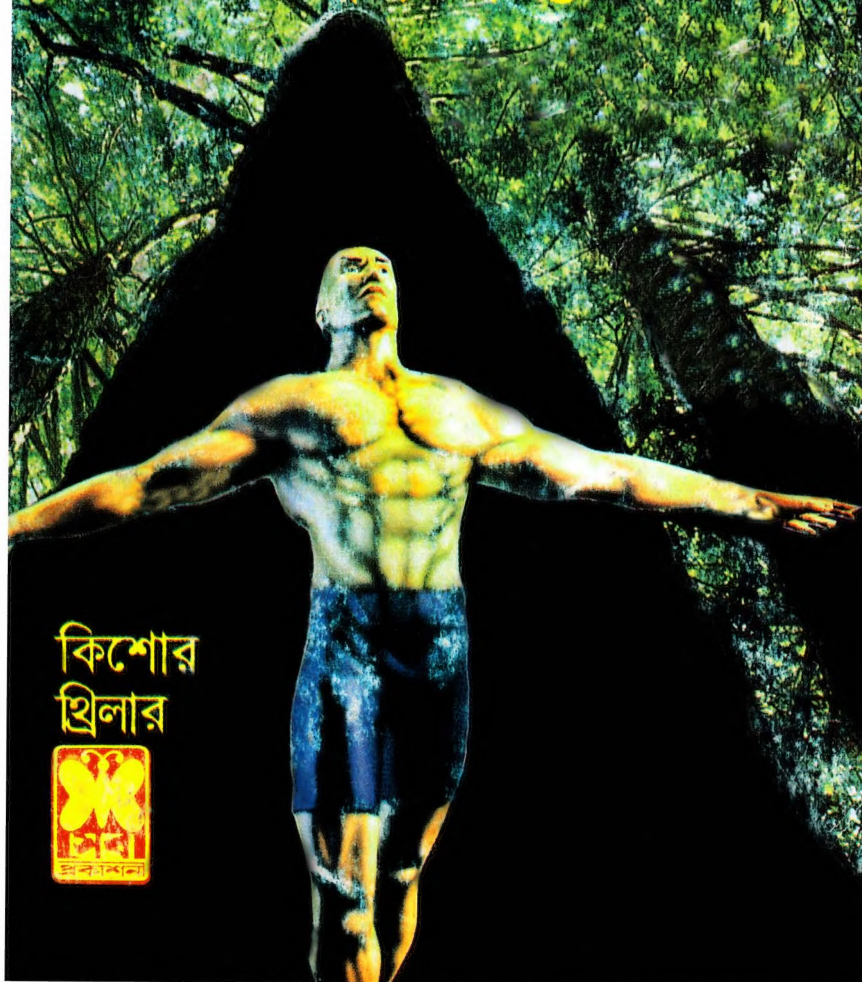
ভলিউম ৬

তিন গোয়েন্দা

২৮, ২৯, ৩০

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
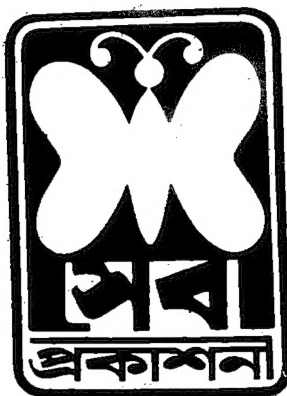
ISBN 984-16-1229-1
প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল, ১৯৯২
দ্বিতীয় মুদ্রণঃ আগস্ট, ১৯৯৪
প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান
মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-6
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

আটত্রিশ টাকা

মহাবিপদ

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ১৯৮৯

লাউড স্পীকারে শোনা গেল এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠঃ লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন, প্লীজ। সীট বেল্ট বাঁধুন। মারটিনিক উপকূলের ওপর দিয়ে উড়ছি এখন আমরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ল্যামেনটিন ইনটারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করবো।

'হউফ!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো জিনা। 'অবশেষে এলাম। রাফি নিশ্চয় খিদেয় মরছে।'

পোর্টহোলের কাচে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে মুসা। নিচের সুন্দর সবুজ দ্বীপটা দেখছে। ঝকঝকে শাদা সৈকত। 'খিদে, না?' নাক সরালো না সে। 'ভালো বলেছো। তিনটে বাজে । আমারও পেটে মোচড় দিচ্ছে।'

জিনা বললো, 'তাহলেই বোঝো। ওর তো তোমার চেয়ে খিদে বেশি।'

বকের মতো গলা বাড়িয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন।

'নামছি,' বললো কিশোর।

রানওয়েতে চাকা ছুঁতে থরথর করে কেঁপে উঠলো প্লেন। ট্যাক্সিইং করে ছুটলো।

বিমানযাত্রীদের জন্যে এটা বিশেষ উত্তেজনার মুহূর্ত! তিন গোয়েন্দা আর জিনার জন্যে তো আরও বেশি। জিনার বাবা, বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার হ্যারিসন পারকার এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন এই ওয়েস্ট ইনডিজের দ্বীপ মারটিনিকে। আপনভোলা বদমেজাজী মানুষটাকে সামলে রাখতে সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী। স্কুলের লাস্ট টারমিনাল পরীক্ষায় খুবই ভালো রেজাল্ট করেছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। সেটার পুরস্কার হিসেবেই তাদেরকে এখানে বেড়াতে নিয়ে এসেছেন মিস্টার পারকার। স্কুল এখন বন্ধ, ঈস্টার হলিডে।

'দেখার অনেক কিছু আছে এখানে,' বললেন মিস্টার পারকার, 'শেখার আছে। আমরা উঠবো আমার পুরনো বন্ধু ডক্টর জারনিম্যান ফেবারের বাড়িতে। টারটেন-এর নাম শুনেছো? উপকূলের কাছে ছোট্ট একটা ফিশিং টাউন। সেখানে মস্ত এক ভিলা আছে ডাক্তারের। হোটেলেই উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তার আর তার স্ত্রী চিঠিতে অনেক করে বলেছে, যেন তাদের ওখানে উঠি।'

তিনি জানালেন, মারটিনিকের বেশির ভাগ লোকই ফরাসী-ভাষী।

'ভালোই হবে,' কিশোর বললো। 'সামান্য ফরাসী যা শিখেছি, সেটা প্র্যাকটিস করতে পারবো এখানে।'

'অতো সোজা ভেবো না,' বললেন তিনি। 'এখানকার ভাষার সঙ্গে আসল ফরাসী ভাষায় তফাত আছে। ফরাসীর সঙ্গে আফ্রিকান কিছু শব্দ মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে একটা নতুন ভাষা, এর নাম ক্রেওলি। তবে চেষ্টা করতে পারো। আরেকটা নতুন ভাষা শিখতে পারলে তো ভালোই।'

'কিন্তু ডক্টর ফেবার ওখানে বাড়ি করতে গেলেন কেন?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'আরও অনেক দ্বীপ আছে ওয়েস্ট ইনডিজে। ইংরেজি ভাষা চালু আছে ওরকম একটা দ্বীপে থাকতে পারতেন। আমি হলে তেমন কোথাওই থাকতাম। শুনেছি ওসব জায়গায় খুব ভালো ক্রিকেট খেলা হয়।'

'যার যেটা হবি,' ফোড়ন কাটলো জিনা।

'ডাক্তারের ব্যাপারটাও অনেকটা তাই,' বললেন মিস্টার পারকার। 'মারটিনিকে কয়েক পুরুষ ধরে আছে ওরা। বাবার কাছ থেকে বাড়িটা পেয়েছে সে। তবে ওখানে থাকার আসল কারণ, আমার যা মনে হয়, তার কাজের সুবিধে। সেটা তোমরা গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, কেন থাকে।'

জিনার বাবার শেষ কথাটায় কৌতূহল বাড়লো ছেলেদের।

'একটা কথা বলতে কিন্তু ভুলে গেছে তোমাদের আংকেল,' হেসে বললেন মিসেস পারকার। 'ডাক্তারের ল্যাবরেটরিতে যেসব লোক কাজ করে, তারা এসেছে ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইনডিজ থেকে, তারমানে ইংরেজি-ভাষী। তাদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' সায় জানালেন মিস্টার পারকার। 'আর জারনির ছেলেটাকেও তোমাদের ভালো লাগবে। কি যেন নাম…কি যেন,…হ্যাঁ, ডেভিড। বয়েস উনিশ-টুনিশ হবে, তোমাদের চেয়ে বড়। তবে বন্ধু হতে কোনো অসুবিধে নেই। দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে তোমাদের।'

'খুব ভালো হবে তাহলে,' বললো রবিন। 'দ্বীপটা দেখার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। বইয়ে পড়েছি…'

কথা শেষ হলো না তার। প্লেন থেমে গেছে। দরজা খুললো। উঠে দাঁড়াচ্ছে যাত্রীরা।

প্লেন থেকে নামলো ওরা। মালপত্র, আর অবশ্যই রাফিয়ানকে বের করে নিয়ে এগোলো। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের বাইরে এসে দাঁড়ালো। একধারে বিশাল ফুলের বাগান। ফুলের রঙ যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সুগন্ধ। তাজা বাতাসের সঙ্গে বুক-ভরে টেনে নিলো সেই সুবাস।

'জারনি বলেছিলো, আমাদেরকে নিতে কাউকে পাঠাবে,' এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন মিস্টার পারকার। 'কই?'

লম্বা, সুন্দর করে ছাঁটা চুল, এক তরুণকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মুখে হাসি। কাছে এসে বললো, 'আপনি নিশ্চয় হ্যারি আংকেল। আর আপনি, কেরোলিন আন্টি।' জিনার বাবা-মার সঙ্গে হাত মেলালো সে। 'আমি ডেভিড। সরি, দেরি হয়ে গেল আসতে। ফোর্ট ডা ফ্রান্সে গিয়েছিলাম, বাবা বলে দিয়েছিলো যেতে। আসুন। গাড়ি ওদিকে।'

হাশিখুশি ছেলেটাকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। এমনকি খুঁতখুঁতে স্বভাবের জিনাও ডেভিডের কোনো দোষ ধরতে পারলো না। মিসেস পারকারের হাতের ব্যাগটা জোর করে নিয়ে নিলো ডেভিড। ছেলেদের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি নিশ্চয় জরজিনা পারকার। আর তুমি কিশোর পাশা…মুসা আমান… রবিন মিলফোর্ড, ঠিক বলেছি না?' জবাবের অপেক্ষা না করেই কুকুরটার দিকে ফিরলো। 'আর তুই রাফিয়ান দি গ্রেট। আংকেলের পাঠানো ছবিতে তোকেও দেখলাম। রাফি, সত্যি বলছি, ছবির চেয়ে তোর আসল চেহারা অনেক সুন্দর।'

'হুফ!' গম্ভীর হয়ে প্রশংসার জবাব দিলো রাফিয়ান।

হেসে ফেললো তিন গোয়েন্দা।

'ঠিকই বলেছেন,' জিনা বললো। 'দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর কুকুর ও, সবচেয়ে ভালো।'

ফেবারের গাড়িটা মস্তবড়। ভেতরে অনেক জায়গা। আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়।

মেন রোড ধরে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে মোড় নিয়ে একটা শাখাপথে নামলো গাড়ি। 'ক্যারাভেল উপদ্বীপের ধার দিয়ে যাবো আমরা এখন। দেখলে মনে হয়, আটলানটিকের বুকে যেন জোর করে জায়গা করে নিয়েছে উপদ্বীপটা। নেচার রিজার্ভ। আমাদের বাড়িটা শহরের বাইরে, টারটেন থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। আর বাবার ল্যাবরেটরি আরও পাঁচ কিলোমিটার দূরে, উপদ্বীপের একেবারে কিনারে। দেখছো, ডানে-বাঁয়ে দু'দিকেই সাগর। সুন্দর না?'

দৃশ্যটা সত্যি সুন্দর। মোহিত হয়ে পড়েছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

'আপনারা ভাগ্যবান!' কিশোর বললো। 'এতো সুন্দর একটা দ্বীপে থাকেন!'

'অস্বীকার করবো না,' হেসে বললো ডেভিড। 'তবে কিছুদিনের জন্যে তোমরাও ভাগ্যবান হলে। এখানে যা যা দেখার আছে, ঘুরে ঘুরে সব দেখাবো তোমাদেরকে।'

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আছে রবিনের মনে। মুখ খুলতে যাবে, এই সময় কথা শুরু করলেন মিস্টার পারকার। ডেভিডকে প্রশ্ন করে তার বাবার বর্তমান কাজের খবরাখবর

নিতে লাগলেন। ছেলেদেরকে জানালেন, অনেক বড় বিজ্ঞানী ডক্টর জারনিম্যান ফেবার। পিট-ভাইপার সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা করছেন। আমেরিকা আর ওয়েস্ট ইনডিজে পাওয়া যায় ওই সাপ। ডাক্তার ফেবারের বিশ্বাস, ওই সাপের বিষ থেকে তৈরি ওষুধে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা হতে পারে।

ছেলেরা আরও জানলো, ফেবারের পূর্বপুরুষেরা খুব ধনী ছিলেন। সেই সম্পত্তি আর টাকা পেয়ে ফেবার নিজেও ধনী। বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার জন্যে নগদ টাকা খরচ করছেন দুহাতে। তাছাড়া নামকরা এক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছেন, তারাই তৈরি করে দিয়েছে ল্যাবরেটরিটা। অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজানো গবেষণাগার।

মিস্টার পারকার থামলে ডেভিড বললো, 'ইদানীং বাবার গবেষণায় বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। কোনো কাজেই তাড়াহুড়ো করতে চায় না বাবা, সেটা ঠিক। কিন্তু এখন একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। কাজের অসুবিধে হচ্ছে সেজন্যে।'

'গোলমাল?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার পারকার। 'কি গোলমাল?'

ডেভিড বললো, 'গোলমালটা কিছুদিন থেকেই চলছে। তবে দিন দুয়েক আগে একটা বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। চোর ঢুকেছিলো বাবার স্টাডিতে। তার গোপন ফরমুলাগুলো যে আলমারিতে আছে সেটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলো চোর। আজ সে-জন্যেই ফোর্ট ডা ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে, তদন্তের কদ্দূর কি হলো? ওখানকার চীফ পুলিশ কমিশেয়ার বাবার বন্ধু। ...ওই যে, আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সব কথা বাবাই বলবেন আপনাকে।'

গেট দিয়ে ঢুকলো গাড়ি। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে চারদিক। হিবিসকাস আর বেগুনী বুগেনভিলিয়াই বেশি। সুন্দর বাড়িটাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে ফুলের ঝাড়। মুগ্ধ চোখে দেখছে ছেলেরা।

পিতলের প্লেটে বাড়িটার নাম খোদাই করা হয়েছেঃ ফ্লাওয়ার ভিলা।

'পুষ্প মঞ্জিল!' বাংলায় বিড়বিড় করলো কিশোর। 'ফুলের বনে ভোমরা আসার কথা, তা না এসে চোর!'

'এই, কি বিড়বিড় করছো?' কনুই দিয়ে বন্ধুর পাঁজরে গুঁতো দিলো মুসা।

'অ্যাঁ!' চমক ভাঙলো যেন গোয়েন্দাপ্রধানের। 'না, বলছিলাম কি, এখানে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা রহস্য পেয়ে গেলাম।'

শব্দ করে হাসলো ডেভিড। 'সেই পুরনো প্রবাদঃ গোয়েন্দা যেখানে যায়, রহস্য সেখানে ধায়। কে জানে, এই রহস্য সমাধানে হয়তো সাহায্য করতে পারবে তোমরা।...ওই যে, মা।'

গাড়ি থেকে নামলো মেহমানেরা। ডেভিড নেমে ঘুরে এগোলো বুটের দিকে।

সুটকেসগুলো বের করবে। তার মতোই হাসখুশি একজন মহিলা এগিয়ে এলেন। ছেলে আর মায়ের চেহারার অনেক মিল আছে।

'এসেছেন তাহলে!' হেসে মিসেস পারকারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস ফেবার। অন্যদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা নোয়ালেন। 'আসুন, ঘরে আসুন। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি খাবার ব্যবস্থা করছি।'

হাত-মুখ ধুয়ে এসে ছড়ানো বারান্দায় বসলো মেহমানেরা।

ট্রে-ভরতি খাবার নিয়ে এলো এক তরুণী পরিচারিকা। নাম শেলি। সুন্দরীই বলা চলে তাকে। বাদামী চামড়া। মনিবানীর মতোই তার মুখেও হাসি লেগে আছে। ট্রে-টা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

খাবার খুব পছন্দ হলো ছেলেদের। বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল, আর পেয়ারার রসের বরফ-শীতল শরবত।

খাওয়া-দাওয়ার পর মেহমানদের থাকার ঘর দেখিয়ে দিলেন মিসেস ফেবার। ছেলে-মেয়েদের জন্যে দুটো ঘর—একটাতে থাকবে তিন গোয়েন্দা, আরেকটাতে জিনা—দুটোই সাগরের দিকে মুখ করা। দেখে খুব খুশি ওরা।

বেলা আর বেশি বাকি নেই। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। 'পুষ্প মঞ্জিলের' পেছনের পাহাড়টার গোড়ায় বেগুনী ছায়া।

'এখানে সারা বছরই ছ'টার সময় সূর্য ডোবে,' ডেভিড জানালো। 'গরমকালেও, শীতকালেও। আর গোধূলি খুব অল্পক্ষণ, তোমাদের লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো দীর্ঘ নয়।'

এই সময় এঞ্জিনের শব্দ হলো। ডক্টর ফেবার ল্যাবরেটরি থেকে ফিরেছেন। তাঁর নিজের একটা ছোট গাড়ি আছে। বড়টা ব্যবহার করে পরিবারের অন্যেরা।

মেহমানদের দেখে খুব খুশি হলেন ফেবার।

'এসেছো তাহলে,' মিস্টার পারকারের হাত ধরে বললেন তিনি। 'কাল তোমাকে আমার ল্যাবরেটরি দেখাতে নিয়ে যাবো।'

চা খেতে খেতে আলোচনা চললো।

চোরের কথা উঠলো।

বড়দের আলোচনায় যোগ দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। শেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো, 'ডেভিড আমাদেরকে বলেছে, স্যার। আপনার স্টাডিতে ঢুকে নাকি আলমারি খোলার চেষ্টা করেছিলো।'

অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকালেন ফেবার, ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে। 'ওহ্-হো, ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোমরা গোয়েন্দা। হ্যারি চিঠিতে সব লিখেছে, অনেক রহস্যের সমাধান নাকি করেছো তোমরা, যেগুলো পুলিশকেও অনেক ভুগিয়েছে। ভালো, খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, স্যার, কয়েকবার ভাগ্য আমাদেরকে সহায়তা করেছে বটে,' বিনয়ের অবতার সাজলো কিশোর। বড়দের কাছে ছোট সাজার চেষ্টা করে না কিশোর, বড়দের মতো করেই কথা বলে। এটা অনেক 'বড়ই' সইতে পারেন না।

ডক্টর ফেবার তেমন লোক নন। বললেন, 'এবার তোমাদেরকে নিরাশ হতে হবে। ঘরে চোর ঢুকেছিলো বটে, তবে এতে কোনো রহস্য নেই।'

'তারমানে, বলতে চাইছেন চোর আপনার চেনা?'

'তা বলতে পারো। পুলিশকে অবশ্য এভাবে খোলাখুলি বলিনি, শুধু সন্দেহের কথা জানিয়েছি। জোর দিয়ে বলতে পারিনি, কারণ প্রমাণ করতে পারবো না।'

'খুলে বল তো, জারনি,' অনুরোধ করলেন মিস্টার পারকার। 'যদি কোনো অসুবিধে না থাকে...'

'না না, অসুবিধে নেই। শোনো...'

দুই

'আমার গবেষণার বেশির ভাগ কাগজপত্রই ল্যাবরেটরির আলমারিতে রাখি,' বললেন ডক্টর ফেবার। 'তবে এখন যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছি, তার কাগজগুলো যেখানেই যাই সাথে রাখি। পরশুদিন ওগুলো বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। রাতে খাওয়ার পর ওগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে, কয়েকটা নোট নিয়ে সব কাগজ ভরে রাখি আলমারিতে। কাল সকালে শেলির চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙলো। আমার স্টাডির জানালার কাচ ভাঙা দেখে শোরগোল করেছে সে। গিয়ে দেখে বুঝলাম, বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে এসেছিলো চোর, জানালার কাচ ভেঙে ঘরে ঢুকেছিলো। আলমারিতে আঁচড় দেখে বোঝা গেল, খোলার চেষ্টা করেছিলো, তবে খুলতে পারেনি। দেয়াল-আলমারি ওটা তালাও বেশ মজবুত। হাতুড়ি আর ছেনি ছাড়া ভাঙতে পারবে না। তাতে অনেক সময় লাগবে, আর বিকট শব্দ হবে,' থামলেন তিনি।

'তারমানে খালি হাতে ফিরে গেছে চোর?' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ। তবে আমার বিশ্বাস আবার আসবে। এখানেও চেষ্টা করবে, ল্যাবরেটরিতেও।'

'কাকে যেন সন্দেহ করেছো বললে?' মনে করিয়ে দিলেন মিস্টার পারকার।

'হ্যাঁ। অনেক দেশের অনেক ল্যাবরেটরি আছে, আমার গবেষণার ফলাফল হাতে পেলে লুফে নেবে। কোনো জিনিসের চাহিদা থাকলে সেটা চুরি করার লোকের অভাব হয় না। এই দ্বীপে আমার বড় শত্রু এখন একজনই আছে, ডক্টর ভয়ট। লোকটা

কোনদেশী কেউ জানে না। খারাপ লোক। কারও মুখে তার বদনাম ছাড়া সুনাম শুনিনি।'

গভীর আগ্রহে শুনছে ছেলেরা।

'আপনার ফরমুলা কি ডক্টর ভয়টই চুরি করতে চেয়েছিলো?' প্রশ্ন করলো জিনা। 'নাকি লোক দিয়ে করাতে চেয়েছিলো? নিশ্চয় ওই ফরমুলা খুবই মূল্যবান?'

'সে-ও আসতে পারে, কিংবা অন্য কাউকেও পাঠিয়ে থাকতে পারে,' জবাব দিলেন ফেবার। 'ভয়টের পক্ষে সবই সম্ভব। হ্যাঁ, ফরমুলাটা মূল্যবান। কাজ এখনও শেষ করতে পারিনি, তবে বুঝে গেছি ঠিক পথেই এগোচ্ছি। এখনই ওই ফরমুলার ওষুধ বানানো যাবে, তবে সেটা কতোখানি সফল ওষুধ হবে জানি না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হতে পারে। তাতে রোগীর ভালো না হয়ে বরং খারাপই হবে।'

ইনটারেসটিং ব্যাপার। আরও শুনতে ইচ্ছে করছে ছেলেদের। কিন্তু সারাদিন ভ্রমণের ধকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শরীর, বিশ্রাম চায়। চোখ বুজে আসছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। সারারাত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রইলো। সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙলো কিশোরের। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। সে ডাকলো, 'রবিন...মুসা, ওঠো। উঠে পড়ো।'

রবিন সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লো। কিন্তু মুসাকে তুলতে আরও কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করতে হলো।

জিনাও উঠে পড়েছে।

হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে ডাইনিং রুমে এসে দেখলো ডেভিড ওদের জন্যে বসে আছে। নাস্তা আনতে বলা হলো। ট্রে নিয়ে এলো শেলি। মুখে হাসি। খাবারগুলো নামিয়ে সাজিয়ে দিলো টেবিলে। পেয়ারার রস, সদ্য গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা তাজা আনারস, পেঁপে, মাখন, রুটি, পেঁপের জেলি আর কফি। রুটি-মাখনের চেয়ে ফল খেতেই বেশি ভালো লাগলো ছেলেদের।

'হ্যারি আংকেলকে নিয়ে বাবা যাবে ল্যাবরেটরিতে,' ডেভিড জানালো। 'মা যাবে কেরি আনটিকে নিয়ে বাজারে। আমরা ঘুরতে যেতে পারি।'

'হুফ!' সবার আগে সায় জানালো রাফিয়ান। বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনলেই কি করে জানি বুঝে যায়!

'আমারও একটা ব্যক্তিগত গাড়ি আছে, ছোট,' বললো ডেভিড। 'আমার উনিশতম জন্মদিনে বাবা প্রেজেন্ট করেছে। গাদাগাদি হয়ে যাবে অবশ্য, তবে জায়গা হবে আমাদের সকলের। আমার কলেজ ছুটি। তোমাদেরকে কয়েকদিন অঢেল সময় দিতে পারবো।'

খুব খুশি হলো ছেলেরা।

'পড়ালেখা শেষ করে কি করবেন, ভেবেছেন?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'বাবার মতোই বিজ্ঞানের গবেষণা করবো।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললো কিশোর, 'ডক্টর ভয়টের ব্যাপারে কি কি জানেন?'

'ডক্টর ভয়ট? বাজে লোক। বাবাকে এসে ধরেছিলো, তার ফরমুলা বিক্রি করে দিতে। কিংবা ভয়টকে তার পার্টনার করে নিতে। দুঃসাহস আছে লোকটার। বাবা শুধু গলা ধাক্কা দিয়ে বের করতে বাকি রেখেছে। মনে হয় মাথায় ছিটও আছে লোকটার। আমার তো ধারণা, ডক্টর খেতাবটাও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় দেয়নি তাকে, নিজের নামের সঙ্গে নিজেই জুড়ে নিয়েছে। গবেষণার উন্নতি হলে মানুষের উপকার হবে, সে-ব্যাপারে মোটেও ভাবে না সে, খালি ভাবে টাকার কথা, অনেক টাকা।'

'আপনার বাবা যে ভাবছেন, ডক্টর ভয়টই চুরি করতে এসেছিলো, সন্দেহটা অমূলক নয় তাহলে?'

'নিশ্চয়ই না। ফরমুলার ব্যাপারে আগ্রহী, এমন কেউই ওই সেফ খুলতে আসবে। সাধারণ চোর নয়। কারণ ওই আলমারিতে টাকা পয়সা কিংবা সোনাদানা নেই। ছোট জায়গা এটা। এখানে কার বাড়িতে কোথায় কি আছে না আছে, সবাই সবারটা জানে। বাবার আলমারিতে কি থাকে, এটাও লোকের অজানা নয়। আমাদের বাড়ির অন্য ঘরগুলোতেও মূল্যবান তেমন কিছু নেই যার জন্যে চোরের উপদ্রব হবে। গহনা-টহনা খুব একটা পরে না মা। নগদ টাকাও থাকে না বাড়িতে। যখন যা দরকার, ব্যাংক থেকে তুলে আনা হয়। দোকানের বিল মেটানো হয় চেক দিয়ে। একমাত্র মূল্যবান জিনিস বাবার ওই ফরমুলা। সেটা সাধারণ চোরের কাছে মূল্যবান হবে না। কাজেই চোর ভয়ট ছাড়া আর কে?'

'লোকটা তাহলে আপনাদের জন্যে একটা থ্রেট?'

'হ্যাঁ। ওকে জেলে ভরারও কোনো উপায় দেখছি না। প্রমাণ করা যাবে না যে সেই ঢুকেছিলো।'

'ব্যাটাকে হাতেনাতে ধরতে পারলে কাজ হতো,' আস্ত একটা পেঁপে আর গোটা দুই আনারস শেষ করেছে মুসা। গঁউক করে ঢেকুর তুললো।

'মারতেন নাকি?' হেসে বললো জিনা।

'দু'চারটা কিল কি আর লাগাতাম না,' পেঁপের জেলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকালো গোয়েন্দা-সহকারী। পেট বোঝাই করে ফেলেছে। জেলির লোভ আপাতত ছেড়ে দেবে কিনা ভাবছে।

'ধরে ফেলতেও পারি!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর।

'তাহলে ভয়ট মিয়ার কপালে সত্যি দুঃখ আছে,' সেই আনন্দের মুহূর্তটার কথা

ভেবেই যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো মুসা, জেলিকে রেহাই দেয়া যাবে না। টেনে নিলো বাটিটা।

সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসলো ডেভিড। মাথা নেড়ে কিশোরকে বললো, 'এতো আশা করো না। ভয়ট বোকা নয়। হুঁশিয়ার আদমী। সবসময় সঙ্গে দু'জন বডিগার্ড রাখে। একটা বিশালদেহী, দেখে হেভিওয়েট ফাইটারের মতো লাগে। আরেকটাকে দেখে তেমন চোখে লাগে না, কিন্তু নাম্বার ওয়ান শয়তান। ভীষণ চালাক। ভয়টের মতো লোকের শত্রুর অভাব হয় না, তাই বডিগার্ড লাগে তার।'

'পুলিশ কিছু বলে না?'

'আইন অমান্য না করলে পুলিশ কি বলবে? আর তাকে হাজতে ভরতে হলে প্রমাণ লাগবে তো। পুলিশ এখনও কিছু পায়নি।'

'হুঁ, ধড়িবাজ লোক মনে হচ্ছে,' নিচের ঠোঁটে আরেকবার চিমটি কেটে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'রহস্য না পেলেও অ্যাডভেঞ্চার...' বাক্যটা শেষ করলো না সে।

গাড়ি বের করলো ডেভিড। সামনের সীটে তার পাশে বসলো জিনা আর রাফিয়ান। তিন গোয়েন্দা বসলো পেছনে। ঠাসাঠাসি হয়ে গেল একেবারে।

'উপদ্বীপের শেষ মাথায় ডেভিলস পয়েন্টে যাবো আগে,' ডেভিড বললো। 'রাস্তা তেমন ভালো না। তবে ওখানে গিয়ে খুশি হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর। বাবার ল্যাবরেটরিও ওখানে।'

পথ খারাপ, তবে দু'ধারের দৃশ্য চমৎকার, ঠিকই বলেছে ডেভিড। যেতে যেতে কথা বললো সে, দ্বীপটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানালো। হাত তুলে দেখিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, 'ওটা কি? ওই যে, ধ্বংসস্তূপটা?'

'ও, ওটা ডুবুচ ক্যাসল,' ডেভিড জানালো। 'নিয়ে যাবো একদিন। বদনাম আছে জায়গাটার। দেখে কিন্তু দুর্গের মতো লাগে না। ওটার যারা মালিক ছিলো, খুব নাকি বাজে লোক ছিলো। দাস-ব্যবসায়ী। মাটির তলায় বদ্ধ ঘর আছে অনেকগুলো, ওখানে গোলামদের বন্দি করে রাখতো।...ওই যে, এসে পড়েছি।'

রাস্তা থেকে মোড় নিয়ে কংক্রিটের আরেকটা সরু পথে উঠলো ডেভিডের লাল গাড়ি। পথের শেষ মাথায় একটা শাদা রঙের বাড়ি। বড় বড় জানালার কাচে রোদ চমকাচ্ছে।

'ডেভিলস পয়েন্ট, এবং ল্যাবরেটরি,' ঘোষণা করলো যেন ডেভিড। গাড়ি থামালো।

নামলো সবাই।

ডেভিডের পিছু পিছু বিল্ডিংটায় ঢুকলো ছেলেরা। ঘরগুলো খুব সুন্দর। প্রথমে মস্ত একটা হলঘরে ঢুকলো ওরা। মোজাইক করা মেঝে। এয়ারকুলার ছাড়াই বাইরের চেয়ে

ঠাণ্ডা। কাচ আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছ দিয়ে সাজানো। একটা ফোয়ারাও আছে।

একজন বৃদ্ধকে দেখা গেল। কালো চামড়া, শাদা চুল, চওড়া হাসি। 'এই যে, ডেভিড, গুড মরনিং। ...এরা কারা? মেহমান?'

তিন গোয়েন্দা আর জিনার পরিচয় দিলো ডেভিড। তাদেরকে বললো, 'ওর নাম নিউট ম্যাকাফি, নিউট বললেই সবাই চেনে। অনেক বছর ধরে কাজ করছে বাবার সাথে। এই ল্যাবরেটরি বানাতে দেখেছে। এখন রাত-দিন পাহারা দেয় এখানে। খুব ভালোবাসে এই ল্যাবরেটরিটাকে।'

'বাড়িয়ে বলছো, ডেভিড,' হেসে বললো নিউট। 'তবে চাকরি যখন করছি, মন দিয়েই করবো। তোমার বাবাও সেটাই চান। ...তা এদেরকে কেন এনেছো? ল্যাবরেটরি দেখাতে?'

'হ্যাঁ। আপনিও আসুন না আমাদের সঙ্গে।'

কম বয়েসী একজনকে ডাক দিলো নিউট। হলে থাকতে বলে চললো ছেলেদের সঙ্গে, বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে।

প্রথমে ল্যাবরেটরির ভেতরটা দেখতে চাইলো কিশোর।

একটা ডিসইনফেকশন চেম্বারে ঢুকলো ওরা। সাবধানতা। ক্ষতিকারক জীবাণু নিয়ে যাতে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে না পড়ে কেউ, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

পরিশোধিত হয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলো ওরা।

অনেক বড় ঘর। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। যে কোনো বিজ্ঞান-গবেষকের গর্বের বস্তু। প্রচুর আলোবাতাসের ব্যবস্থা আছে। ছোট-বড় কাচের জারে ভরা রয়েছে খনিজ দ্রব্য, ভেষজ পদার্থ, নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য—তরল এবং কঠিন দু'রকমেরই। কয়েকটা খাঁচায় কিছু ইঁদুর আর গিনিপিগও আছে।

গভীর মনোযোগে কাজে ব্যস্ত কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী। ছেলেদের দিকে ফিরেও তাকালো না কেউ। ওদের পছন্দের কাজ, ভাবলো কিশোর। এসব দেখেই বোধহয় বিজ্ঞানী হওয়ার আগ্রহ হয়েছে ডেভিডের। তাছাড়া মানুষকে সাহায্য করার, মানুষের জীবন বাঁচানোর মধ্যে এক আলাদা আনন্দ রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে একটা দরজা খুললো ডেভিড। বললো, 'এটা হলো ভিভারিয়াম। এখানে সাপ রাখা হয়।'

এক ধরনের তীব্র আঁশটে গন্ধ ঘরের বাতাসে। গরগর করে উঠলো রাফিয়ান, চোখে ভয়।

'চুপ, রাফি!' কুকুরটার গলার বেল্টে হাত রাখলো জিনা। 'ভয়ের কিছু নেই, কামড়াবে না। চুপ!'

গর্বের সঙ্গে জানালো নিউট, সাপগুলো 'ওর'। ওগুলোকে দেখে রাখার দায়িত্ব

তার।

অনেকগুলো সাপ, বড় বড়। কাচের বাক্সে বন্দি। ওপরে তারের জালের ঢাকনা।

অবাক হয়ে সাপগুলোকে দেখছে ছেলেরা। এরকম আর দেখেনি।

'বিরাট!' বললো জিনা।

'আর চেহারা কি ভয়ংকর!' যোগ করলো মুসা।

ডেভিড হাসলো। 'জাতেও ভয়ংকর। সারাদিন মরার মতো ঘুমায়, রাতে জেগে ওঠে।'

সাপগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলো রবিন।

'বেশি কিছু জানি না,' নিউট বললো। 'পিট-ভাইপার ক্রোটালিডি গোষ্ঠীর সাপ, র‍্যাটলস্নেকও এই গোত্রে পড়ে। আমাদের এখানে দুই জাতের আছে। ওগুলোর জুলজিক্যাল নাম "বোদ্‌রোপ্‌স্‌ অ্যাটরোক্স" আর "বোদ্‌রোপ্‌স্‌ ল্যানসিওল্যাটাস"। দেড় থেকে দুই মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এখানকার আখ চাষীদেরকে জ্বালায় খুব বেশি। খেতের কোন্ জায়গায় যে কখন পড়ে থাকে, ঠিক নেই। বেখেয়াল হলেই কামড় খেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে অ্যানটিস্নেকবাইট সিরাম ইনজেকশন নিতে না পারলে নির্ঘাত মৃত্যু।'

'ইউরোপীয়ান ভাইপারের চেয়েও মারাত্মক?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। এমনকি গোখরার চেয়েও। নারভাস সেন্টার অবশ করে দেয় এদের বিষ, একই সাথে বিষাক্ত করে তোলে রক্তকেও।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'বেশি আছে নাকি এই দ্বীপে? কোনটার সামনে যে পড়ে যাই কে জানে!'

'অতো ভয়ের কিছু নেই,' বললো ডেভিড। 'বললাম না, ওরা নিশাচর। সূর্য ডোবার আগে বেরোয় না। আর মারটিনিকেও এখন খুব বেশি নেই। ওয়েস্ট ইনডিজের কিছু কিছু দ্বীপ থেকে তো প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। গবেষণার জন্যে সাপ দরকার হয় বাবার। এখান থেকেও সংগ্রহ করে, অন্যান্য দ্বীপ থেকেও।'

'সাপের মুখ থেকে বিষ বের করে কিভাবে?' জানতে চাইলো জিনা।

ডেভিড কিংবা নিউট জবাব দেয়ার আগেই পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন মিস্টার ফেবার আর জিনার বাবা।

'এই যে ছেলেরা, চলে এসেছো,' বলে উঠলেন মিস্টার ফেবার। 'সাপের মুখ থেকে কিভাবে বিষ বের করা হয় দেখতে চাও? এসো আমার সঙ্গে।'

এগিয়ে গিয়ে একটা খাঁচার ঢাকনা সরালেন তিনি। ছেলেদেরকে অবাক করে দিয়ে সাপের মতোই যেন ছোবল হানলো তাঁর ডান হাত। একটা সাপের ঘাড় চেপে ধরলেন। বের করে আনলেন খাঁচা থেকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ভীষণ রাগে ফুঁসে উঠলো সাপটা, শরীর মোচড়াতে শুরু করলো, বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে হাতে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা

করলো; পারলো না, বেশ কায়দা করে ধরেছেন বিজ্ঞানী।

তাড়াতাড়ি গিয়ে সাপটার লেজ চেপে ধরলো নিউট, যাতে বেশি নড়াচড়া করতে না পারে।

বাঁ হাতে একটা কাচের জার তুলে নিলেন মিস্টার ফেবার। জারটার মুখে পাতলা কাগজের ঢাকনা, আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে।

'জারটাকে জেলির বয়ামের মতো লাগছে,' ফিসফিস করে বললো মুসা।

কেউ তার কথার জবাব দিলো না।

জারের কাছে সাপটার মুখ নিয়ে এলেন মিস্টার ফেবার। মাথার পেছনে চোয়ালের জোড়ার কাছে ধরে বিশেষ কায়দায় চাপ দিতেই মুখ খুলে হাঁ হয়ে গেল সাপটার। বাঁকা, চোখা দুই শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়লো। জারের কাগজের ওপর চেপে ধরতেই কাগজ ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেল দাঁতের মাথা। আলতো যে চাপ লাগলো, তাতেই নির্দেশ চলে গেল মগজে, বিষথলি থেকে বিষ বেরিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে লাগলো জারের তলায়।

বিষ নেয়া শেষ করে সাপটাকে আবার রেখে দেয়া হলো খাঁচায়।

'কা-কাজটা খুব বিপজ্জনক, না?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। চেহারা সামান্য ফ্যাকাসে।

'হ্যাঁ, তা-তো কিছুটা বটেই,' জবাব দিলেন ডক্টর ফেবার। 'মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটে। সবসময় কাছাকাছি অ্যান্টিডোট রাখতে হয়। আমার বুড়ো আঙুলে একবার কামড় খেয়েছি। নিউটকে কামড়েছে তিনবার। তৃতীয়বার তো বেশ ভোগালো ওকে। কারণ এর একমাস আগের ধকলটাই পুরোপুরি কাটেনি তখনও।'

'কামড় খেতে হবে মেনে নিয়েই কাজ করি আমরা,' হাসলো বুড়ো মানুষটা। 'ফার্স্ট এইড কিট অনেক আছে এখানে, সিরামেরও অভাব নেই।'

'সিরাম থাকুক আর না থাকুক,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো মুসা, 'আমাকে ধরতে বললে আমি ধরবো না! কাছেই যাবো না।'

'এখন বলছো,' হেসে বললো রবিন, 'কিন্তু ঠেকায় পড়লে ঠিকই ধরবে। আমাজনের জঙ্গলে সেই অ্যানাকোণ্ডাটাকে যে সামলালে…আরিব্বাপরে বাপ!'

'হুফ্! হুফ!' রবিনের কথায় যেন সায় জানালো রাফিয়ান। অথচ সে আমাজনে যায়ওনি, মুসার সাপ ধরাও দেখেনি।

হেসে উঠলো সবাই।

'বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে,' বললেন ফেবার। 'ও, কয়েকটা জিনিস নিতে হবে অফিস থেকে।'

অফিসের মস্ত স্টীলের আলমারিটা দেখালেন তিনি। মূল্যবান কাগজপত্র ওটাতেই

রাখেন।

'এটা ভাঙা প্রায় অসম্ভব,' বললেন ডক্টর। 'কিন্তু ভয়টের কথা কিছুই বলা যায় না! সাবধান থাকতে হবে।'

তিন

ফিরে চলেছে দুটো গাড়ি। একটাতে দুই বিজ্ঞানী। আরেকটাতে ছেলেমেয়েরা। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে আশপাশের দৃশ্য সকালের চেয়ে সুন্দর লাগছে তাদের কাছে।

'ভাবছি, বিকেলে সাঁতার কাটতে যাবো,' ডেভিড বললো। 'এখানকার সী-বীচ খুব ভালো। পানিও চমৎকার। হাঙর নেই। অথচ ওয়েস্ট ইনডিজের অন্যান্য দ্বীপের সৈকতে হাঙরের জ্বালায় পানিতেই নামা যায় না। জ্যামাইকার কথাই ধরো। জাল দিয়ে ঘেরা আছে জায়গা, ওখানে ছাড়া নামলেই হাঙরের পেটে যেতে হবে।'

বিকেলটা চমৎকার কাটলো ওদের, সাঁতার কেটে।

পরদিন আবার ওদেরকে নিয়ে ঘুরতে বেরোলো ডেভিড। নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের জন্মস্থান দেখালো, ছোট একটা মিউজিয়ম তৈরি হয়েছে বাড়িটাতে। ফেরার পথে দ্বীপের দক্ষিণ অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলো ছেলেরা। অনেক আখের খেত আছে, আছে ঘন সবুজ গাছপালা। নারকেল বীথি আর ফুলের ঝাড়ের তো অভাবই নেই।

সেদিন আরেক দিকের সৈকতে সাঁতার কাটতে নিয়ে গেল ওদেরকে ডেভিড। এদিকের পানি অন্যরকম, এখানটাকে ক্যারিবিয়ান উপকূল ধরা হয়। পানি যেমন পরিষ্কার, তেমনি স্থির, শান্ত।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে পানিতে দাপাদাপি করলো ওরা, ধবধবে শাদা বালির সৈকতে গড়াগড়ি খেলো, আবার গিয়ে ঝাঁপ দিলো সাগরে, উঠে এসে রোদের মধ্যে দৌড় দিলো গায়ের পানি শুকানোর জন্যে। ছেলেমেয়েদেরই এই অবস্থা, আর রাফিয়ান তো যেন পাগল হয়ে গেল।

'উফ্, কি যে ভালো লাগছে!' কাপড় পরতে পরতে বললো মুসা। 'এতো ভালো পানি, সারাদিন সাঁতার কাটলেও কিছু হবে না। ডেভিড ভাই, আপনার ভাগ্য সত্যি ভালো, এমন একটা জায়গায় থাকেন। তো, আমাদের পরের প্রোগ্রাম কি?'

'রাজধানী দেখাতে নিয়ে যাবো, ফোর্ট ডা ফ্রান্স। সেখানে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট আছে, খাবার দারুণ। খেয়ে নেবো।'

রাজধানীটাও ভালো লাগলো ওদের। একজায়গায় বিরাট একটা পার্ক, ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। পাশেই মার্কেট, ওপরে টিনের চাল।

একটা দোকানের সামনে গাড়ি রাখতে বললো মুসা। স্যুভনিরের দোকান। ভেতরে ঢুকলো। অন্যেরাও ঢুকলো তার পেছনে।

চওড়া কানাওয়ালা একটা হ্যাট তুলে মাথায় দিয়ে বন্ধুদের দিকে চেয়ে হাসলো মুসা। 'কেমন লাগছে? খুব মানিয়েছে, না?'

মুসার মতোই সেলস-উওম্যান মহিলারও রঙ কালো, ঝকঝকে শাদা দাঁত। হেসে খুব দ্রুত কি যেন বললো। ভালোমতো বুঝতে পারলো না ছেলেরা। ডেভিডের দিকে তাকালো।

'মহিলা বলছে, খুব ভালো লাগছে তোমাকে, এই হ্যাটটা তোমার কেনা উচিত,' ইংরেজিতে বললো ডেভিড।

'বেশ, তাহলে কিনেই নিলাম,' টাকা বের করে দিলো মুসা।

গম্ভীর হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাফিয়ান বোধহয় ভাবলো, তারও এরকম একটা জিনিস পরা উচিত। একটার ওপর আরেকটা রেখে উঁচু একটা স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে হ্যাটের, তার তলায় নাক ঢুকিয়ে দিয়ে, দিলো গুঁতো। ভেঙে পড়লো স্তম্ভ, কিন্তু একটা আটকে রইলো তার নাকে। চোখ ঢেকে গেল। ঝাড়া দিয়েও খুলতে না পেরে আতঙ্কিত হয়ে দিলো একদিকে দৌড়। ধাক্কা খেলো গিয়ে একটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে, ওটাতে ঝোলানো ছিলো রাশি রাশি ঝিনুক আর কড়ির মালা, সব ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। শব্দ শুনে আরও ভড়কে গেল বেচারা। ছুটলো আরেকদিকে। মেঝেতে গোল একটা গর্ত করে অ্যাকোয়ারিয়াম বানিয়ে তাতে মাছ জিয়ানো হয়েছে, ঝপাং করে পড়লো গিয়ে তার মধ্যে।

হাসির হুল্লোড় উঠলো। দোকানের লোকগুলো ভালো, কেউ কিছু মনে করলো না। তারাও মজা পেয়ে হাসছে।

নাক থেকে হ্যাট ছুটলো রাফিয়ানের, তবে ওর মতোই ওটাও ভিজে চুপচুপে। মুসা আর জিনা গিয়ে পানি থেকে টেনে তুললো কুকুরটাকে।

হ্যাটটা নষ্ট হয়ে গেছে। জিনা ভাবলো, তার কুকুরেই নষ্ট করেছে, দোকানের লোকেরা কিছু না বললেও ওটা তার কিনে নেয়া উচিত। তাই করলো।

'শুকালে ঠিক হয়ে যাবে,' বন্ধুদের দিকে ফিরে জিনা বললো। 'রাফি আর পরতে চাইবে না, জোর করেও পরানো যাবে না। ঠিক আছে, শুকালে আমিই মাথায় দেবো।'

'চলো, বেরোই,' তাগাদা দিলো ডেভিড। 'গলা শুকিয়ে গেছে।'

ছিমছাম ছোট একটা কাফেতে ঢুকলো ওরা। কয়েকজন লোক বসে আছে, কোকাকোলা, কিংবা ফলের রস খাচ্ছে। দরজার কাছে বসলো ছেলেরা।

ডেভিড অর্ডার দিলো।

লম্বা, সরু গেলাসে করে এলো আনারসের রস, তাতে বরফের কুচি দেয়া।

'আনারসের রস যে এতো মজা, জানতাম না,' এক চুমুক দিয়েই মন্তব্য করলো মুসা। 'বাড়িতেও খাই, কই, এতো ভালো লাগে না।'

'একেবারে তাজা তো,' রবিন বললো। 'গাছ থেকে তুলে এনেই কাটা হয়। তাজা জিনিসের স্বাদই আলাদা।'

চুপচাপ গেলাসে চুমুক দিচ্ছে, আর কাফের ভেতরটা দেখছে কিশোর। মানুষ পর্যবেক্ষণ তার একটা হবি, তা-ই করছে এখন। কোণের কাছে একটা টেবিলে বসা তিনজন লোকের ওপর চোখ পড়লো। আটকে গেল দৃষ্টি। হালকা-পাতলা একজন শ্বেতাঙ্গ, মাথায় কালো চুল, নিচু গলায় কি বলছে অন্য দুজনকে। তাদের একজন বিশালদেহী, দেখে মুষ্টিযোদ্ধা বলেই মনে হয়। বাদামী চামড়া। পাশে বসা লোকটা তার ঠিক উল্টো। ছোট-খাটো, চেহারাটা বানরের মতো। তার চামড়াও বাদামী। কথা বলতে বলতে বার বার ডেভিডের দিকে তাকাচ্ছে শ্বেতাঙ্গ লোকটা।

ফিসফিস করে বললো কিশোর, 'ডেভিড ভাই, ফিরে তাকাবেন না। কোনায় একজন লোক আপনার ওপর নজর রেখেছে।'

'তাই নাকি?' মাথা ঘোরালো না ডেভিড।

'হ্যাঁ। মনে হয় লোকটা আপনাকে চেনে। দৃষ্টি দিয়ে যদি মানুষ খুন করা যেতো, তাহলে তাই করতো এতোক্ষণে আপনাকে। নজরে বিষ।'

চট্ করে ফিরে একবার দেখে নিলো রবিন। 'হ্যাঁ। পিট-ভাইপারের চেয়েও বিষাক্ত।'

সাবধানে ঘুরে জিনাও একবার দেখে নিলো। 'আমার মনে হয় এবার চাইতে পারেন, ডেভিড ভাই। ব্যাটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে।'

দেখে বলে উঠলো ডেভিড, 'বাহ্, ওরাও এখানে! আন্দাজ করতে পারছো, কারা?'

'পারছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'ডক্টর ভয়ট আর তার দুই বডিগার্ড। তাই না?'

'হুঁ। ওই লোক আমার দিকে বিষাক্ত চোখে তো চাইবেই। হাজার হোক, আমি আমার বাবার ছেলে। আর বাবাকে যেহেতু পছন্দ করে না, আমাকেও করবে না, এটাই স্বাভাবিক।'

'দেখে মনে হয়, কোনো কুমতলব আছে,' মুসা বললো।

'থাকতেও পারে। আলমারির তালা ভাঙতে পারেনি বলে হয়তো রেগে আছে এখনও। বাবার ওপর হামলা চালালেও অবাক হবো না,' কথাটা শান্তকণ্ঠেই বললো বটে ডেভিড, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে উদ্বিগ্ন, একথা বলে দিতে হলো না ছেলেদের। ওরা ঠিকই বুঝলো।

গেলাসটা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিলো মুসা। 'ভাববেন না। দরকার হলে

আমরা সাহায্য করবো আপনার বাবাকে।'

'নিশ্চয়,' মুসার কথার পিঠে বললো কিশোর। 'আমরাও আছি আপনাদের সঙ্গে। ভয়টকে আমারও পছন্দ হচ্ছে না, লোক সুবিধের নয়।'

'দেবো নাকি রাফিকে লেলিয়ে?' কোনো কিছু না ভেবেই বললো জিনা। 'কামড়ে দিয়ে আসুক।'

'আরে না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লো ডেভিড। 'এখুনি ওসবের দরকার নেই। দেখাই যাক না ব্যাটা কি করে।'

কিছুক্ষণ পরে উঠে দুই সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভয়ট। জানালা দিয়ে দেখা গেল, কাছেই পার্ক করে রাখা একটা কালো গাড়িতে উঠলো তিনজনে। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

ড্রিংক শেষ করে ছেলেরাও বেরিয়ে এলো কাফে থেকে। গাড়িতে চেপে চললো সেই ছোট রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে, যেটার কথা বলেছিলো ডেভিড।

পৌঁছলো সেখানে। খাবারের অর্ডার দিলো ডেভিড।

প্রথমে এলো মাছের স্টু। গরম ভাপ উঠছে, কড়া মশলার ঝাঁঝালো গন্ধ। নাক কুঁচকালো রবিন, ভাবলো, সুবিধের হবে না। কিন্তু খেয়ে স্বাদের তারিফ করতেই হলো।

সব শেষে এলো ফলের সালাদ। এতোক্ষণ যা যা খেয়েছে, তার মধ্যে এই খাবারটাই সবচেয়ে ভালো লাগলো ওদের।

পেট ভরে খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোলো ওরা। গাড়িতে চেপে আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কাটালো ফোর্ট ডা ফ্রান্সে। দর্শনীয় আরও কয়েকটা জায়গা দেখলো, লোকের সঙ্গে কথা বললো। আস্তে আস্তে এখানকার ভাষা বুঝতে আরম্ভ করেছে কিশোর। ভাবলোঃ 'ফিরে গিয়ে যদি এই উচ্চারণে কথা বলি ফ্রেন্স-টীচারের সঙ্গে, ক্লাসরুমেই ভিরমি খেয়ে পড়বেন ভদ্রলোক।'

বিকেল হলো। বেলা আর বেশি বাকি নেই।

'বাড়ি ফেরা দরকার,' বললো ডেভিড। 'নইলে বাড়িতে ওরা ভাববে। তোমরাও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।'

এতোই আনন্দ আর উত্তেজনার মাঝে কেটেছে দিনটা, ক্লান্তি টেরই পায়নি কেউ। ডেভিড বলার পর খেয়াল করলো, হ্যাঁ, ক্লান্তি কিছুটা লাগছে বটে, সীটে গা এলিয়ে দিলো ওরা।

শহর থেকে বেরোনোর মুখে ডেভিড বললো, 'সাগরে সূর্যাস্ত দেখতে পাবে। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে ওই দৃশ্য।'

ঠিকই বলেছে। অনেক সাগরেই সূর্যাস্ত দেখেছে ওরা, কিন্তু এখানকার মতো

এতো মোহনীয় লাগেনি কোনোটাই। অপূর্ব!

'আশ্চর্য সুন্দর!' বিড়বিড় করলো কিশোর। তার সুন্দর চোখ দুটোতেও সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে।

কি জানি কি ভেবে কিশোরের দিকে ফিরে তাকালো একবার জিনা, তারপর আবার তাকালো সাগরের দিকে। আর সবার মতোই মুগ্ধ।

তরল সোনায় পরিণত হয়েছে যে সাগরের পানি, সেখান থেকে সোনালি বাষ্প উঠে ছেয়ে দিয়েছে সমস্ত পশ্চিম আকাশকে। মেঘগুলো সোনালি। গোধূলির আলোও এখানে সোনালি। সেই আলোয় জিনার তামাটে চুলের গোছাও হয়ে গেছে উজ্জ্বল সোনালি।

সাগরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অকারণেই জিনার চুল চেটে দিলো রাফিয়ান।

'আরি, এ–ব্যাটাও দেখি কবি হয়ে গেছে!' বেরসিকের মতো বলে উঠলো মুসা।

হাসলো সবাই।

সূর্য ডোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঝপ্ করে নামলো অন্ধকার।

পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে রেখেছিলো ডেভিড, সূর্যাস্ত দেখার জন্যে। আবার স্টার্ট দিয়ে পথে উঠে এলো। 'বেশি সময় লাগবে না…'

তার মুখের কথা শেষ হলো না। পেছন থেকে তীব্র গতিতে পাশ কাটালো একটা বড় কালো গাড়ি। ঝট্ করে একবার বাঁয়ে কেটেই আবার নাক সোজা করে দ্রুত ছুটে চলে গেল।

ব্রেক কষায় আর্তনাদ করে উঠলো ডেভিডের গাড়ির টায়ার। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। আরেকটু হলেই পড়তো গিয়ে পাশের খাদে।

পাকা ড্রাইভার ডেভিড। চোখের পলকে সামলে নিলো।

'ওরকম করলো কেন!' মুসার গলা কাঁপছে।

'আমরা বাঁচলাম কি মরলাম, ফিরেও তাকালো না!' জিনা বললো। 'খাদে পড়লে তো গেছিলাম।'

'না মরলেও হাত–পা নির্ঘাত ভাঙতো!' রবিন বললো।

গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে ডেভিড। চমকটা পুরোপুরি সামলে নিতে পারেনি এখনও।

'আমার কি মনে হয় জানো?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'ইচ্ছে করেই খাদে ফেলতে চেয়েছিলো আমাদের।'

ঝট্ করে তার দিকে তাকালো দুই সহকারী গোয়েন্দা। সামনের সীট থেকে জিনাও ফিরলো। 'কি বলছো!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। গাড়িটা আগেও দেখেছি আমরা। ডক্টর ভয়টের। ড্রাইভিং

সীটে ওকেই দেখলাম মনে হলো।'

'আমি ওকে দেখিনি,' রবিন বললো। 'তবে ওর দুই সঙ্গীকে দেখেছি। জানালা দিয়ে মুখ বের করে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছিলো!'

'হ্যাঁ, ভয়টই,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডেভিড। 'দিনকে দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে সে। শোনো, একটা কথা বলে রাখি, ওর শত্রু হয়ো না। আমাদেরকে সাহায্য করতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে উঠেছো বলেই শুধু চক্ষুলজ্জায় তার খড়গের তলায় গলা বাড়িয়ে দেবে, সেটা চাই না। বাবাও চাইবে না। বুঝতে পারছি, আমাকে আর বাবাকে এখন থেকে আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

'ডেভিড ভাই,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'এরকম বিপদে আগেও পড়েছি, এর চেয়ে বেশি বিপদেও পড়েছি। তাই বলে কখনও পিছিয়ে আসিনি আমরা। দয়া করে তিন গোয়েন্দাকে কাপুরুষ ভাববেন না। জিনাও আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো ভয়কাতুরে নয়। আর রাফিয়ানের তো সিংহ-হৃদয়!'

কিশোরের এই লেকচার শুনে অন্য সময় হলে কিছু একটা মন্তব্য করতোই মুসা। কিন্তু এখন করলো না, চুপ করে রইলো।

চার

পরদিন ছেলেদেরকে দ্বীপের আরেক জায়গা দেখাতে নিয়ে গেল ডেভিড।

দুপুরে সাগরে গোসল সেরে একটা রেস্টুরেন্টে বসে খেলো। তারপর আরও কিছু জায়গা দেখাতে নিয়ে গেল।

একটা জায়গা তো রীতিমতো মরুভূমি। বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে একআধটা পুরানো গাছের মরা কাণ্ড মাথা তুলে রেখেছে বালির ওপর। গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে দুর্গম পথ পেরিয়ে মরুর ধারে এক জায়গায় চলে এলো ওরা। ম্যানচিনিল নামে একজাতের অদ্ভুত গাছ দেখলো। ডেভিড জানালো, গাছগুলোর কষ, পাতা, ফল, সবই বিষাক্ত। বৃষ্টির সময় ওই গাছের নিচে ঠাঁই নেয়া খুবই বিপজ্জনক। ওই গাছের পাতা ধোয়া পানি গায়ে লাগলে চামড়া পুড়ে যায়।

সে-রাতে খাবার টেবিলে বসে ডক্টর ফেবার বললেন, 'কাল মাউন্ট পেলির গোড়ায় সাপ ধরতে যাবো। নিউট যাবে সঙ্গে। হঠাৎ করে তিনটা সাপ মরে গেছে আমাদের। বিষ দরকার। নতুন সাপ ধরে আনা ছাড়া উপায় নেই। কেনার চেষ্টা করেছিলাম। সাপ নিয়েও এসেছিলো। কোনোটারই অবস্থা ভালো না, মরো-মরো, বিষ ছাড়বে কি? কিনিনি। পাহাড়টার জ্বালামুখের নিচের জায়গাটা পিট-ভাইপারের

স্বর্গ। ওখানেই যাবো।'

'তোমার না গেলে হয় না?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন মিসেস ফেবার।

'না,' হাসলেন বিজ্ঞানী। 'ভয় নেই, হুঁশিয়ার থাকবো। আর সাপ তো নতুন ধরতে যাচ্ছি না, জানোই তো। ল্যাবরেটরিতে সারাক্ষণ বিষাক্ত সাপ নিয়েই কারবার। তাছাড়া যাবো দিনের বেলা, ওগুলো তখন ঘুমিয়ে থাকে। ডেভিড, যাবে নাকি তোমার বন্ধুদের নিয়ে?'

ডেভিড কিছু বলার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো জিনা, 'নেবেন আমাদেরকে! উফ্, ভারি মজা হবে তাহলে!'

তিন গোয়েন্দাও খুব খুশি।

রবিন বললো, মাউন্ট পেলি সম্পর্কে বইয়ে পড়েছি। একটা আগ্নেয়গিরি। উনিশশো দুই সালে শেষবার অগ্ন্যুৎপাত করেছিলো না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার পারকার। 'মারটিনিকের ইতিহাসে ওটা একটা বিশেষ দিন। সেইন্ট পিয়েরি শহরটা সেদিন পুরোপুরি তলিয়ে গিয়েছিলো আগ্নেয়গিরির লাভা আর ছাইয়ের তলায়। ওই শহরই ছিলো তখন মারটিনিকের রাজধানী। তিরিশ হাজার লোক মারা পড়েছিলো। জারনি, আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই। পাহাড়টা দেখার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।'

'নিশ্চয় যাবে। খুশিই হবো তুমি গেলে,' ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন ডক্টর ফেবার। 'হ্যাঁ, সাপের কথা বলছিলাম। অগ্ন্যুৎপাত হলে দু'দিন আগেই টের পেয়ে যায় ওরা। পাহাড় ছেড়ে সরে যায় সমভূমির দিকে। দলে দলে ওদেরকে চলে যেতে দেখলে বুঝতে হবে, অঘটন আসছে। মানুষেরও তখন নিরাপদ জায়গায় পালানো উচিত।'

'সরে গেলেই বেঁচে যায় সাপেরা?' জানতে চাইলো রবিন।

'না, সব বাঁচতে পারে না। জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকেই নামতে থাকে তরল লাভা। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় গাছপালা, তৃণভূমি আর ওগুলোতে লুকিয়ে থাকা সমস্ত জীবন। সাপও রেহাই পায় না। অগ্ন্যুৎপাতের আগে অনেক সাপ ছিলো ওখানে, এখন সেই তুলনায় অনেক কমে গেছে। তবে বংশবৃদ্ধি করে করে এখনও যা আছে, নিতান্ত কম নয়। কাল গেলেই বুঝতে পারবে। দিনের বেলায় বেজায় গরম, ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে ওরা। বেখেয়ালে লেজ না মাড়ালে কামড় খাওয়ার ভয় নেই। পাহাড়ের ঢালে অনেক ফুল দেখতে পাবে তোমরা। ছিঁড়তে গেলে, সাবধান। ফুল গাছের ফাঁকে ফাঁকেও সাপ লুকিয়ে থাকে।'

আগামী সকালের চিন্তায় এতোই উত্তেজিত হয়ে পড়লো ছেলেমেয়েরা, কিশোর ছাড়া আর সকলে ভুলেই গেল ডক্টর ভয়ট আর তার বডিগার্ডদের কথা। এমনকি ধাক্কা দিয়ে গাড়ি যে খাদে ফেলে দিতে চেয়েছিলো, সেটাও বেমালুম ভুলে গেল।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে রওনা হলো সাপ-ধরা দলটা। বন্ধুদের নিয়ে নিজের গাড়িতে চললো ডেভিড। ল্যাবরেটরির একটা ট্রাকে চললেন দুই বিজ্ঞানী আর নিউট। সাপ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে ট্রাকে।

প্রথমে ফোর্ট ডা ফ্রান্সে গেল ওরা, দু'জন লোককে তুলে নেয়ার জন্যে। সাপ ধরার ওস্তাদ ওরা।

তারপর আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে এগিয়ে চললো দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কিছুদূর এগিয়েই শুরু হলো পাহাড়ী অঞ্চল। পথটা কখনও উঁচু কখনও নিচু হতে লাগলো, কখনও সোজা কখনও ঘোরানো। আরও কিছুদূর এগিয়ে পথের দু'ধারে শুরু হলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট।

কথাবার্তা কম। তাজ্জব হয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে ওরা। গাছগুলো অনেক উঁচু, ঘন সবুজ পাতা।

'দেখো,' একসময় বললো ডেভিড। 'ওই যে, মাউন্ট পেরিয়ে চূড়া! ওই সামনে।'

'ও-মা, ওটা!' নিরাশ মনে হলো জিনাকে। 'এতো ছোট!'

'হ্যাঁ, ছোটই,' ডেভিড বললো। 'মাত্র চোদ্দশো মিটার উঁচু। খুব নিরীহ না দেখতে? ভাবছি, অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে কেমন দেখায়! তিরিশ হাজার লোককে মেরে ফেলা, সোজা ব্যাপার না!'

'সরু পাহাড়ী নদীর মতো আর কি!' বললো কিশোর। 'গরমে হাঁটুপানি, আর বর্ষায় প্রমত্তা। দু'কূলের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

শুরু হলো পাহাড়। পথের দু'ধারে উঁচু দেয়াল, অনেকটা গিরিপথের মতো। তার ভেতর দিয়ে উঠতে লাগলো দুটো গাড়ি।

একটা চত্বরমতো জায়গায় এসে শেষ হলো পথ। গাড়ি থামলো। নামলো সবাই।

পাহাড়ে চড়ার বিশেষ লাঠি বের করে দিয়ে ছেলেদের বললেন ডক্টর ফেবার, 'যাও, ডেভিডের সঙ্গে। বেশি তাড়াহুড়ো করে উঠতে যেও না, পড়ে হাত-পা ভাঙবে। আমরা যাচ্ছি সাপ ধরতে।'

কিশোরের বড় ইচ্ছে ছিলো, সাপ-ধরা দেখতে যাওয়ার। কিন্তু বিপজ্জনক বলে তাদেরকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন না ফেবার। জিনার বাবাও মানা করলেন। অগত্যা পাহাড়ে চড়েই খুশি থাকতে হলো ওকে। বলতে ইচ্ছে হলো এর চেয়ে অনেক বিপজ্জনক কাজ করে এসেছে ওরা আমাজনে, কিন্তু বেয়াদবি হবে ভেবে বললো না।

দুই সাপুড়েকে নিয়ে সাপ ধরতে চলে গেল বড় তিনজন।

ছেলেদের নিয়ে চূড়ায় উঠতে শুরু করলো ডেভিড। তাড়াহুড়ো করলো না। পথটা সোজা যখন যায়, তখন কোনো বিপদ নেই। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে যখন ঘুরে যায়, মাঝে মাঝে এতো সরু হয়ে যায়, একজনেরই অসুবিধে হয় চলতে। একধারে থাকে

গভীর খাত।

মারটিনিকের প্রায় সব জায়গার মতোই দৃশ্য এখানেও অতি চমৎকার। ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে পাহাড়ের ঢাল। উজ্জ্বল রঙ। মৌমাছি আর বিচিত্র রঙের ফড়িং উড়ছে। ফুলে বসলেই ওগুলোকে ধরার জন্যে ছুটে যায় রাফিয়ান, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

অবশেষে চূড়ায় পৌঁছলো ওরা। জ্বালামুখ দেখে দ্বিতীয়বার হতাশ হলো জিনা। ভেবেছিলো, কি সাংঘাতিক চেহারাই না হবে। কিন্তু গুল্মলতায় ছেয়ে থাকা কালো গোল মুখটাকে অতি-সাধারণ মনে হলো। সিনেমায় দেখা গহ্বরগুলোর মতো মোটেই নয়, নিচে জ্বলছে না লাল আগুন, টগবগ করে ফুটছে না গলিত লাল লাভা।

''দূর, এটা একটা দেখার জিনিস হলো নাকি!' বলেই ফেললো সে।

'জ্বলছে না তো এখন, তাই,' হেসে বললো রবিন। 'নইলে, আমার তো মনে হয় উঠতেই পারতে না এখানে, গরমের চোটে।'

'তখন কি আর উঠতে দিতো নাকি আমার ভীতু বাবাটা! সাপ ধরা দেখাতেই নিয়ে গেল না, আর জ্বলন্ত জ্বালামুখে আসতে দেবে,' ফুঁসে উঠলো জিনা।

'হুফ!' একমত হলো রাফিয়ান।

তার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো জিনা, সেই সাথে অন্যেরাও।

'এখানেই বসি আমরা,' ডেভিড বললো। 'সাপ ধরে এসেই হুইসেল বাজিয়ে আমাদের ডাকবে। তখন যাবো।'

অনেকক্ষণ পর শোনা গেল হুইসেল।

নামতে শুরু করলো আবার ছেলেরা।

সেই চত্বরে মিলিত হলো দুটো দল। ছেলেরা দেখলো, একটা খাঁচায় তিনটে সাপ কিলবিল করছে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো জিনা। হিঁসিয়ে উঠে খাঁচার গায়েই ছোবল মারলো একটা সাপ, আঁৎকে উঠে পিছিয়ে এলো সে।

হেসে বললো ডেভিড, 'কি, ভয় লাগে? নিয়ে গেল না বলে কতো কিছু বললে।'

জবাব দিলো না জিনা। তবে দ্বিতীয়বার আর সাপের দিকে তাকালো না।

সাপ ধরতে পারায় সবচেয়ে খুশি মনে হচ্ছে নিউটকে। হাসি আর যাচ্ছেই না মুখ থেকে। 'অনেক বিষ পাওয়া যাবে। কষ্ট প্রায় করতেই হয়নি।'

'হ্যাঁ,' ডক্টর ফেবারও খুশি। 'তিনটেরই বয়েস কম। প্রচুর বিষ মিলবে।'

বাক্সে অনেক খাবার বেঁধে দিয়েছেন মিসেস ফেবার।

খেয়েদেয়ে বাড়ি রওনা হলো অভিযাত্রীরা।

দুই সাপুড়ের মজুরি চুকিয়ে দিলেন ফেবার। ফোর্ট ডা ফ্রান্সে নামিয়ে দেয়া হলো ওদের।

ল্যাবরেটরির কাছাকাছি এসে চমকে গেল সবাই।

আগুন!

ফায়ার ব্রিগেডের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটার সামনে। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে ফায়ার-ম্যানেরা। আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলেন ডক্টর ফেবার।

ডেভিডও নেমে দৌড় দিলো। তার পেছনে ছেলেরা।

এগিয়ে এলো ফায়ার ক্যাপ্টেন। ডক্টর ফেবারের উত্তেজিত প্রশ্নের জবাব দিলো। বললো, 'সিরিয়াস কিছু না, স্যার। ভয়ের কিছু নেই। তবে আমরা সময় মতো না এলে খারাপ হতে পারতো।'

জানা গেল, মূল ল্যাবরেটরির উত্তরের দেয়ালে লেগেছে আগুন। একজন প্রহরী দেখতে পেয়ে দৌড়ে গেছে দমকলবাহিনীকে ফোন করতে। গিয়ে দেখে টেলিফোনের লাইন কাটা। তারপর গেছে গাড়ির কাছে। টায়ারগুলো সব ফালাফালা করা। ভীষণ অবাক হয়েছে লোকটা, তবে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। সোজা ছুটেছে টারটেনে, দমকলবাহিনীর ঘাঁটিতে। অনেকখানি পথ, দৌড়েই চলে গেছে।

'তাতে অনেক সময় লেগেছে,' জানালো ক্যাপ্টেন। 'ফায়ারপ্রুফ জিনিস দিয়ে তৈরি বলে বেঁচে গেছে বাড়িটা। নইলে আমরা আসতে আসতে সারা বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়তো। নেভানো মুশকিল হয়ে যেতো।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ল্যাবরেটরিতে ছুটলেন ডক্টর ফেবার। পেছনে মিস্টার পারকার। তাঁদের পেছনে ডেভিড, আর অবশ্যই তিন গোয়েন্দা। জিনা আর রাফিয়ান রয়ে গেল বাইরে।

ক্ষতি বিশেষ হয়নি। যা হয়েছে, সহজেই মেরামত করা যাবে। হাঁপ ছাড়লেন ফেবার। বললেন, 'টাকার জন্যে ভাবি না, বীমা করানো আছে। কিন্তু বেশি পুড়লে এমন সব জিনিস যেতো, টাকা দিয়ে আর পাওয়া যেতো না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মাথা নাড়লেন মিস্টার পারকার।

'আপনাআপনি লাগেনি আগুন। কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। শত্রুতা করে।'

'ভয়ট?' ফস করে বললো কিশোর।

'আর কে?' জবাব দিলো ডেভিড।

দুই বিজ্ঞানীকে ল্যাবরেটরিতে রেখে বেরিয়ে এলো ছেলেরা।

জিনাকে দেখা গেল ছোট একটা ঝোপের কাছে। রাফিয়ান ছোঁকছোঁক করছে ওখানে। বোধহয় কিছু দেখতে পেয়েছে।

এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

দাঁত দিয়ে কামড়ে ডাল থেকে কি খুলে আনার চেষ্টা করছে রাফিয়ান।

এক টুকরো কাপড়!

'খোল, খুলে নিয়ে আয় রাফি,' আদেশ দিলো জিনা। শেষ পর্যন্ত নিজেই হাত লাগালো। খুলে আনলো ডাল থেকে। লাল একটা স্কার্ফ।

'কি ওটা?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো ডেভিড।

দেখালো জিনা।

'আরে! চেনা চেনা লাগছে,' ডেভিড বললো। 'কার গলায় দেখলাম···ও হ্যাঁ, ভয়টের এক বডিগার্ডের গলায়! এরকম একটা সবসময় পরে থাকে। ওই যে বাঁদর-মুখোটা।'

'চতুর লোকটা তো?' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ। বোঝাই যাচ্ছে, ভয়টই পাঠিয়েছে বাঁদরমুখোটাকে, ল্যাবরেটরিতে আগুন লাগানোর জন্যে।'

'কিন্তু একটা স্কার্ফ দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না, ও-ই আগুন লাগিয়েছে।'

'মানে? ওই লোকটাই তো পরে।'

'এরকম জিনিস একটাই তৈরি হয়নি, আরও অনেক আছে, অনেকে পরে। আর এটা যদি বাঁদরমুখোর হয়েও থাকে, প্রমাণ করা যাবে না। তাছাড়া এখন গিয়ে হয়তো দেখবেন, নতুন আরেকটা গলায় বাঁধা তার।'

কিশোরের কথায় যুক্তি আছে। অগ্রাহ্য করতে পারলো না ডেভিড।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর ফেবার আর মিস্টার পারকার। জিনা ছুটে গিয়ে জানালো তাঁদেরকে, কি পেয়েছে।

'আরেকবার ব্যর্থ হলো ভয়ট, বললেন ফেবার। 'তবে চেষ্টা সে চালিয়েই যাবে। হয়তো সফলও হবে। আর সে-জন্যেই ভাবনা হচ্ছে।'

এখানে সামান্য ভুল করেছেন ফেবার। তাঁর শত্রু ল্যাবরেটরিটা জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, ইচ্ছে করলেই জ্বালিয়ে দিতে পারতো। সেটা জানা গেল পরদিন সকালে ডাক আসার পর। খাবার টেবিলে বসে সকলের সামনেই চিঠি খুলতে লাগলেন তিনি। একটা খাম খুলে চিঠি পড়েই তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ছোট চিঠি। জোরে জোরে পড়ে শোনালেন সবাইকেঃ

'খুব সহজেই কোনো গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয়া যায়। একই কথা খাটে কোনো বিল্ডিঙের বেলায়ও। সামান্য জায়গার ক্ষতি যখন করা গেছে, পুরো বাড়িটাই শেষ করে দেয়া যায় ইচ্ছে করলে। দুটো ঘটনাকে খাটো করে দেখলে বোকামি হবে। এগুলো পূর্বাভাস। খুব শিগগিরই আমরা একটা চুক্তিতে আসতে না পারলে পরের বার এর চেয়ে অনেক খারাপ ঘটনা ঘটবে। পুরো ল্যাবরেটরিটাই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। কাজেই, সাবধান! ভালোমতো ভেবে দেখা উচিত!'

পাঁচ

চিঠিটার শুরুতে কোনো সম্বোধন নেই, শেষেও কোনো স্বাক্ষর নেই।

পড়া শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ফেবার, 'জারনি, এসবের মানে কি!'

'মনে হলো, ভয়ট আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। এবং সব কিছুই যে তার পক্ষে সম্ভব, এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে,' গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার ফেবার।

'চিঠিটা নিশ্চয় পুলিশের কাছে নিয়ে যাবেন, না?' প্রশ্ন করলো রবিন। 'আমি বলতে চাইছি, প্রমাণ তো পাওয়া গেল। পুলিশ এবার কিছু করতে পারবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ফেবার। 'কি করবে? কি প্রমাণ হয় এই চিঠিতে? টাইপ করা। আমি শিওর, এই কাগজে ভয়টের আঙুলের ছাপও পাওয়া যাবে না, বরং আমার আঙুলের ছাপই থাকবে।'

'যদি কোনোভাবে টাইপরাইটারটা খুঁজে বের করা যায়?' জিনা বললো। 'বইয়ে পড়েছি, টাইপরাইটারের খুঁত দেখে অপরাধীকে ধরে ফেলে গোয়েন্দারা। এই, কী-এর খুঁত-টুত আরকি।'

'খুঁতওয়ালা যন্ত্র ব্যবহার করেনি ভয়ট,' বললেন মিস্টার পারকার। 'তোমার মতো ভয়টও নিশ্চয় ওরকম দু'চারটে গোয়েন্দা গল্প পড়েছে। টাইপরাইটারের সূত্র থেকে যাতে তাকে ধরা না যায়, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান থেকেছে। কি ফেবার, ঠিক বলেছি না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। 'হরফে কোনো খুঁত নেই। যাই হোক, চিঠিটা পুলিশ কমিশেয়ার আঁদ্রের কাছে পাঠিয়ে দেবো। মনে হয় না কিছু করতে পারবে। তবু...আসলে তেমন প্রমাণের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।'

'সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাক, এই কি তুমি চাও?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস ফেবার।

'এতো উতলা হওয়ার কিছু নেই,' বললেন ডক্টর ফেবার। 'ভয়ট খারাপ লোক, ক্ষতি করার চেষ্টা হয়তো করবে। আমিও অতো নরম লোক নই। ঠেকানোর চেষ্টা আমিও করবো।'

বসে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিলো, আবার কথা শুনছিলো কিশোর, কোনো কথা বলেনি। এখন বললো, 'আর কিছু না হোক, একটা কাজ করা যায়। পুলিশকে বলে অন্তত ল্যাবরেটরি পাহারার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে, আংকেল,' জিনা বললো। 'ল্যাবরেটরি পাহারার ব্যবস্থা

তো করা যায়।'

'তবে একটা অসুবিধেও আছে,' কিশোর বললো আবার। 'পুলিশ কি দিনরাত পাহারা দিতে রাজি হবে? আর রাজি হলেও সেটা কতোদিন?'

'ঠিক!' আঙুল নাচালো ডেভিড। 'ওরা চলে গেলেই আবার আঘাত হানবে ভয়ট।'

'এক কাজ করলেই তো পারি আমরা,' কিশোরই পরামর্শ দিলো। 'ভয়টকে অ্যারেস্ট করার মতো প্রয়োজনীয় প্রমাণ নেই। সারাক্ষণ পুলিশ পাহারারও ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আমরা তো পাহারা দিতে পারি?'

'নিশ্চয় পারি,' বলে উঠলো মুসা। 'ব্যাটাকে হাতেনাতে ধরতে পারলে আচ্ছামতো ধোলাই দিয়ে তারপর পুলিশে দেবো…'

'এবং তারপর আর শান্তিতে কাজ করতে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার,' মুসার কথা শেষ না হতেই বললো রবিন।

বিরক্ত দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকালেন ডক্টর ফেবার। 'দেখো, তোমরা ছেলেমানুষ। এটা সিরিয়াস ব্যাপার। এতে তোমাদের নাক না গলানোই ভালো। যাও, খেলা করোগে। আমাকে ভাবতে দাও।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা, জিনা, রাফিয়ান, আর ডেভিড।

বেরিয়েই মুখ ভেঙচালো জিনা, 'যাও, খেলা করোগে! ডেভিড ভাই, আপনার বাবা কি ভাবেন আমাদেরকে? দুধের শিশু? আপনিও তাই ভাবেন। অথচ আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাইছি।'

'রাগ করো না, জিনা,' হেসে শান্তকণ্ঠে বললো ডেভিড। 'আমি তোমাদেরকে শিশু ভাবি না। তোমাদের অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা আমি শুনেছি। আমি বাধা দিচ্ছি একটা কারণে, আমি চাই না আমাদের বিপদে জড়িয়ে পড়ে তোমাদের কোনো ক্ষতি হোক।'

'ক্ষতি হলে হোক,' হাত নাড়লো মুসা। 'ভয়ইট্টা হারামজাদা এখন আমাদের জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরকে খাদে ফেলে দিতে চায়নি? ও এখন আমাদেরও শত্রু।'

'খাদে ফেলতে চায়নি। ভয় দেখাতে চেয়েছে।'

'ও-ই হলো। ব্যাটার পিঠে কষে কয়েকটা কিল না মারতে পারলে আমার শান্তি নেই।'

'তো কি করতে চাও এখন?'

'পরিকল্পনা,' জবাবটা দিলো কিশোর। 'আ প্ল্যান অভ অ্যাকশন।'

সুতরাং সেদিন সৈকতে সূর্যস্নানের সময় ভয়টের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের পরিকল্পনা করতে লাগলো ওরা। অবশ্যই ডেভিডও তাতে যোগ দিলো। একেকজন একেক পরামর্শ

দিলো, আরেকজন সেটার খুঁত দেখিয়ে দিলো। কোনোটাই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলো না। উত্তেজিত হয়ে সেরাতে শুতে গেল সবাই।

দেরিতে ঘুমিয়েছে, ফলে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেও দেরি হলো।

খাবার ঘরে এসে ঢুকলো ওরা।

নাস্তা দিয়ে গেল শেলি। প্রতিদিনের মতোই অন্যান্য খাবারের সঙ্গে দিলো আম, পেঁপে আর পেয়ারা। সবাই আছে খাবার টেবিলে, শুধু বাড়ির মালিক ছাড়া।

'শেলি, সাহেব কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফেবার। 'নিচেই আছে নাকি এখনও? নেমেছে তো সেই কখন।'

'হ্যাঁ, মিসেস ফেবার,' শেলি জবাব দিলো। 'ডাকে আসা চিঠির বাণ্ডিল আর একটা ছোট প্যাকেট নিয়ে নেমেছেন। স্টাডিতে ঢুকেছেন, আর বেরোননি।'

'গিয়ে বলো, নাস্তা রেডি,' জিনার বাবা-মায়ের দিকে চেয়ে বললেন মিসেস ফেবার। 'এমন তো হয় না, নাস্তার সময় তো কখনও দেরি করে না! আর তাছাড়া আজ ঘরে মেহমান রয়েছে।'

ডাকতে গেল শেলি। খানিক পরেই শোনা গেল তার তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'মেরে ফেলেছে রে, মেরে ফেলেছে! ও মিসেস ফেবার, জলদি আসুন! আপনার স্বামীকে মেরে ফেলেছে!'

'মেরে ফেলেছে!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ফেবার। চেহারা রক্তশূন্য।

মিস্টার আর মিসেস পারকারও উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেরাও। হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে শুরু করলো সবাই।

ডক্টর ফেবারের স্টাডিতে এসে ঢুকলো।

টেবিলে মাথা রেখে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন ডক্টর ফেবার। নিথর।

ছুটে গিয়ে বাবার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলো ডেভিড।

মৃদু গুঙিয়ে উঠলেন ডক্টর ফেবার। মাথা তুললেন না।

'বেঁচে আছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন ডেভিড। 'শেলি, জলদি গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করো। মুসা, কিশোর, ধরো তো। বিছানায় নিয়ে যাই।'

ফোন করতে ছুটলো শেলি।

ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে আসা হলো ডক্টর ফেবারকে। ঘরে ভিড় থাকলে বাতাস চলাচলের অসুবিধে হবে, তাই ছেলেদেরকে বেরিয়ে যেতে বললেন মিসেস পারকার।

তিন গোয়েন্দা আর জিনা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

'কাণ্ডটা হলো কি!' রবিন বললো। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

কিশোর বললো, 'চলো, স্টাডিতে যাই।'

স্টাডিতে ঢুকে ডক্টর ফেবারের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো কিশোর। ছোট, কালো, চারকোণা একটা বাক্স পড়ে আছে টেবিলে। সেটার কাছে নাক নিয়ে গিয়ে শুঁকলো। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে আনলো নাক। বিড়বিড় করলো, 'উঁহু, বিচ্ছিরি গন্ধ!'

রবিনও শুঁকে দেখলো। দ্রুত নাক সরিয়ে আনলো।

মুসা শুঁকতে গিয়ে সামান্য দেরি করে ফেললো। হাঁচি দিয়ে উঠলো পরক্ষণেই। 'খাইছে! আল্লাহ্‌রে আল্লাহ্‌, কি ঝাঁজ! গলা জ্বলে যায়!'

মেঝেতে পড়ে থাকা একটুকরো কাগজ শুঁকছে রাফিয়ান।

নিচু হয়ে ওটা তুলে নিলো কিশোর।

কাগজটায় লেখা রয়েছেঃ

এই প্যাকেটে সহজেই এমন জিনিস ভরে দেয়া যেতো, যেটা ঘুম পাড়ানোর বদলে তোমাকে খুন করে ফেলতে পারতো। ভেবে দেখবে কথাটা। এটা আমার শেষ ওয়ারনিং। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সকাল সাতটায়; ডুবুচ ক্যাসলে। কথা আছে। খবরদার, কাউকে সাথে আনবে না!

শেষ বাক্যটার নিচে লাল দাগ দেয়া।

নীরবে কাগজটা সঙ্গীদের দিকে বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

জিনা পড়ে বললো, 'আবার ভয়ট! কি সাংঘাতিক লোকরে বাবা! মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপে না!'

রবিন আর মুসাও পড়লো।

ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট খুঁজে ততোক্ষণে প্যাকেটের মোড়কটা বের করে আনলো কিশোর। 'সাধারণ কাগজ,' আনমনে বললো সে। 'ছাপানো হরফ কেটে বসিয়ে ঠিকানা লিখেছে। ডাকে দেয়া হয়েছে ফোর্ট ডা ফ্রান্স থেকে। যে কেউ নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে পারে পোস্ট অফিসে। তবে আঙুলের ছাপ যে পাওয়া যাবে না, এটা শিওর।' মুখ তুললো। 'খুব বাজে কাজ করেছে, না?'

'চলো, চিঠিটা ওদেরকে দেখাই,' জিনা বললো। 'আমাদেরকে তো পাত্তাই দেয় না। যা করার করুকগে ওরা। অন্তত বুঝুক কিসে কি হয়েছে ফেবার আংকেলের।'

দুই ঘন্টা পর উঠে বসলেন ডক্টর ফেবার। জানালেন, সামান্য ঝিমুনি ভাব রয়েছে, আর মাথা ধরেছে। অন্য কোনো অসুবিধে নেই। বললেন, 'প্যাকেট খুলে দেখি একটা বাক্স। ডালা তুলতেই ঝাঁঝালো ধোঁয়া বেরিয়ে নাকে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। চিঠিটা পড়ার সময় পাইনি।'

বড়দের মধ্যে আলোচনা চললো।

ইতিমধ্যে আরও সুস্থ হলেন ডক্টর ফেবার। বললেন, 'একথাটা আঁদ্রেকে জানিয়ে

লাভ নেই। কি বলবে জানি। বলবে, ওখানে যেও না। আমি শিওর, ক্যাসেলের চারদিকে পাহারা বসাবে। এবং ওসব করে ভয়টকে ধরতে পারবে না। ও তখন আরও খেপে গিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে আমার ওপর। এখন যা করণীয়, সেটা হলো, ভয়ট যা বলছে তাই করা উচিত। একা গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করা উচিত।'

'তাতে কি হবে?' মিসেস ফেবার উৎকণ্ঠা চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন না। 'তোমার ফরমুলা তাকে তুমি কিছুতেই দেবে না, জানা কথা। আর সেটা না দিলে কোনো চুক্তি হবে না, মিটমাটও না।'

'হয়তো বোঝাতে পারবো, কেন তাকে দিতে পারছি না।'

'যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' বললো ডেভিড। 'ঠিক আছে, যেতে চাইলে যাও। চেষ্টা করতে দোষ কি? তবে আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'না,' জোর দিয়ে বললেন ফেবার। 'আমি একাই যাবো। পিস্তল নেবো সঙ্গে।'

বড়দের কথায় নাক গলাতে মানা করে দিয়েছেন ডক্টর ফেবার, তবু জিনা বললো, 'ছোট একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে যেতে পারেন পকেটে করে। কি কি কথা হয়, তুলে আনতে পারেন।'

বিরক্ত হলেন না ফেবার। হাসলেন। 'এতো ছোট রেকর্ডার নেই আমার কাছে। কিনে আনা যায় অবশ্য, তবে তাতে বিশেষ লাভ হবে না। কোর্ট ওসবে গুরুত্ব দেবে না। ভয়টের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করাই ভালো।'

বাগানে বেরিয়ে এলো ছেলেরা। সঙ্গে ডেভিড। আলোচনায় বসলো, ওঅর কাউন্সিল।

'ভয়টের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে পারবে না বাবা,' বললো ডেভিড। 'মিটমাট হবে না।'

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কেটে মুখ তুললো কিশোর। 'ক্যাসলে ঢোকার আগে শিওর হয়ে নেবে ভয়ট, পুলিশ-টুলিস আছে কিনা। আপনার বাবা সত্যি একা, নাকি সঙ্গে লোক আছে। নিশ্চয় সঙ্গে দুই পাহারাদারকে নিয়ে আসবে সে। ওদেরকে ছেড়ে দেবে আশপাশে, পাহারা দিতে। সন্দেহজনক কেউ আছে কিনা দেখবে ওরা।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে বললো রবিন। 'বড় কাউকে দেখলে সন্দেহ করবে। কিন্তু একদল বাচ্চা ছেলেমেয়েকে সৈকতে খেলতে দেখলে কিছুই ভাববে না।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালো ডেভিড। রবিনের ওপর থেকে চোখ সরালো কিশোরের দিকে।

'আমরা কাল খুব ভোরে উঠে মরনিং ওয়াক করতে যেতে পারি,' কিশোর বললো। 'ক্যাসলে ঢুকবো না, সৈকতে হাঁটাহাঁটি করবো। তারপর সুযোগ বুঝে কোথাও লুকিয়ে থেকে চোখ রাখতে পারবো ভয়ট আর আপনার বাবার ওপর। কি বলে শুনতে

পারবো।'

'যদি ইংরেজি না বলে?' যুক্তি দেখালো জিনা। 'বুঝবো না ঠিক মতো।'

'সে সম্ভাবনা কম,' ডেভিড বললো। 'সাধারণত ও ইংরেজিই বেশি বলে। বাবার সঙ্গে যতোবার কথা হয়েছে, ইংরেজিতেই হয়েছে। কিন্তু...'

'আর কোনো কিন্তু নেই,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'কথা শোনার মতো কাছাকাছি যেতে না পারলেও দূর থেকে ওদের ওপর চোখ রাখতে পারবো। ভয়ট খারাপ কিছু করতে চাইলে ছুটে গিয়ে আপনার বাবাকে সাহায্যের চেষ্টা করতে পারবো।'

'ভুলে যাচ্ছো, ওরা তিনজন। তার মাঝে একটা তো রীতিমতো "দৈত্য"। আর তাছাড়া ওদের ফাঁকি দেবো কি করে? আমাকে ভালোমতোই চেনে।'

'নিশ্চয়ই। সেজন্যেই আপনি যেতে পারছেন না আমাদের সঙ্গে।'

ক্ষণিকের জন্যে বোবা হয়ে গেল ডেভিড। তারপর বললো, 'তোমাদের জন্যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে যাবে...'

বাধা দিয়ে মুসা বললো, 'এরচে বিপজ্জনক কাজ করেছি আমরা। আমাজনে আমাদের সঙ্গে গেলে বুঝতেন।'

'আর তেমন কোনো ঝুঁকি তো নিতে যাচ্ছি না আমরা,' রবিন বললো।

'তাছাড়া সঙ্গে রয়েছে রাফি,' জিনা যোগ করলো। 'ভয়টের মতো দু'চারটে শয়তানকে একাই কাবু করতে পারে সে,' যদিও কথাটা বাড়িয়েই বললো জিনা, কেউ আপত্তি করলো না।

'তোমাদেরকে তো চিনে ফেলার ভয় আছে?' ডেভিড মনে করিয়ে দিলো। 'ফোর্ট ডা ফ্রান্সে রেস্টুরেন্টে আমার সঙ্গে দেখেছে।'

কিশোর বললো, 'দেখলেও কি আর এতো মনে রেখেছে নাকি? ওদের চোখ সারাক্ষণ আপনার ওপরই ছিলো। দেখেছি তো। আমাদের দিকে তাকায়-টাকায়নি তেমন।'

গোয়েন্দাদেরকে নিরস্ত করার জোরালো কোনো যুক্তি খুঁজে পেলো না ডেভিড। হাল ছেড়ে দিতেই হলো।

ছয়

পরদিন খুব ভোরে উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান।

গাড়িতে করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো ডেভিড, কিশোর রাজি হয়নি। এঞ্জিনের শব্দে বড়দের কারও ঘুম ভেঙে গেলে বাধা আসবে। তাছাড়া লাল গাড়িটা ভয়ট আর

তার সঙ্গীদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। তাই কিশোরের পরামর্শ মতো আগের দিন সন্ধ্যায়ই চারটে সাইকেল ভাড়া করে এনে রেখেছিলো ডেভিড। ওগুলোতে চড়েই সৈকতে চলেছে তিন কিশোর, এক কিশোরী। রাফিয়ান চলেছে পিছে পিছে।

'দৌড়ে আয়, রাফি,' হেসে বললো কিশোর। 'ভোরের তাজা হাওয়া গায়ে লাগালে স্বাস্থ্য ভালো হয়।'

ওরা যখন রওনা দিয়েছিলো, আঁধারই কাটেনি তখনও।

ছ'টা বাজলো। রোজকার মতোই নির্দিষ্ট সময়ে মারটিনিকে সূর্য উঠলো। বিদায় নিলো অন্ধকার।

একটা কাঁচা রাস্তা ধরে চলেছে ওরা। ঝাঁকুনি লাগছে ক্রমাগত, কিন্তু গতি কমালো না। জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চললো।

অবশেষে ডানে দেখা গেল দুর্গটা।

হঠাৎ পথের মাথায় মস্ত একটা স্ট্যাচু চোখে পড়লো কিশোরের। না না, স্ট্যাচু নয়, জীবন্ত মানুষই। ভয়টের বডিগার্ড, ডেভিড যার নাম রেখেছে দৈত্য। এদিকে পেছন করে আছে লোকটা। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু দেখলো। তারপর কয়েক পা সরে কালো গাড়িটার দরজা খুলে ঝুঁকলো, বোধহয় কোনো জিনিস বের করার জন্যে।

'জলদি নামো!' বলতে বলতেই লাফিয়ে নেমে পড়লো কিশোর। সাইকেল ঠেলে নিয়ে ছুটলো ডান পাশের ঝোপের দিকে।

সবাই ঢুকলো ঝোপের মধ্যে।

'সাইকেলগুলো এখানেই থাক,' ফিসফিস করে সঙ্গীদের বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ঝোপের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে সৈকতে নামবো। তারপর আরেক দিক দিয়ে উঠে যাবো ক্যাসলে।'

নামাটাও সহজ হলো না, ওঠাও না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো ওরা, কারও চোখে পড়ে যায়নি। সৈকতে নামলো। হাতঘড়িতে দেখলো, পৌনে সাতটা বাজে। খানিকটা ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঢালু পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো দুর্গে। এক সারিতে। মাথা নুইয়ে রেখেছে। সামান্যতম শব্দ করলো না।

আগে আগে রয়েছে কিশোর। হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো।

পেছনে দাঁড়িয়ে গেল অন্যেরাও। গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কি দেখে থেমেছে কিশোর।

দেখলো, সামনে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ট আর ডেভিডের বাঁদরমুখো। মনে হলো, দুর্গের পাতালঘর থেকে উঠে এসেছে, যেখানে গোলামদের আটকে রাখা হতো, সেখান থেকে। আশপাশে পুলিশ নেই, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ওরা। বাতাসের ভাটিতে রয়েছে ছেলেরা, ফলে ওদের কাছে ভেসে এলো ভয়টের কণ্ঠস্বর।

'কেউ নেই, গুড। আমার কথামতোই কাজ করেছে। উল্‌ফ, তুমিও যাও। পাহারা দাও গিয়ে। কড়া নজর রাখবে। ডিন ওদিকে থাক, তুমি আরেক দিক যাও।'

ইংরেজিতে কথা বলছে ভয়ট। ছেলেদের ভরসা হলো, সঙ্গীদের সঙ্গেই যখন ইংরেজি বলে লোকটা, ডক্টর ফেবারের সঙ্গেও বলবে—তাহলে তাদের কথাবার্তারও সবই বোঝা যাবে। যদি দু'জনের কাছাকাছি থাকা যায়।

জানা গেল, বাঁদরমুখোর নাম উল্‌ফ। দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। কয়েকটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ছেলেরা দেখলো, একটা ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে লোকটা। ধ্বংসস্তূপের সামনে বিশাল এক চত্বরে উঠে পায়চারি শুরু করলো।

ঘড়ি দেখলো মুসা। 'সাতটা প্রায় বাজে। ডক্টর ফেবারের আসার সময় হয়েছে,' ফিসফিসিয়ে বললো সে।

নিচু গলায় রাফিয়ানের সঙ্গে কথা বলছে কিশোর, চুপ করে থাকতে বলছে। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে কুকুরটার। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উলফের দিকে। ভাবসাবে মনে হচ্ছে, লোকটার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে খুশি হতো। বুঝে ফেলেছে, কে শত্রু।

'চুপ, রাফি!' আবার বললো কিশোর। 'এখনও যাওয়ার সময় হয়নি। লক্ষ্মী রাফি! চুপ!'

'এখানেই থাকবো নাকি আমরা?' জানতে চাইলো জিনা।

'থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই,' মুসা বললো। পাথরের কয়েকটা ভাঙা থাম দেখালো, এককালে বাড়িরটারই অঙ্গ ছিলো ওগুলো। এখন নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার যার মতো। থামের গোড়ায়, আর নানা জায়গায় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে। 'ওগুলোর আড়ালে আড়ালে চলে যেতে পারি ডানজনের কাছে, একটু আগে ভয়ট যেখান থেকে বেরোলো।'

'ঠিকই বলেছো,' রবিন সায় জানালো। 'কেউ নেই, একবার দেখে এসেছে ওখানে ভয়ট। আর যাবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' কিশোর বললো। 'চলো। এই-ই সুযোগ।'

প্রথমে দৌড় দিলো মুসা। থামের আড়ালে আড়ালে ছুটে গিয়ে হারিয়ে গেল নিচে। তারপর উঠলো কিশোর আর রাফিয়ান। ছুটলো। জিনা গেল তার পর, সব শেষে রবিন।

'একটা কাজের কাজ হয়েছে, মুসা। ভালো জায়গায় লুকেয়েছি আমরা,' খুশি হয়ে বললো কিশোর। 'এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে···মনে হয় ওখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবে ভয়ট। এখন ওদের কথা আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছলে হয়।'

'ফেবার আংকেল আসছে না কেন এখনও?' জিনা বললো।

'ওই যে!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'শুনছো? পায়ের শব্দ।...হ্যাঁ, ডক্টরই...'

ফেবারকে দেখা গেল। ভয়টের কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন।

'গুড, গুড!' দেখতে পেয়ে খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলো ভয়ট। 'দেখে আনন্দিত হলাম। আরও আনন্দিত হলাম একা এসেছো দেখে।'

ভয়টের রসিকতার সুর মোটেও পছন্দ হলো না ফেবারের। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হয়তো সময় নষ্ট করতেই এসেছি। তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তবু বলি, বোঝার চেষ্টা যদি করো, খুশি হবো।'

এখনও বাতাসের ভাটিতেই রয়েছে ছেলেরা। কথা শুনতে পাচ্ছে, সব শব্দ স্পষ্ট নয়। তবে যেটুকু শোনা যায়, তাতেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ বুঝতে পারবে।

স্বভাব-শান্ত ডক্টর ফেবারকেও উত্তেজিত দেখাচ্ছে, চেহারায় রাগ। নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, বোঝা যায়। 'আমাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে কেন, জানতে চাই। ভালো করেই জানো, তুমি যা চাও, আমি তা কোনোদিনই দেবো না। ফরমুলা তৈরি শেষ হয়নি এখনও, আর হলেও তোমাকে দিতাম না, বিক্রির তো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার সঙ্গে কথা বলতেই আমার গা ঘিনঘিন করে, পার্টনারশিপে যাওয়া তো বহু দূরের কথা।'

'আবার কি আমাকে অপমান করতেই এসেছো এখানে?' হাসি মুছলো না ভয়টের মুখ থেকে। 'কথা বলতে তোমার কেমন লাগে, ওসব জানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। আমি প্র্যাকটিকেল মানুষ। বিখ্যাত একটা ল্যাবরেটরি থেকে মস্ত অফার এসেছে আমার কাছে, এরকম সুযোগ জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়। সে-সুযোগ আমি সহজে হাতছাড়া করবো না। তোমার ফরমুলা শেষ হলো কিনা, সেটা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে? এখন যে অবস্থায় আছে ওটা, কতো হলে বিক্রি করবে তা-ই বলো।'

'কানে শোনো না নাকি?' ধমক দিয়ে বললেন ফেবার। 'কি বললাম? প্রাণ গেলেও আমি ওই ফরমুলা বিক্রি করবো না, তোমার কাছে তো নয়ই।'

'ভালো ভাবে নিতে চেয়েছিলাম, ফেবার,' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে ভয়টের। 'আমি যা চাই, তা নেবোই, মনে রেখো কথাটা।'

'হুমকি দিচ্ছো?'

'ধরো, তা-ই। কয়েকটা নমুনা তো দেখিয়েছি। তাতেও যদি তোমার টনক না নড়ে, নড়ানোর ব্যবস্থা করবো।'

'যুদ্ধ ঘোষণা করছো তাহলে?'

'তাই তো তোমার পছন্দ!' খসখসে ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেদের বুঝতে অসুবিধে হলো না, ভয়ট ভয়ংকর লোক। প্রয়োজনে সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হতেও বাধবে না তার। টাকার জন্যে এমন কোনো খারাপ কাজ নেই, যা করতে পারবে না।

শিউরে উঠলো জিনা। বললো, 'কিশোর, আমার ভয় লাগছে! কিছু করে বসবে না তো!'

'না, জিনা,' বললো কিশোর। 'এখন কিছু করে লাভ হবে না ভয়টের।'

ভয়ট বলছে, 'যা চাইছি, ছিনিয়ে নেবোই আমি। কেউ রুখতে পারবে না। এখানে যে দেখা হয়েছে আমাদের, কথা হয়েছে, তা-ও প্রমাণ করতে পারবে না তুমি। সাক্ষি নেই।'

'নেই কে বললো, হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চাপলো মুসা। 'আমরা আছি। আমরা গিয়ে সাক্ষি দেবো তোমার বিরুদ্ধে।'

তার কথা অবশ্য শুনতে পেলো না ভয়ট।

ধীর্ঘশ্বাস ফেলে রবিন বললো, 'ভুলে যাচ্ছো মুসা আমান, আমরা ছেলেমানুষ। আমাদের সাক্ষী আদালতে নেবে না।'

'তাহলে ওই হারামি লোকটা এমনি এমনি পার পেয়ে যাবে?'

'তাই তো মনে হয়,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলো রবিন। 'কিশোর, তোমার কি ধারণা?'

কিন্তু কোথায় কিশোর! সে-ও নেই, রাফিয়ানও না।

'আরি! গেল কই?' জিনা বললো।

'চুপ! আস্তে!' হুঁশিয়ার করলো রবিন। 'শুনতে পাবে।'

দু'দিকে ঘুরে দাঁড়ালো দুই ডক্টর।

রাগ দেখিয়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে রাস্তার দিকে চলে গেলেন ফেবার। খানিক পরেই এঞ্জিনের শব্দ হলো। ছেলেরা অনুমান করলো, ল্যাবরেটরিতে ফিরে যাচ্ছেন তিনি।

ডানজনেই বসে রইলো মুসা, রবিন আর জিনা। বেরোনোর সাহস নেই। অবাক হয়ে ভাবছে, কিশোর আর রাফিয়ান গেল কোথায়? কি দেখে এমন নীরবে সরে পড়লো কিশোর? নাহ্‌, যেটা দেখেই গিয়ে থাকুক, কাজটা বোধহয় ভালো করেনি। ভীষণ বিপদে পড়তে পারে।

'চলো, ভাগি,' মুসা উঠে দাঁড়াতে গেল।

তার হাত চেপে ধরলো রবিন। 'বসো। ভয়ট আরও সরে যাক, এখন বেরোলেই দেখে ফেলবে।'

চুপচাপ বসে রইলো ওরা।

আরও কিছুক্ষণ সময় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। উঁকি মেরে দেখলো, উল্‌ফকে দেখা যাচ্ছে না চত্বরে। ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে চত্বরে উঠে এলো তিনজনে। বাঁয়ে মোড় নিয়ে পথ পেরিয়ে ঝোপে ঢুকলো, সাবধানে এগিয়ে চললো ঝোপের আড়ালে আড়ালে।

কালো গাড়িটা চোখে পড়লো। দুই প্রহরী বসে আছে ভেতরে, নিশ্চয় বসের অপেক্ষায়।

খানিক পরে ভয়টকেও দেখা গেল, রাস্তা পেরিয়ে আসছে।

বডিগার্ডদের কাছে গিয়ে কি যেন বললো ভয়ট। তিনজনেরই ঠোঁট নড়তে দেখা গেল শুধু, কথা শোনা গেল না। বাতাসের ভাটিতে রয়েছে এখন ওরা, তাছাড়া বেশ দূরে।

ঠোঁট কামড়ালো মুসা। মনে মনে বললো, 'কি বললো ব্যাটারা!'

পেছনের সীটে উলফের পাশে উঠে বসলো ভয়ট। ড্রাইভিং সীটে ডিন। স্টার্ট নিলো এঞ্জিন। চলতে শুরু করলো গাড়ি। দেখতে দেখতে ঢালু পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছেলেরা। আপাতত আর কিছু করার নেই।

'কিশোর গেল কোথায়?' আবার প্রশ্ন করলো মুসা।

'এই যে, এখানে,' জবাব এলো একটা বড় ঝোপের ভেতর থেকে। দু'হাতে ডালপাতা সরিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর। খানিক আগে ভয়টের গাড়িটা ওই ঝোপের কাছেই দাঁড়িয়েছিলো।

'সব্বোনাশ!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'ওখানে ছিলে এতোক্ষণ! কিন্তু...'

'এলাম কিভাবে, এই তো?' কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো কিশোর, 'সহজ। যখন বুঝলাম, ফেবার আর ভয়টের মাঝে মিটমাট হবে না, ভাবলাম, নিশ্চয় বডিগার্ডদেরকে জরুরী নির্দেশ দেবে ভয়ট। কি বলে, সেটা জানার জন্যেই এখানে চলে এসেছিলাম।'

'এলে কিভাবে?' প্রশ্ন করলো জিনা।

'অনেক ঘুরে ঘুরে। কেউ দেখেনি। ঝোপে ঢুকে চুপ করে লুকিয়ে বসে রইলাম।'

'তারপর?' কিশোর তাদেরকে এভাবে ফাঁকি দিয়েছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না মুসা। গর্দভ মনে হচ্ছে নিজেকে।

'বসে রইলাম। চত্বর পাহারা দিচ্ছে উলফ, আর পথের মাথায় দানবটা, ডিন।...ওভাবে আমার দিকে তাকিও না, মুসা। কসম খোদার, তোমাদেরকে ওভাবে ফাঁকি দেয়ার ইচ্ছে ছিলো না। বলে এলে সঙ্গে আসতে চাইবে তাই...যা-ই হোক, ওরা আমাকে দেখেনি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'কিছুক্ষণ পর পাহারা বাদ দিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলো দুই বডিগার্ড। কথা বলতে লাগলো। গাড়ির এতো কাছে ছিলাম, প্রতিটা শব্দ শুনেছি।'

'কি কথা বলেছে, সেটাই তো জানতে চাইছি,' মুসার চেহারার মেঘ কাটছে না।

হাসলো কিশোর। 'প্রতিটা শব্দ শুনেছি বটে, কিন্তু বুঝিনি। ওরা ভয়টের সঙ্গে ইংরেজি বলে। নিজেরা কথা বলে কি এক বিজাতীয় ভাষায়। একটা বর্ণও বুঝিনি।'

'হউফ!' করে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন, হতাশা ঢাকার চেষ্টা করলো না। 'কিশোর, ওভাবে লুকিয়ে এসে কাজটা ভালো করোনি। ওরা দেখে ফেললে কি

করতে?'

পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে আবার হাসলো কিশোর। 'কি আর করতাম? গলা ফাটিয়ে চেঁচাতাম। তোমরা ছুটে আসতে সাহায্য করার জন্যে।'

'হুফ!' এমনভাবে মাথা দোলালো রাফিয়ান, মুসা পর্যন্ত হেসে ফেললো।

'তারমানে এতো কষ্ট করে কোনো লাভ হলো না,' রবিন বললো। 'ঝুঁকিই নিলাম শুধু শুধু।'

'কে বললো হয়নি?' প্রতিবাদ করলো কিশোর। 'নিশ্চয় হয়েছে। ভয়ট কখন আঘাত হানবে জানতে পেরেছি।'

সাত

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো অন্য তিনজন।

'তবে যে বললে একটা বর্ণও বুঝতে পারোনি!' মুসা বললো।

'দুই বডিগার্ড যখন কথা বলছে, তখন বুঝিনি। কিন্তু ভয়ট তো ইংরেজিই বলেছে। কি বলেছে জানো? বলেছেঃ ওই বোকা গর্দভটা, ফেবার, ওটা খচ্চরের চেয়েও গোঁয়ার। তবে শিগ্গি মজা টের পাবে। আজ রাতেই খেল দেখাবো ওকে। ল্যাবরেটরিটা খতম করবো প্রথমে। আরেকটা ল্যাবরেটরি বানানোর জন্যে পাগল হয়ে যাবে তখন ফেবার, ওর যা আছে তা দিয়ে হবে না। টাকার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করবে। হাহ্ হাহ্ হা!' হাসিটাও অনুকরণ করে দেখালো গোয়েন্দাপ্রধান।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিনার চেহারা। 'কিশোর, ল্যাবরেটরি ধ্বংস করে দেবে বলেছে?'

'বলেছে। এবং আজই রাতে করবে।'

'এক্ষুণি চলো!' মুসা বললো। 'ডক্টর ফেবারকে জানাতে হবে।'

একমত হলো সবাই। আর সময় নষ্ট না করে ছুটলো।

ল্যাবরেটরিতে পৌছে দেখলো, বিজ্ঞানীরা কাজে ব্যস্ত। ডক্টর ফেবারও। তবে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। দরজায় টোকা দিয়ে পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকে নিউট যখন বললো, ছেলেরা দেখা করতে চায়, স্পষ্ট বিরক্তি দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আবার এসেছে! মহামুশকিল। এই চোর-পুলিশ খেলায় খুব মজা পাচ্ছে ওরা। বলে দাও, এখন দেখা হবে না। আমি কাজে ব্যস্ত। আর ডেভিডটাও যে কি! ছেলেগুলো এসে এভাবে বিরক্ত করে আমাকে, দেখে না?'

'ডেভিড নেই ওদের সঙ্গে,' নিউট জবাব দিলো। 'ওই কোঁকড়াচুল ছেলেটা

বললো, খুব জরুরী কথা নাকি আছে।'

নিউটকে পাঠানোর সময়ই জানে কিশোর, ডক্টর ফেবার এখন দেখা করতে চাইবেন না। ভয়টের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক।

জোর করেই ঢুকতে হবে, বুঝতে পারলো কিশোর। খোলা দরজা দিয়ে দলবল নিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

ডক্টর ফেবার তখন বলছেন, 'আমার সময় নেই। ওদের যেতে বলো, নিউট। আমি একটু শান্তিতে…' ছেলেদের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেলেন।

এগিয়ে গেল কিশোর, 'সরি, স্যার। কথাটা সত্যি জরুরী, নইলে এভাবে বিরক্ত করতাম না।'

কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন ফেবার। ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন যেন।

'আপনার ল্যাবরেটরি ধ্বংস করার প্ল্যান করেছে ভয়ট,' আবার বললো কিশোর। 'আজ রাতেই করবে।'

এইবার বোমা ফাটাতে পারলো গোয়েন্দাপ্রধান।

স্তব্ধ হয়ে গেল ডক্টর ফেবার।

নিউটের চোয়াল ঝুলে পড়লো।

'মানে?' অনেকক্ষণ পর কথা বললেন ডক্টর। 'খুলে বলো।'

খুলে বললো কিশোর। মাঝে মধ্যে কথা জুগিয়ে দিলো তার সহকারীরা। চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা কাত করে ফেবারের দিকে চেয়ে রইলো রাফিয়ান, একআধবার লেজ নাড়লো। যেন বলতে চায়, 'তাহলে বুঝতে পারছেন তো, স্যার, কি তুখোড় গোয়েন্দা আমরা? হেহ্ হেহ্ হে!'

ছেলেদের কথা শেষ হলো।

চেয়ার থেকে উঠে এসে এক এক করে ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন ডক্টর।

একটা পা তুলে বাড়িয়ে দিলো রাফিয়ান।

অবাক হলেন ফেবার। ভুরু কোঁচকালেন। ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে। হ্যাণ্ডশেক করার ভঙ্গিতে রাফিয়ানের পা-টা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ভেবেছি, অনেক ছেলেমেয়েইতো ওরকম গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলতে পছন্দ করে। তোমরা যে সত্যি একাজ করতে পারো, বুঝিনি। আজ আমার মস্ত উপকার করলে। থ্যাংক ইউ।'

ছেলেদের জন্যে ফেবারের ওই একটা 'ধন্যবাদই' যথেষ্ট। খুশি হলো ওরা। আনন্দে মুসার চোখে পানি এসে গেল।

সহকারী বিজ্ঞানী আর স্টাফদের নিয়ে জরুরী মিটিঙে বসলেন ডক্টর। জানালেন

সব কথা। কি করা যায়, পরামর্শ চাইলেন। ঠিক হলো, রাতে পালা করে পাহারা দেবে সবাই। ফেবার নিজে সারারাত থাকবেন ল্যাবরেটরিতে।

মিটিঙ শেষে ছেলেদের নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ফেবার। ডেভিডকে ডেকে জানালেন কি ঘটেছে। লাঞ্চে বসে মিসেস ফেবার, আর জিনার বাবা-মাও শুনলেন সব কথা।

'আমিও থাকবো তোমার সঙ্গে,' বললেন মিস্টার পারকার। 'ল্যাবরেটরি পাহারা দেবো।'

ডেভিড আর ছেলেমেয়েরাও যেতে চাইলো।

দৃঢ়কণ্ঠে 'না' বলে দিলেন মিস্টার পারকার। কি বিপদ হবে বলা যায় না। পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বিপদে জড়াতে চান না 'বাচ্চাদের'।

ওরা মন খারাপ করে ফেললো দেখে সান্ত্বনা দিলেন, 'তোমাদের কাজ শেষ। আসলটাই করে দিয়েছো। বাকি দায়িত্ব এখন আমাদের। হয়তো কাল আবার জরুরী কিছু করতে হবে তোমাদের। আর সে জন্যে রাতে ভালো ঘুম দরকার।'

ছেলেরা বোঝে, এসব ছেলে ভোলানো কথাবার্তা। ল্যাবরেটিরতে এতো উত্তেজনা, আর সে-সময় শান্তিতে ঘুমাতে পারবে ওরা? মোটেও না।

বিকেলে দুই বিজ্ঞানীকে গাড়িতে করে চলে যেতে দেখলো ওরা।

রাত হলো। শোবার ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না। খালি অস্থির ভাবে গড়াগড়ি করতে লাগলো। ভাবছে, এই মুহূর্তে কি ঘটছে ডেভিল পয়েন্টে? ভয়ট কি আক্রমণ করেছে?

তিন গোয়েন্দা কিংবা জিনা, কারোই সেরাতে ভালো ঘুম হলো না। কেবল রাফিয়ানের কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই, তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলো না।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে জানা গেল, রাতে ল্যাবরেটরিতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি।

খুশি হলো গোয়েন্দারা, কিছুটা নিরাশও।

'আশ্চর্য!' গেলাসে ফলের রস ঢালতে ঢালতে বললো জিনা। 'ভয়ট প্ল্যান বাতিল করলো কেন?'

'করুক,' রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বলেন ডক্টর ফেবার। 'আজ রাতেও পাহারা দেবো আমরা। কিশোর, কাল ঠিকমতো শুনেছিলে তো ভয়টের কথা?'

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বললো কিশোর।

'কিশোরের স্মরণশক্তি খুব ভালো,' সার্টিফিকেট দিলেন মিস্টার পারকার। 'কথা মনে রাখতে পারে খুব। সহজে কিছু ভোলে না।'

'আমার মনে হয়,' কিশোর বললো। 'রাগের মাথায় সঙ্গীদের বলে ফেলেছিলো ভয়ট, কালই আঘাত হানবে। মাথা গরম থাকলে উল্টোপাল্টা অনেক কথাই বলে

লোকে।'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো, এমনকি ডক্টর ফেবারও।

'পরে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে হয়তো দেখেছে, তাড়াহুড়ো করা উচিত না। যা করার, সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে করবে।'

'ইস্, কি ভাবনায় যে ফেললো!' বলে উঠলেন মিসেস ফেবার। 'ওটা হাজতে না ঢোকা পর্যন্ত শান্তি নেই। এসব আর ভালো লাগছে না আমার।'

'ভেবো না, মা,' বললো ডেভিড। 'খুব শিগ্গি হাজতে ঢুকবে ব্যাটা। এবার আর পাকড়াও না করে ছাড়ছি না।'

'কিন্তু তোমরা এসবে না গিয়ে পুলিশে খবর দিলে হতো না?' বললেন জিনার মা।

'হয়তো না,' জবাব দিলেন মিস্টার পারকার। 'ডেভিলস পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করলেই টের পেয়ে যাবে ভয়ট। আর আসবে না। সব চেয়ে ভালো, চুপ করে থাকা। ওকে বুঝতে না দেয়া, যে আমরা জেনে গেছি ওর প্ল্যান। পুলিশকে জানালেই হৈ-চৈ হবে।'

'কি জানি!' আশ্বস্ত হতে পারলেন না মিসেস পারকার। 'যা ভালো বোঝো, করো।'

সেরাতেও কিছু ঘটলো না। ঘটলো না এরপরের তিন রাতেও।

'নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে ভয়ট,' বললেন ডক্টর ফেবার। 'আমরা যে ল্যাবরেটরি পাহারা দিচ্ছি, কোনোভাবে জেনে গেছে। হয়তো ল্যাবরেটরি ধ্বংস করার ভাবনা দূর করে দিয়েছে মাথা থেকে।'

তাঁর এ-কথায় একমত হতে পারলো না গোয়েন্দারা। তবে মনের কথা মনেই রাখলো, বললো না বিজ্ঞানীকে।

ফেবার বললেন, রাতে আর ল্যাবরেটরি পাহারা দিতে যাবেন না, বাড়ি থাকবেন। নিউট থাকে, ও-ই পাহারা দিতে পারবে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে খবর দেবে।

আলোচনায় বসলো ছেলেরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিলো ডেভিড।

সে বললো, 'বাবা তো পাহারা তুলে নিচ্ছেন।'

কিশোর বললো, 'ভয়টও বোধহয় এটাই চাইছে।'

'তবে একেবারে তুলে নেয়া হচ্ছে না,' বললো ডেভিড। 'নিউট সারারাত পাহারা দেবে। তাছাড়া অ্যালার্ম সিসটেমও আছে।'

'আছে, ভালো,' নিরস কণ্ঠে বললো কিশোর। 'কিন্তু নিউট বুড়ো মানুষ, একা। ক'জনকে সামলাতে পারবে? আর অ্যালার্ম সিসটেম বিকল করে দেয়া কোনো ব্যাপারই

নয়।'

জবাব দিতে পারলো না ডেভিড।

সেদিন বিকেলে পুষ্প মঞ্জিলের বাগানে আবার জমায়েত হলো ওরা, ডেভিডকে বাদ দিয়ে। তিন গোয়েন্দা, জিনা, আর রাফিয়ান।

'আমার মনে হয়, এবার আঘাত হানবে ভয়ট,' কিশোর কথা শুরু করলো। 'ফেবারের ল্যাবরেটরি বাঁচাতে হলে সময় নষ্ট করা চলবে না আমাদের।'

'থাক না, কিশোর,' বিরক্ত হয়ে বললো মুসা। 'ওদের জিনিস ওরা যদি বাঁচাতে না চায়, আমাদের এতো মাথাব্যথা কিসের?'

'সে-জন্যেই তো ওদের শিক্ষাটা দেয়া দরকার। বুঝিয়ে দেয়া দরকার, যাদেরকে বাচ্চা বাচ্চা করে ওরা, তারা ওদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান নয়, কম ক্ষমতা রাখে না।'

জবাব পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা।

'কি করবো তাহলে?' জিজ্ঞেস করলো জিনা।

'একটা প্ল্যান করা দরকার।'

'কি প্ল্যান?' জানতে চাইলো রবিন।

অনেক আলোচনা আর যুক্তি-তর্কের পর ঠিক হলো পরিকল্পনা। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর, বড়রা ভাবলো ছেলেমেয়েরা শুতে গেছে। আসলে, ঘরে ঢুকলো ঠিকই ওরা, কিন্তু কিছুক্ষণ পর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো পা টিপে টিপে। গ্যারেজ থেকে বের করে নিলো সাইকেলগুলো। গেটের বাইরে বেরিয়ে চড়ে বসলো। রওনা হলো ল্যাবরেটরির দিকে।

জোরে জোরে প্যাডাল করে চললো তিন গোয়েন্দা আর জিনা। তাদের পেছনে দৌড়ে চললো রাফিয়ান।

মারটিনিকে আসার পর এই প্রথম অনেক রাতে বাইরে বেরিয়েছে ওরা। রাতটা কেমন যেন অন্যরকম, লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো নয়। রাফিয়ানও সেটা বুঝতে পারছে। বাড়িতে রাতের বেলা পথ চলতে যেসব পরিচিত গন্ধ নাকে আসতো, এখানে সেটা আসছে না। হঠাৎ করে লাফিয়ে রাস্তার ওপর উঠে আসছে বুনো খরগোশ, জিনাদের গাঁয়ের বাড়িতে যেমন আসে।

মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পথ, এমন কিছু দূরে নয়। পৌঁছে গেল ওরা।

সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজালো কিশোর।

পাল্লার একটা গোল ফোকরের পেছন থেকে ঢাকনা সরে গেল। দেখা গেল দুটো চোখ। জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'নিউট, আমরা,' জবাব দিলো কিশোর। 'দরজা খুলুন। আপনার সঙ্গে আমরাও পাহারা দিতে এসেছি।'

'ও, তোমরা? দাঁড়াও খুলছি।' দরজা খুলে দিলো নিউট। মুখে হাসি। 'ভালোই করেছো এসে। বড় একা একা লাগছিল আমার।'

ভেতরে ঢুকেই পরিকল্পনা মাফিক কাজে লাগলো গোয়েন্দারা।

অ্যালার্ম সিসটেম পরীক্ষা করে দেখলো কিশোর।

মুসা, রবিন, আর জিনা গিয়ে প্রতিটি ঘরে ঢুকে দেখে এলো, জানালা-দরজা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে রইলো নিউট। সারাক্ষণ। মুখে লেগে রইলো হাসি। ছেলেদের দেখা হয়ে গেলে বললো, 'ওসব আমি আগেই দেখে রেখেছি।'

'সতর্ক থাকা ভালো,' আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো মুসা।

'নিশ্চয়। নিশ্চয়। তবে এতো দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অ্যালার্ম আছে।'

কিন্তু নিউটের মতো অ্যালার্মের ওপর এতো ভরসা করতে পারলো না ছেলেরা। সারারাত এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার পক্ষপাতিও নয়। মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে টহল দিয়ে আসবে ঠিক করলো। সবার একসাথে জেগে থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই। ডিউটি ভাগ হলো।

রাতের প্রথম ভাগে বিপদের সম্ভাবনা কম। তাই তখন পাহারায় থাকবে জিনা আর রবিন। মাঝে কিশোর, মুসা আর রাফিয়ান। সব শেষে নিউট। রাফিয়ানকে যদিও মাঝখানে ধরা হয়েছে, আসলে সে পাহারা দেবে সারারাতই। ঘুমের মধ্যেও কান খাড়া থাকে তার। অস্বাভাবিক কিছু টের পেলেই সবাইকে সতর্ক করে দেবে।

'তারপর,' কিশোর বললো। 'নিউটের পাহারা শেষ হওয়ার পরেও যদি কিছু না ঘটে, পুষ্প মঞ্জিলে ফিরে যাবো আমরা। যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বো। রাতে আমরা ঘরে ছিলাম না যাতে কেউ বুঝতে না পারে। নিউট, কাউকে কিছু বলবেন না, প্লীজ।'

'তাহলে কাল রাতে কি আবার আসবো?' প্রশ্ন করলো জিনা।

'হ্যাঁ। দিনে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবো। রাতে জেগে থাকবো।'

'আর অবাক হয়ে ভাববে সবাই, হঠাৎ করে ছেলেমেয়েগুলো এমন ঘুমকাতুরে হয়ে গেল কেন!' হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল মুসার।

শুরু হলো পাহারা।

প্রতি আধ ঘন্টা পরপর প্রতিটি ঘরে একবার করে টহল দিয়ে আসতে লাগলো জিনা আর রবিন। দরজা-জানালায় ঠেলা দিয়ে দেখলো, আগের মতোই বন্ধ আছে কিনা।

কিছুই ঘটলো না।

তিন ঘন্টা পর গিয়ে কিশোর আর মুসাকে তুলে দিলো ওরা।

'ভালোই ঘুমালাম, কি বলো?' চোখ ডলতে ডলতে বললো মুসা। 'বালিশের বদলে হাত, বিছানার বদলে মেঝে…তা রবিন, কিছুই ঘটলো না?'

'না,' মাথা নাড়লো রবিন।

ছোট একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো কিশোর। উঁকি দিয়ে দেখলো, চিত হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে নিউট। এতো জোরে, তার মনে হলো, আধ মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে।

মুসা তো বলেই ফেললো, 'এই আওয়াজ শুনলে হেসে লুটোপুটি খাবে ডয়েট মিয়া। ভাববে, আহা কি পাহারাই না বসিয়েছে মহাবিজ্ঞানী আবদুল ফেবার।'

গম্ভীর হয়ে কিশোর বললো, 'দূর, এখন ওসব রসিকতা রাখো তো!'

প্রথম রাউণ্ড টহল শেষ করে হলে ফিরে এলো ওরা। হাত-পা ছড়িয়ে সবে বসেছে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রাফিয়ান। দরজার কাছে ছুটে গিয়ে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে কি শুঁকতে লাগলো। মৃদু গরগর করছে।

আট

পা টিপে টিপে কাছে চলে এলো কিশোর। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'রাফি, কি হয়েছে?'

জবাবে 'গরগর' করে উঠলো কুকুরটা।

'গন্ধ পেয়েছে,' পাশে চলে এসেছে মুসা। 'বেজি-টেজি না তো? এদিকে অনেক আছে, দেখেছি।'

'কি জানি,' নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। 'শোনো…'

মুসাও শুনলো। খুব মোলায়েম একটা শব্দ! দরজায় আলতো ঘষা লেগেছে কিছুর। মুহূর্ত পরেই খোয়া বিছানো পথে শোনা গেল সতর্ক পদশব্দ।

আস্তে করে ঢাকনা সরিয়ে ফোকরে চোখ রাখলো কিশোর। 'কেউ আছে ওখানে,' ফিসফিস করে বললো।

রাফিয়ানের মাথায় হাত রাখলো মুসা। 'চুপ, রাফি! কোনো আওয়াজ করবি না!'

বুঝতে পারলো বুদ্ধিমান কুকুরটা।

'চলো, দোতলায় উঠে যাই,' কিশোর বললো। 'ওখান থেকে ভালোমত দেখা যাবে।'

সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে প্রায় দৌড়ে উঠে এলো ওরা। সাবধানে, কোনো রকম শব্দ না করে একটা জানালার পাল্লা খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরে উঁকি দিলো। ঠিক ওদের নিচেই তিনটে ছায়ামূর্তি, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'জলদি!' আবার বললো কিশোর। 'ওদেরকে জাগাতে হবে।'

জেগে উঠলো সবাই। আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে তৈরি হলো। টেলিফোন করতে

গিয়ে ফিরে এলো নিউট, থমথমে চেহারা। জানালো, টেলিফোনের লাইন কাটা। ডক্টর ফেবারকে ফোন করতে পারেনি।

হঠাৎ বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো রাফিয়ান। বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো তার চিৎকার, আরও বেশি করে কানে বাজলো।

একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে গোয়েন্দারা। দুরুদুরু করছে বুক। ভয় পেয়েছে। তিনজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ, তাদের মাঝে একজন আবার দৈত্য, সঙ্গে হয়তো আগ্নেয়াস্ত্রও আছে। ঠেকাতে পারবে ওদেরকে? নিউটও সাহস হারিয়ে ফেলেছে, চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

মাথার চুল ছিঁড়ছে কিশোর। ইস্, ফোনটা আগেই দেখা উচিত ছিলো! ওই ফোনের ওপরই বেশি ভরসা করেছিলো।

'কি করবো আমরা এখন?' ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নিউট। 'বাইরে থেকে যদি সারা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়?'

কিশোরও একথাই ভাবছে। জীবন্ত পুড়ে কাবাব হওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। জোরে জোরে কয়েকবার চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। তারপর বললো, 'পাল্টা আঘাত হানবো আমরা। জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারবো ওদের দিকে। দুর্গে আটকা পড়লে মধ্যযুগীয় লোকেরা যেমন করতো। এই চলো তোমরা, দোতলায়। নিউট, আপনি এখানেই থাকুন।'

সিঁড়ির দিকে ছুটলো কিশোর। হাতের কাছে প্রথম যে জিনিসটা পড়লো, সেটাই থাবা দিয়ে তুলে নিলো। দেখাদেখি রবিন আর মুসাও তাই করলো। খুলে নিলো দুটো অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র। সিঁড়িতে উঠলো। জিনাও এলো পেছনে।

যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে রাফিয়ান তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে নিউট। যেন বিচিত্র রণ-সঙ্গীত!

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একই সঙ্গে জিনিসপত্র ছুঁ[illegible]ম্ভ করলো চারজনে।

সদর দরজার গোড়ায় পেট্রোল ঢালছিলো উল্‌ফ, ডি[illegible] আর ভয়ট। চমকে উঠলো। তাদের মনে হলো, হঠাৎ করে আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথায়।

হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তাই ছুঁড়ে মারছে জিনা। মুসা আর রবিন অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র দিয়ে স্প্রে করছে। তাড়াহুড়ো করে বেসিনের কলের সঙ্গে একটা হোস পাইপ লাগিয়ে ফেলেছে কিশোর, অনর্গল পানি ছুঁড়ছে সেটা দিয়ে।

সব কিছুকে উপেক্ষা করে পেট্রোলে আগুন ধরিয়ে দিলো আক্রমণকারীরা। কিন্তু জ্বলে উঠেই নিভে গেল আগুন, স্প্রে-এর কারণে। গা-মাথা ভিজে একাকার, স্প্রে-এর পিচ্ছিল ফেনায় মাখামাখি। তার ওপর নানারকম জিনিসের আঘাত তো আছেই মাথায়, পিঠে।

পিছিয়ে গেল ওরা।

'পেরেছি!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'তাড়িয়েছি ব্যাটাদের!'

'কিন্তু আবার আসবে,' এতোটা খুশি হতে পারলো না রবিন। 'হয়তো তিনদিক দিয়ে একই সঙ্গে আগুন লাগানোর চেষ্টা করবে। আমরা সব জায়গায় একই সময়ে যেতে পারবো না। গায়ের জোরে ওদের সাথে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে,' নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিলো কিশোর।

এ-রকম জরুরী পরিস্থিতিতেও কি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে গোয়েন্দাপ্রধান, বুঝতে পারে না মুসা। চাপে পড়লে যেন আরও দ্রুত কাজ শুরু করে কিশোরের মগজের কোষগুলো।

'কি বুদ্ধি?' জানতে চাইলো মুসা।

'আগে ওয়েস্টার্নরা যা করতো, তাই করবো,' জবাব দিলো কিশোর। 'নিশ্চয় বুঝতে পারছো, আমি কি বলতে চাই। বিশাল তৃণভূমির মাঝে একটা ছোট্ট বাড়ি, কোনো সাহসী শ্বেতাঙ্গ পরিবার গিয়ে বাসা বেঁধেছে। হঠাৎ একরাতে তাদেরকে ঘিরে ধরলো জঙ্গী ইনডিয়ানরা। কি করবে?'

'কি করবে?' কিছুই বুঝতে পারছে না জিনা।

'কেন, সিনেমায় দেখোনি কি করে? ওয়েস্টার্ন ছবিতে? একসঙ্গে সব ক'টা জানালা দিয়ে গুলি চালায়। বাড়ির মালিক এক জানালা দিয়ে, তার স্ত্রী আরেক জানালা দিয়ে, ছেলেমেয়েরা অন্যান্য জানালা দিয়ে।'

'বেশ, চালালো,' বললো মুসা। 'তাতে কি?'

'আমরাও ওরকমই কিছু করবো। ভয়টের গোষ্ঠী যদি তিনদিক থেকে আক্রমণ চালায়, আমরাও পাল্টা আঘাত হানবো। দেখিয়ে দেবো, সব জায়গাতেই রয়েছি আমরা।'

'ভুলে যাচ্ছো, আমাদের কাছে বন্দুক নেই।'

'কিংবা বোমাটোমাও কিছু নেই,' রবিন যোগ করলো।

'নেই তো কি হলো?' বললো কিশোর। 'আসল কথা হলো, ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, সব জায়গাতেই রয়েছি আমরা, নিজেদের বাঁচাতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্র ওরা দেখতে পাবে না, তবে শুনতে পাবে ঠিকই।'

'ভাবতে ভাবতে মাথাটা তোমার গেছে এবার সত্যি!' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মুসা।

'না, যায়নি। নিউট আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে, বাড়তি ইলেকট্রিক বাল্বের স্টক কোথায় আছে। এতোবড় ল্যাবরেটরি, নিশ্চয় অনেক বাল্ব লাগে। স্টকেও রাখা হয় বেশি। বাল্ব ছুঁড়ে মারবো ব্যাটাদের আশেপাশে, মাথায়। শব্দ করে ফাটবে।'

'দারুণ আইডিয়া!' আনন্দে তুড়ি বাজালো জিনা। 'চলো, এখুনি গিয়ে নিয়ে

আসি।'

'ভয় পাবে ওরা?' সন্তুষ্ট হতে পারছে না রবিন।

'চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। অনেক সময় অনেক কিছুই অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু করতে গিয়ে দেখা যায় হয়ে গেছে,' বললো কিশোর। 'ধোঁকাও অনেক সময় কাজে লেগে যায়। ভয়েট জানে না, ল্যাবরেটরিতে কারা আছে। শেষ পর্যন্ত যদি ঠেকাতে না-ই পারি, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী তো দিতে পারবো। নিউট সাক্ষী আছে, আদালত আর এবার আমাদের কথা উড়িয়ে দিতে পারবে না।'

অনেকগুলো বাল্ব নিয়ে এলো ওরা।

আবার এগিয়ে এলো ভয়েট আর তার দুই সঙ্গী। রবিনের সন্দেহই ঠিক হলো। তিন জায়গায় আগুন লাগানোর চেষ্টা চালালো ওরা।

ছেলেরাও তৈরি।

একের পর এক বাল্ব ছুঁড়ে মারতে লাগলো। মাটিতে পড়ে ফটাস ফটাস করে ফাটতে লাগলো বাল্ব। থমকে গেল আক্রমণকারীরা। বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে।

ফটাফট কয়েকটা বাল্ব মাথায় পড়ে ভাঙতেই দ্বিতীয়বার পিছিয়ে গেল ওরা। একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো।

জানালার কাছ থেকে কিশোরের পাশে সরে এলো মুসা। 'কিশোর, এভাবে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ওদের। নতুন কোনো বুদ্ধি করতে হবে।'

'আমিও তাই ভাবছি। অন্য কিছু করা দরকার। কিন্তু কি?...আমাদেরকে নিশ্চয় পুড়িয়ে মারতে চাইবে না ভয়েট। খুনের অপরাধে জড়াতে চাইবে না। আগুন লাগানোর ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে বের করে দিতে চাইবে, তারপর লাগাবে। আমরাও বেরোচ্ছি না। কিন্তু ঠেকাতে হলে কিছু একটা করা দরকার। কোনো বুদ্ধিই আসছে না আমার মাথায়।'

কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।

হঠাৎ নিচ তলায় নিউটের চিৎকার শোনা গেল। চেঁচিয়ে গালাগাল করছে আক্রমণকারীদের। দরজার ফোকরে মুখ রেখে বলছে, 'চলে যাও, বুঝেছো? নইলে ভালো হবে না। সাপ ছেড়ে দেবো।'

'এই তো পাওয়া গেছে! মিল গিয়া!' চুটকি বাজালো মুসা। 'সাপ ফেলে দিলেই হয় ওদের মাথায়।'

'না, তা করা যাবে না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'তাহলে খুনের অপরাধে হয়তো আমরাই ফেঁসে যাবো। মুসা, জলদি যাও! তোমার জানালার নিচে ছায়া নড়ছে।'

দ্রুত ছুটে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিলো মুসা। ডিন। এক গোছা শুকনো খড়কুটা এনে আগুন ধরানোর চেষ্টা করছে।

মুসার বাল্ব ফুরিয়ে গেছে। জিনাকে ডেকে বললো, 'দাও তো কয়েকটা, আমার

শেষ।'

তাড়াতাড়ি এনে দিলো জিনা। দু'জনেই ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

ওপর দিকে মুখ তুলে জোরে হেসে উঠলো ডিন।

'হায় হায়, আমাদের চালাকি বুঝে ফেলেছে!' বললো জিনা। রেগে গিয়ে একটা চেয়ার এনে ছুঁড়ে মারলো ডিনের ওপর।

উফ্ করে উঠে পিছিয়ে গেল লোকটা। তবে ইতিমধ্যেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে শুকনো ঘাসে।

ঠিক ওই মুহূর্তে সদর দরজা খুলে দিলো নিউট। সামনে উল্ফ। রাফিয়ানকে চেঁচিয়ে আদেশ দিলো নিউট, ধরার জন্যে।

এই আশায়ই ছিলো এতোক্ষণ রাফিয়ান। আর কি দেরি করে? গর্জে উঠেই ঝাঁপ দিলো।

ছুটে গিয়ে ফায়ার এক্সটিংগুইশার এনে ডিনের লাগানো আগুনে স্প্রে করতে লাগলো মুসা।

জিনা চেঁচাতে শুরু করলো রাফিয়ানের উদ্দেশে।'

স্প্রে শেষ হয়ে গেল। তখনও দাঁড়িয়ে আছে ডিন। ভীষণ রাগে ভারি যন্ত্রটাই তার মাথা সই করে ছুঁড়ে মারলো মুসা। ডিনের মাথায় না ঘাড়ে লাগলো, কে জানে, হাত–পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

ওদিকে জিনার চিৎকার গায়েই মাখছে না রাফিয়ান, শুনতেই পাচ্ছে না যেন সে। এতোক্ষণ পর একটা সুযোগ পেয়েছে, ছাড়বে নাকি?

চোঁ–চাঁ দৌড় দিয়েছে উল্ফ।

তাকে তাড়া করতে গিয়েই হঠাৎ চোখে পড়লো রাফিয়ানের, আরেক জায়গায় আগুন লাগাচ্ছে ভয়ট। দৌড় দিয়েছে যে লোকটা, তাকে ধরার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ধরাই সহজ। মোড় নিয়ে সেদিকেই ছুটলো সে। চলে গেল জিনার চোখের আড়ালে।

জানালা দিয়ে শরীর অনেকখানি বের করে দিলো জিনা। পড়ে যাওয়ার ভয় আছে, সেকথা মনেই রইলো না। একনাগাড়ে চেঁচিয়ে চলেছে, 'রাফি, সাবধান! রাফি, চলে আয়! রাফি…!'

শুনলো না কুকুরটা।

লাফিয়ে সরে গেল ভয়ট। দুই টানে গা থেকে জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে মারলো রাফিয়ানের মাথা সই করে।

থমকে গেল রাফিয়ান। চোখ ঢেকে দিয়েছে কাপড়, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ঝাড়া দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও জড়িয়ে ফেললো নাকেমুখে,

জ্যাকেটের একটা কোণ বোতামসহ শক্ত হয়ে আটকে গেল তার গলার বেল্টে। এতোক্ষণে জিনার ডাক কানে ঢুকলো তার, ফিরে যেতে চাইলো, কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধ হয়ে গেছে যেন।

ওই অবস্থায়ই কোনোমতে ফিরে এসে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলো রাফিয়ান দরজা খুলে রেখেছে নিউট। তখনও ওপর থেকে ডাকছে জিনা, সেদিকে না গিয়ে নিচতলার দেয়াল, টেবিল, আলমারি যেটা কাছে পাচ্ছে সেটাতেই ঘষা দিয়ে জ্যাকেট খোলার চেষ্টা চালালো কুকুরটা। চোখে কিছু দেখতে না পাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

সাপের ঘরে ঢুকে পড়লো রাফিয়ান। লাফিয়ে গিয়ে পড়লো একটা টুলের ওপর। ওই টুলটার ওপর রাখা ছিলো একটা সাপের খাঁচা। কাত হয়ে টুল পড়ে যাওয়ায় খাঁচাটাও পড়লো মাটিতে। ঝাঁকুনি লেগে খুলে গেল ডালা। কাত হয়ে পড়েছে বাক্সটা, ডালা খুলে যাওয়ার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না বন্দি পিটভাইপার, বেরিয়ে এলো। মোজাইক করা পিচ্ছিল মেঝেতে ঠিকমতো আঁকড়ে ধরতে পারছে না ওটার আঁশগুলো, ফলে গতি বাড়াতে পারছে না। এঁকেবেঁকে চললো। দরজার বাইরে চলে যেতে পারলেই মুক্তি।

রাফিয়ানকে থামাতে এলো নিউট। এক টানে কুকুরটার মাথা থেকে জ্যাকেট খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো সাপটার ওপর।

নিচে ভয়ানক শোরগোল শুনে ইতিমধ্যে দোতলা থেকে নেমে এসেছে গোয়েন্দারা।

'আটকে ফেলেছি, আর পালাতে পারবে না,' সাপটাকে দেখিয়ে বললো নিউট।

'খুব সাবধান, নিউট!' হুঁশিয়ার করলো কিশোর।

'সরো। তোমরা দূরে থাকো,' বললো নিউট। 'আমি যা করার করছি।'

জ্যাকেটসহ সাপটাকে চেপে ধরলো সে। তুলে একহাতে খাঁচাটা সোজা করে ডালা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিলো ভেতরে। দু'হাতে ধরলে হয়তো অঘটন ঘটতো না, কিন্তু এক হাতে ধরেছে। আরেক হাতে খাঁচা ঠিক করতে হয়েছে। সুযোগ পেয়ে জ্যাকেটের বাইরে মাথা বের করে ফেললো সাপটা, হিসিয়ে উঠেই ছোবল মারলো নিউটের বুড়ো আঙুলে।

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল গোয়েন্দারা।

কিন্তু নিউট শান্ত, যেন কিছুই হয়নি। সাপটাকে খাঁচায় রেখে জ্যাকেটটা বের করে ফেলে দিলো মেঝেতে। খাঁচার ডালা নামিয়ে হুক আটকে দিলো।

'নিউট!' আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'ওটা কামড়েছে আপনাকে!'

'হ্যাঁ,' শান্তকণ্ঠে বললো নিউট। 'ডক্টর ফেবারকে খবর দিতে হবে। এসে ইনজেকশন দেবেন। অনেক সিরাম আছে ল্যাবরেটরিতে, চিন্তার কিছু নেই।'

পরস্পরের দিকে তাকালো গোয়েন্দারা। সিরাম ইনজেকশন কি করে দিতে হয়

জানে না ওরা। আর ডক্টর ফেবাব রয়েছেন পুষ্প মঞ্জিলে, পাঁচ কিলোমিটার দূরে!

নয়

'সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশন না দিতে পারলে...,' শঙ্কিত হয়ে বললো কিশোর।

'মরবে!' তার কথাটা শেষ করলো মুসা।

'এ-এখানে দাঁড়িয়ে থেকে...,' জিনা বললো। 'জলদি কিছু করা দরকার। নিউট, গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কিশোর, তোমরা গিয়ে শয়তানগুলোকে ঠেকাও। যেভাবে পারো। আমি যাচ্ছি।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ডক্টর আংকেলকে খবর দিতে। রাফি, আয়,' বলেই দরজার দিকে দৌড় দিলো জিনা।

তিন গোয়েন্দাও দাঁড়িয়ে থাকলো না। শত্রুদের ঠেকাতে হবে। আগুন লাগানো বন্ধ করতে হবে।

'কুইক!' বললো কিশোর। 'আবার দোতলায়!'

'এবার কি করবো?' সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ঢিল ছুঁড়বো। গলা ফাটিয়ে চেঁচাবো। কাছাকাছি কেউ থাকলে শুনবে। সাহায্য আসতেও পারে। আপাতত এছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।'

ওদিকে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জিনা। বাইরে উঁকি দিলো। হঠাৎ শুরু হলো বিকট চিৎকার। ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। মুচকি হেসে বাইরে বেরোলো সে। দেখলো, ওপর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ভয়ট আর তার দুই সহকারী। এই হট্টগোলে অবাক হয়েছে, সন্দেহ নেই।

এক ছুটে ভয়টের কালো গাড়িটার কাছে চলে এলো জিনা আর রাফিয়ান। দরজা খুলে উঠে বসলো গাড়িতে।

ড্রাইভিঙের খুব শখ জিনার। সুযোগ পেলেই গাড়ি চালানোর চেষ্টা করে। কায়দা-কানুন মোটামুটি সবই জানে, কিন্তু হাত পাকেনি।

'ভেরি গুড!' বিড়বিড় করলো সে। 'চাবিটা রেখেই গেছে।'

ড্রাইভিং সীটে বসেছে জিনা, পাশে রাফিয়ান। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। পেছনে চেঁচিয়ে উঠলো ভয়ট। কিন্তু ফিরেও তাকালো না জিনা। কাঁপা হাতে গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়তেই লাফ দিয়ে আগে বাড়লো গাড়ি। পরক্ষণেই ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। আবার স্টার্ট দিলো। আবার গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়লো, আস্তে আস্তে। এঞ্জিন আর বন্ধ হলো না, ছুটতে শুরু করলো গাড়ি।

এতোবড় একটা গাড়ি নিয়ে কি করে যে ফ্লাওয়ার ভিলায় পৌছলো জিনা, বলতে পারবে না। প্রয়োজনের তাগিদই বোধহয় তাকে সঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এতদূর। তবে আরও একটা ব্যাপার আছে। এতো রাতে পথ একেবারে নির্জন, আর একটা গাড়িও নেই। তাহলে হয়তো দুর্ঘটনা এড়াতে পারতো না। এমনিতেও যে গাছ আর থামের সঙ্গে ঘষা লাগায়নি, তা নয়। তবে ভাগ্য ভালো, পথের বাইরে গিয়ে পড়েনি। তাহলে আর উঠে আসতে পারতো না।

গেটের কাছে এসে সময়মতো গাড়ির গতি কমাতে পারলো না। ব্রেক করার কথাও মনে রইলো না। প্রচণ্ড জোরে পাল্লায় গুঁতো লাগালো গাড়ির নাক। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। কবজা ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়লো একটা পাল্লা। ভেতরে ঢুকলো গাড়ি। হাল ছেড়ে দিয়েছে জিনা, ক্লাচ থেকে সরে চলে এসেছে পা। গোঁ গোঁ করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। সীটেই এলিয়ে পড়লো জিনা। এতো জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, তার মনে হলো বুকের খাঁচা থেকেই বেরিয়ে যাবে বুঝি।

শব্দ শুনে দোতলার জানালায় উঁকি দিলো একটা মুখ। ডক্টর ফেবার। চেঁচিয়ে উঠলেন।

তাড়াহুড়ো করে নেমে এলো সবাই–ফেবার, মিস্টার পারকার, মিসেস ফেবার, মিসেস পারকার, ডেভিড। ভয়টের গাড়িতে জিনা আর রাফিয়ানকে দেখে অবাক।

দ্রুত সব জানালো জিনা।

তখুনি গাড়িতে চড়ে বসলেন ডক্টর ফেবার, মিস্টার পারকার আর ডেভিড। ডেভিলস পয়েন্টে পৌছে দেখা গেল ভয়ট আর তার দুই সঙ্গী পালিয়েছে। ল্যাবরেটরির বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। তবে সেসব দেখা পরের ব্যাপার। আগে নিউটের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধ্যমতো তার সেবাযত্ন করছে তিন গোয়েন্দা। হাতে দুই জায়গায় শক্ত করে দড়ি পেঁচিয়ে বেঁধেছে, যাতে বিষ ছড়াতে না পারে। তবে যা ছড়ানোর ইতিমধ্যেই ছড়িয়েছে, বাঁধনে বিশেষ কাজ হয়নি। বাঁধাও হয়েছে অবশ্য অনেক পরে।

তাড়াতাড়ি সিরিঞ্জে সিরাম ভরে ইনজেকশন দিলেন ফেবার। 'ভয় নেই,' আশ্বস্ত করলেন তিনি। 'দু'দিনেই সুস্থ হয়ে উঠবে। জিনা, আজ তুমিই বাঁচালে ওকে।'

প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে আরেকদিকে মুখ ফেরালো জিনা।

উঠে এসে জিনার সঙ্গে হাত মেলালো তিন গোয়েন্দা। ভয়টের দলের বিরুদ্ধে আজ ওরা জয়ী হয়েছে।

পরদিন সকাল নাগাদ ল্যাবরেটরিতে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো। নিউটকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ল্যাবরেটরি বিল্ডিঙেরও তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

'এইবার ভয়টের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে পেরেছে, বাবা,' ছেলেদেরকে

জানালো ডেভিড। 'নিউট আর তোমরা সাক্ষী। জোরালো প্রমাণ আছে, ভয়টের কালো গাড়িটা, আর জ্যাকেট। এবার আর রেহাই নেই তার। হাজতে ঢুকবে।'

কিন্তু ডেভিডের ভবিষ্যদ্বাণী ফললো না। দুপুরে ফেবার জানালেন, ভয়ট আর তার সঙ্গীদের ধরতে পারেনি পুলিশ। ল্যাবরেটরি থেকে আর বাড়ি যায়নি ওরা। সারা মারটিনিকে চষে ফেলেছে পুলিশ, খুঁজে পায়নি ব্যাটাদের। কমিশেয়ার আঁদ্রের সন্দেহ, এদ্বীপে নেই ওরা। নৌকায় করে পালিয়ে চলে গেছে অন্য কোনো দ্বীপে। সন্দেহ করা হচ্ছে, পাশের দ্বীপ সেইন্ট লুসিয়া কিংবা ডোমিনিকায় চলে গেছে।

শুনে মিসেস ফেবার বললেন, 'আমার ভয় যাচ্ছে না। ভয়ট যেরকম লোক, সহজে ছাড়বে না। আবার না কিছু করে বসে!'

তবে সহসা আর কিছু করলো না ভয়ট।

পরিস্থিতি দেখে মনে হলো, সবকিছু শান্ত স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন ডক্টর ফেবার আর মিস্টার পারকার। সেইন্ট পিয়েরিতে শুরু হবে সম্মেলন, আর দু'দিন মাত্র বাকি। ডক্টর ফেবার তাঁর গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবেন সম্মেলনে। কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন মিস্টার পারকার। ডেভিডও যাবে। তিন গোয়েন্দা আর জিনাকেও নেয়া হবে। শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ওরা। দ্বীপটা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবে।

'ধ্বংসাবশেষগুলো দেখাতে নিয়ে যাবো,' ডেভিড বললো। 'কয়েকটা মিউজিয়ম আছে ওখানে। আমার গাড়িটা নেবো, কাজেই কোনো অসুবিধে হবে না।'

সম্মেলন যেদিন থেকে শুরু, সেদিন খুব সকালে উঠে রওনা হলো দলটা। মিস্টার পারকার উঠলেন ডক্টর ফেবারের গাড়িতে। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান ডেভিডের গাড়িতে।

সুন্দর সকাল। পথের দু'ধারে চমৎকার দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে চললো নবাগতরা। উজ্জ্বল রোদ ঠিকরে যাচ্ছে যেন রুটিফল গাছের চওড়া পাতায়, আলোআঁধারি সৃষ্টি করেছে সবুজ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন আর বাঁশঝাড়ের তলায়।

আগে আগে চলেছে ডক্টর ফেবারের গাড়ি, পেছনে ডেভিডেরটা।

একটা মোড় নিয়ে হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন ফেবার। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সকালের শান্ত নীরবতা। সতর্ক ছিলো ডেভিড, ব্রেক করে সময়মতো থামিয়ে ফেললো নিজের গাড়ি। আরেকটু হলেই সামনের গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতো। তাতে ক্ষতি হতো দুটো গাড়িরই।

'ব্যাপার কি?' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। জানালার বাইরে মুখ বের করেই জবাব পেয়ে গেল।

মস্ত একটা গাছ আড়াআড়ি ফেলে রাখা হয়েছে রাস্তার ওপর। গাছটার ওপাশে

দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক, হাত তুলে থামার নির্দেশ দিচ্ছে গাড়ি দুটোকে। তিনজনের হাতেই পিস্তল।

'আবার ভয়ট!'. বিড়বিড় করলো জিনা।

তিনজনেই খড়ের হ্যাট মাথায় দিয়েছে, টেনে নামিয়ে এনেছে প্রায় চোখের ওপর। পরনে আখ-চাষীর পোশাক। নিখুঁত ছদ্মবেশ। রেডিওতে পুলিশের ঘোষণা ব্যর্থ হয়েছে এ-কারণেই। কেউ চিনতে পারেনি ওদের।

'বেরোও! সবাই!' কড়া গলায় আদেশ দিলো ভয়ট।

আদেশ মানতেই হলো।

ফেবারের কাছে এসে ভয়ট বললো, 'দেখি, তোমার ব্রিফকেসটা দাও। জলদি।'

'দেখো, ভয়ট, শোনো…,' শুরু করলেন ফেবার।

'আর কিছু শোনার নেই,' থামিয়ে দিলো তাঁকে ভয়ট। 'আমি ফরমুলাটা চাই। জলদি বের করো। নইলে গুলি করবো মেয়েটাকে প্রথমে।'

'যা বলে শোনো, জারনি,' বললেন মিস্টার পারকার। 'আর কিছু করার নেই। ও ধাপ্পা দিচ্ছে না।'

'হ্যাঁ,' বললো ভয়ট। 'বেশি কথা বলার সময় নেই এখন।'

ফেবার ব্রিফকেসটা গাড়ি থেকে বের করতেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলো ভয়ট। খুলে দেখলো। 'গুড! সোনার চেয়ে দামী এসব কাগজপত্র,' সন্তুষ্ট হয়ে হাসলো সে।

রাগে দুঃখে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুই বিজ্ঞানীর চেহারা। কিন্তু কিছুই করার নেই। তিনটে পিস্তলের বিরুদ্ধে কি করবেন?

একটা খাদের ভেতর থেকে তিনটে সাইকেল বের করলো ভয়ট আর তার দুই সঙ্গী। ওগুলোতে চড়ে ঢুকে গেল সরু একটা বুনোপথে। হারিয়ে যাবে গভীর বনে।

'গাড়ি ঢুকবে না,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার পারকার। 'পেছন পেছন যাবো, সে-উপায়ও নেই।'

মাথায় হাত দিয়ে পথের ওপরই বসে পড়েছেন ডক্টর ফেবার। বিড়বিড় করছেন, 'আমার ফরমুলা! আমার ফরমুলা!'

হঠাৎ পেছনে সম্মিলিত হাসি শুনে চমকে ফিরে তাকালেন। ছেলেমেয়েরা হাসছে। ডেভিডও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

'ভাববেন না, স্যার,' হাসতে হাসতে বললো মুসা। 'আপনার ফরমুলা নিরাপদেই আছে।'

'হ্যাঁ, তাই,' জিনা বললো।

'ভয়ট মিয়া ফরমুলা পড়তে বসলে চেহারাটা কেমন হবে, তাই ভাবছি। হি-হি-হি!' আবার হেসে উঠলো মুসা।

'এই যে তোমার ফরমুলা, বাবা,' খবরের কাগজে মোড়ানো একটা রোল বাড়িয়ে

দিলো ডেভিড।

'মা-মানে···,' তোতলাতে শুরু করলেন ফেবার। 'আ-মি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আমিও না,' বললেন মিস্টার পারকার। 'ব্যাপার কি?'

'কিশোরের বুদ্ধি,' ডেভিড বললো।

'অনেক বড় বড় ডাকাতকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে আমাদের কিশোর পাশা,' বন্ধু-গর্বে আধ হাত ফুলে উঠলো রবিনের বুক। 'আর ভয়ট তো কোন ছার।'

'হয়েছেটা কি?' কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার পারকার।

'পুলিশের কথা বিশ্বাস করেনি কিশোর,' ডেভিড খুলে বললো। 'তার ধারণা ছিলো, ভয়ট পালায়নি। কোথাও লুকিয়ে আছে। সময়মতো উদয় হবে। আমার কাছে একটা ম্যাপ দেখতে চাইলো কিশোর। দেখতে চাইলো, সম্মেলনের দিন আমরা কোন্ পথ দিয়ে সেইন্ট পিয়েরিতে যাবো। দেখালাম। বুনোপথ দেখে সন্দেহ আরও বাড়লো তার। বললো, এই পথেরই কোথাও দেখা দেবে ভয়ট। ফরমুলা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। তোমাকে বললে হয়তো বিশ্বাস করতে না, তাই বলিনি। চুরি করে তোমার ব্রিফকেস থেকে আসল ফরমুলা সরিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে কতগুলো বাজে খসড়া কাগজ এনে ভরে রেখেছি। ওগুলোই নিয়ে গেছে ভয়ট।'

'হুফ!' ডেভিডের কথায় সায় জানিয়েই যেন বললো রাফিয়ান।

হো হো করে হেসে উঠলেন দুই বিজ্ঞানী। তিন গোয়েন্দা আর জিনার এতো প্রশংসা শুরু করলেন, রীতিমতো লজ্জা পেলো ওরা।

সবাই মিলে টেনেহিঁচড়ে পথের ওপর থেকে গাছটা সরালো। তারপর আবার রওনা হলো।

শহরে পৌঁছে প্রথমেই থানায় গেলেন ডক্টর ফেবার। পুলিশকে বললেন, তাদের অনুমান ভুল। ভয়ট আর তার সঙ্গীরা এখনও দ্বীপেই রয়েছে। রিপোর্ট লিখিয়ে, থানা থেকে বেরিয়ে হোটেলে গেলেন। সীট বুক করা আছে।

হোটেলের ম্যানেজার ইংরেজ, বিয়ে করেছেন এক মারটিনিক মহিলাকে। তাঁদের ছেলে মাইক ডেভিডের সমবয়েসী, সহপাঠী, বন্ধু। বেশ লম্বা, বাদামী চুল, উচ্ছল এক তরুণ।

ঘন্টাখানেক পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই বিজ্ঞানী, সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে। ছেলেরা বেরোলো শহর ঘুরে দেখতে। মাইকও চললো তাদের সঙ্গে। দারুণ উত্তেজনা আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটলো দিনটা।

সন্ধ্যায় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরলো ছেলেরা। রাতের খাওয়া শেষ করেই শুতে চলে গেল যে-যার ঘরে।

পরদিন খুব ভোরে উঠলেন দুই বিজ্ঞানী। তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের অনেক পরে উঠলো ছেলেমেয়েরা। হাসাহাসি করতে করতে এসে ঢুকলো খাবার ঘরে।

'আরি!' কিশোর বললো। 'ডেভিড দেখি আমাদের চেয়ে অলস হয়ে গেছে। ওঠেনি এখনও।'

'ওর জন্যে বাপু আমি বসে থাকতে পারবো না,' লোভাতুর চোখে টেবিলে রাখা ফলগুলোর দিকে চেয়ে বললো মুসা। 'তোমরা বসো, আমি শুরু করে দিই।'

বসে পড়লো চারজনেই। জিনার চেয়ারের কাছে মাটিতে বসলো রাফিয়ান।

'ডেভিডের জন্যে রেখে আমরা সেরে ফেলতে পারি,' প্রস্তাব দিলো জিনা। 'তাড়া নেই তো, ওঠারও তাগাদা নেই।'

ধীরে ধীরে খেতে লাগলো ওরা, যাতে ডেভিড এসে যোগ দিতে পারে। খাওয়া শেষ হয়ে গেল সবার, তবু এলো না ডেভিড।

'দেখি তো, উঠছে না কেন?' উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

'চলো, আমরা সবাই যাই,' মুসা বললো।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ডেভিডের দরজার সামনে দাঁড়ালো ওরা।

দরজায় থাবা দিয়ে কিশোর ডাকলো, 'ডেভিড ভাই, উঠুন। আমাদের নাস্তা শেষ।'

জবাব এলো না।

আরও কয়েকবার ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না।

'তাজ্জব ব্যাপার!' বলতে বলতেই নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিয়ে পাল্লা খুলে ফেললো রবিন। 'অনেক বেলা হয়ে গেছে…,' মাথা ঢুকিয়েই থেমে গেল সে। 'আরে, গেল কোথায়? নেই তো।'

চারজনেই ঢুকলো ডেভিডের ঘরে। অবাক হলো। ঘরে নেই, বাথরুমে নেই, বিছানা নিখুঁতভাবে পাতা। দুপুরের আগে পরিচারিকা আসে না বিছানা ঠিক করতে, তাহলে করলো কে?

'এর একটাই মানে হতে পারে,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'গতরাতে শোয়ইনি সে।'

'শোবে না কেন?' রবিন বললো। 'বললো না, শুতে যাচ্ছে!'

'কিছু একটা হয়েছে ওর,' আবার বললো কিশোর। 'ওই যে, ব্যাখ্যা।' হাত তুলে টেবিল দেখালো। একটা খাম। এমনভাবে রাখা হয়েছে, যাতে সহজেই চোখে পড়ে।

এগিয়ে গেল চারজনেই।

খামের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ জরুরী। ডক্টর ফেবারের জন্যে।

খামটা হাতে তুলে নিলো কিশোর।

রাফিয়ান নাক উঁচু করে একবার শুঁকেই গরগর করে উঠলো। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিনার চেহারা। কুকুরটার এরকম করার অর্থ তার ভালোই জানা। 'ভয়েট!' বিড়বিড় করে বললো সে। 'নিশ্চয় কিডন্যাপ করেছে ডেভিড ভাইকে!'

দশ

'ডক্টর ফেবারকে ফোন করতে হবে,' বললো মুসা।

ফোনের দিকে ছুটলো কিশোর।

খবর পেয়ে দ্রুত ফিরে এলেন ডক্টর ফেবার আর মিস্টার পারকার।

খাম খুলে জানা গেল, জিনার অনুমান ঠিক। ডেভিডকে কিডন্যাপ করেছে ভয়েট। পরিষ্কার করে লিখেছে সে-কথাঃ তোমার ছেলেকে তুলে নিয়ে এলাম। নিষ্ঠুর হতে বাধ্য করো না আমাকে। ফরমুলার চেয়ে ছেলের জীবন নিশ্চয় তোমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। বিনিময় কিভাবে হবে, সেটা শিগগিরই জানতে পারবে। খবরদার, পুলিশকে জানাবে না। জানালে...,' এ-পর্যন্ত পড়ে মুখ তুললেন ফেবার। দাঁতে দাঁত চাপলেন। 'শয়তান!'

'শান্ত হও, জারনি,' বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলেন মিস্টার পারকার। 'আর যা-ই করো, তোমার স্ত্রীকে এ-খবর জানিও না। আগে ডেভিডকে মুক্ত করে নিই।'

'একটাই উপায় দেখছি আমি,' ভাঙা গলায় বললেন ফেবার। 'ফরমুলাটা ভয়েটকে দিয়ে দেয়া। আমার কপালে বন্দুক ধরেছে সে, আর কিচ্ছু করার নেই।'

সেদিন বিকেলে ছোট একটা ছেলে হোটেলে এসে ডক্টর ফেবারের খোঁজ করলো। তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে জানালো, ওটা এক লোক দিয়েছে। বলেছে, এই চিঠিটা পৌঁছে দিলে নাকি ডক্টর ফেবার তাঁকে কিছু টাকা দেবেন।

দুঃখের হাসি ফুটলো ফেবারের মুখে। নিজে সামান্যতম ঝুঁকি নেয়নি, কিন্তু এমন ফন্দি করেছে, যাতে চিঠিটা ঠিকমতো ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়। খাম ছিঁড়ে ভেতরের কাগজ বের করতে লাগলেন তিনি।

কয়েকটা পয়সা বের করে ছেলেটার হাতে দিলেন মিস্টার পারকার।

চিঠিটা দু'বার পড়লেন ফেবার। তারপর বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'লিখেছে, ডেভিডকে ফেরত পেতে চাইলে শুক্রবার বিকেলে যেন মাউন্ট পেলির চূড়ায় যাই। চূড়ার কাছে একটা ফাটল আছে। ফাটলের একধারে জন্মেছে একটা ফ্র্যাঙ্গিপ্যানি গাছ, ঝড়ে

কাত হয়ে মাথাটা চলে গেছে ফাটলের অন্য ধারে। ওভাবেই বেঁচে রয়েছে গাছটা। আমাকে যেতে হবে সেই গাছের কাছে, একা। ফরমুলা দিয়ে ডেভিডকে ফেরত আনতে হবে।...হ্যারি, আমার ভাল্লাগছে না! যা চায়, সেটা পাওয়ার পরেও অনেক সময় জিম্মিকে ফেরত দেয় না কিডন্যাপাররা!'

নানাভাবে বন্ধুকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার পারকার।

সেঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলো গোয়েন্দারা।

'ডক্টর ফেবারের হাত-পা বাঁধা,' মুসা বললো। 'পুলিশের কাছেও যেতে পারবেন না। আর এখানকার পুলিশের ওপরও ভরসা কমে যাচ্ছে আমার।'

'সত্যি, মহাবিপদ,' বললো রবিন।

'কান্নাকাটি করে লাভ নেই,' তিক্ত কণ্ঠে বললো জিনা। 'ভেবেচিন্তে একটা কিছু উপায় বের করা দরকার। কিশোর, কিছু ভেবেছো?'

'চেষ্টা করছি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'এখন বোকামি করা চলবে না। তাতে ডেভিডের বিপদ আরও বাড়বে।'

বিষণ্ন এক বিকেল।

অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে বন্ধুকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন মিস্টার পারকার। এমনকি পরের দিন সম্মেলনে যেতেও রাজি করিয়ে ফেললেন। এছাড়া আর করারও কিছু নেই। এতে অন্তত দুশ্চিন্তা কিছুটা ভুলে থাকা যাবে, ঘরে বসে থাকলে তো আরও বেশি খারাপ লাগবে।

'শুক্রবার পর্যন্ত তো কোনোভাবেই কাটাতে হবে,' বললেন মিস্টার পারকার।

খবর শুনে খুশি হলো কিশোর। বন্ধুদের কাছে এসে বললো, 'এতে একটা সুবিধে হলো। কালকের দিনটা হাতে পাবো আমরা।'

'পাবো। পেয়ে কি করবো?' জানতে চাইলো মুসা।

'মাউন্ট পেলিতে পিকনিকে যাওয়া আমাদের ঠেকায় কে? দ্বীপটার বিশেষ বিশেষ জায়গা দেখার জন্যেই তো আমরা মারটিনিকে এসেছি, নাকি?'

'একবার তো দেখে এসেছি আমরা,' অবাক হয়ে বললো জিনা।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস শব্দ করে ছাড়লো রবিন। 'তুমি কি ভাবছো, বুঝতে পারছি কিশোর। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেছো। অনেক দূর। যেতে হলে গাড়ি দরকার। অন্য কোনোভাবে যেতে পারবো না।'

'না, কিছুই ভুলিনি, 'জবাব দিলো কিশোর। 'গাড়ির কথা ভেবে রেখেছি। ড্রাইভারও।'

'ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ। মাইক। আমরা আসার পর যা যা ঘটেছে সব তাকে বলেছে ডেভিড। যেতে বললে খুশি হয়েই যাবে মাইক, আমি শিওর।'

'তাকে বিশ্বাস করা যায়?' মুসা বললো।

'কেন যাবে না? ডেভিডের বন্ধু সে। তাছাড়া তার সঙ্গে কথাও বলেছি আমি। মাউন্ট পেলি তার নখদর্পণে। আমাদের গাইড হিসেবে ভালোই হবে।'

জিনা বললো, 'হ্যাঁ, মাইককে বিশ্বাস করা যায়।'

মাইক সত্যি ভালো ছেলে। তাকে দিয়ে আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো ছেলেরা, যে যা বলবে, একটা কথাও যেন আর কাউকে না বলে। তারপর তাকে খুলে বললো তাদের পরিকল্পনার কথা।

খুশি হয়েই সাহায্য করতে রাজি হলো মাইক, কিশোর ঠিকই অনুমান করেছে। বললো, 'যাবো না মানে, নিশ্চয় যাবো। ডেভিড আমার বন্ধু। তাহলে কালই যাচ্ছি?'

পরদিন পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগলো মাইকের গাড়ি। সকাল তখন ন'টা। চূড়ায় পৌঁছে ঠিক কি করবে, জানে না এখনও ছেলেরা। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।

'আমার ধারণা,' কিশোর বললো। 'ওখানেই কোথাও ডেভিডকে লুকিয়ে রেখেছে ভয়ট। এমন কোনো জায়গায়, হয়তো সে ছাড়া আর কেউই চেনে না।'

মুসা বললো, 'আগে ফরমুলাটা হাতে নিয়ে নেবে ভয়ট, দেখো, তারপর ফেবারকে জানাবে তাঁর ছেলে কোথায় আছে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'কিন্তু তাহলে চূড়ার কাছে ডেভিডকে লুকিয়ে রাখার দরকার কি?' রবিন বললো। 'যে কোনোখানে রাখতে পারে। ফরমুলা পাওয়ার পর বললেই পারে, কোথায় রেখেছে।'

'কাছাকাছি রাখার সম্ভাবনাই বেশি,' যুক্তি দিয়ে বোঝালো কিশোর। 'কারণ, পুলিশ খুঁজছে। ডেভিডকে চূড়ার কাছে রেখে নিজেরা আশপাশে লুকিয়ে থাকবে। যদি পুলিশ গিয়ে হাজির হয়, বন্দির কপালে পিস্তল ধরে ওদেরকে সরে যেতে বাধ্য করবে। অন্য কোথাও রাখলে সেটা পারবে না। মিস্টার ফেবার যে পুলিশ নিয়ে যাবেন না, কথামতোই কাজ করবেন, কি করে বিশ্বাস করবে ভয়ট? সেজন্যেই বলছি, চূড়ার কাছেই কোথাও রেখেছে। আর এসেছিই যখন, খুঁজে দেখতে অসুবিধে কি?'

'কোনো অসুবিধে নেই,' বললো মাইক। 'তোমরা টুরিস্ট, আমি তোমাদের গাইড, পারফেক্ট কভার। সহজে সন্দেহ করবে না। দেখা যাক, খুঁজতে গিয়ে কি বেরোয়।'

'যদি কিছু বেরিয়ে যায়?' মুসার প্রশ্ন।

'তখনকার কথা তখন,' জবাব দিলো কিশোর।

উঠে চলেছে গাড়ি। এক জায়গায় এসে থামলো মাইক। বললো, 'এবার হেঁটে যেতে হবে।'

গাড়ি ওখানেই রেখে হেঁটে এগোলো ওরা।

'সোজা গাছটার কাছে চলে যাই, কি বলো?' জিজ্ঞেস করলো মাইক।

'ওদিকেই চলুন,' কিশোর বললো। 'তবে বেশি কাছাকাছি যাওয়ার দরকার নেই। দূর থেকে দেখিয়ে দেবেন। তারপর আমরা যে কোনো দু'জন যাবো, অন্যেরা থাকবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো,' রবিন একমত হলো। 'তাহলে শত্রুদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। আর দেখে ফেললেও দুটো কিশোরকে খুব একটা পাত্তা দেবে না।'

'একেবারে না দেখলেই ভালো,' মুসা বললো। 'ছোট বলে আর আমাদেরকে অবহেলা করবে না ওরা। সেদিন রাতে ল্যাবরেটরির কথা ভুলে যাবে ভেবেছো?'

'তাহলে কোন্ দু'জন যাবে ঠিক করলে, কিশোর?' জানতে চাইলো রবিন।

'আমি আর মুসা। রাফিয়ানও যাবে।'

আর কোনো কথা হলো না। নীরবে উঠে চললো ওরা।

অবশেষে থামলো মাইক। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখিয়ে বললো, 'ওই যে, চিড়টা দেখতে পাচ্ছো? আর ওই যে ফ্রাঙ্গিপ্যানি গাছটা কাত হয়ে আছে? ওই জায়গার কথাই বলেছে ভয়ট।'

এগারো

'জায়গাও বেছেছে বটে একটা,' কিশোর বললো। 'মুসা, এসো যাই।'

মাইকের সঙ্গে রয়ে গেল রবিন আর জিনা।

মুসাকে নিয়ে কিশোর রওনা হলো। রাফিয়ান চললো ওদের সাথে। খোলা জায়গা দিয়ে গেলে সুবিধে, কিন্তু চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। তাই অসুবিধে করেই ঘন সবুজ ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলো ওরা। এখানে আসার পর থেকেই দেখছে, আকাশ মেঘলা। পাহাড়ের মাথায় ঘন কুয়াশা ভাসছে। থেকে থেকেই ঢেকে দিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে দিচ্ছে চূড়াটাকে। সেদিন যে এসেছিলো, তখন কড়া রোদ ছিলো, এরকম ছিল না।

চারপাশে নীরবতা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মুসা। ফিসফিস করে বললো, 'শুনেছো! কে জানি আসছে!'

কান পাতলো কিশোর। শব্দ শুনলো না, কিন্তু দেখতে পেলো, সামনে খানিক দূরে আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে এক জায়গার ঝোপ। ওপরে। আকাশের পটভূমিতে দেখা গেল দুটো মাথা।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'বাঁদর আর দৈত্য!'

হ্যাঁ, উল্‌ফ আর ডিনই। সতর্ক পাহারায় রয়েছে। তীক্ষ্ণ নজর নিচের ঢালু অঞ্চলের দিকে।

যেখানে ছিলো সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দুই গোয়েন্দা, ফুলে ফুলে ছাওয়া বিশাল এক ঝোপের আড়ালে।

পায়ের ওপর ভার বদল করতে গিয়েই গোলমাল করে ফেললো মুসা। শুকনো একটা ডালে পা পড়ে মট্ করে ভাঙলো। খুব সামান্য শব্দ, কিন্তু দুই প্রহরীর কান এড়ালো না। ঝট্ করে ফিরে তাকালো এদিকে। গোয়েন্দাদেরকে দেখে ফেললেই সমস্ত পরিকল্পনা খতম।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ওদের নজর অন্যদিকে ফেরাতেই হবে। রাফিয়ানের মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বললো, 'জিনার কাছে যা রাফি। জলদি!' হাত তুলে ইঙ্গিত করলো, জিনা যেদিকে আছে সেদিকে।

বুঝতে পারলো বুদ্ধিমান কুকুরটা। কেন চলে যেতে বলছে, এটা বুঝলো না। কিশোর আরেকবার 'যা!' বলতেই ছুটলো। ঝোপের ভেতর দিয়ে যেতে বলা হয়েছে তাকে। গেল। পাতায় ঘষা লাগলো, গায়ে বাড়ি লেগে ছটছট করে সরে গেল সরু ডাল। পায়ে লেগে পাথর গড়িয়ে পড়লো।

উল্‌ফ আর ডিনের নজর তার দিকে। কিন্তু ঝোপের ভেতরের প্রাণীটাকে দেখতে পেলো না।

'কুত্তাটুত্তা হবে,' বললো ডিন।

'এখানে কুত্তা আসবে কোত্থেকে?' উল্‌ফ বললো। 'বেজি।'

সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল ডয়টের দুই বডিগার্ড।

হাঁফ ছাড়লো কিশোর।

চুপ করে আরও কিছুক্ষণ বসে রইলো ওরা দু'জনে। তারপর উঠে, নিঃশব্দে দ্রুত ফিরে এলো সঙ্গীদের কাছে।

'একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। 'লোকগুলো জ্বালামুখের ধারেই লুকিয়ে আছে। এখন আর কিছু করা যাবে না। পরে আসতে হবে।'

হোটেলে ফিরে এসে আলোচনায় বসলো ওরা। এরপর কি করবে? মাউন্ট পেলির আশেপাশেই কোথাও ডেভিডকে রাখা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিশোরের।

'ওকে বের করে আনা দরকার,' বললো কিশোর। 'ভেবে দেখো, আনতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হই আমরা, ডয়টের হাতে ধরা পড়ি, কি হবে? একজনের জায়গায় ছয়জনকে জিম্মি হিসেবে পেয়ে খুশি হবে সে। ডেভিডের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও আটকাবে। এতোজনকে খুন করার দুঃসাহস তার হবে না। জানে, তাহলে আর পার পাবে না

কিছু নেই। পুলিশ তখন এমনভাবে লাগবে তার পেছনে, না ধরে ছাড়বে না। আর ধরা পড়লে নির্ঘাত ফাঁসি। কাজেই, দু-তিন দিন আটকে থাকা ছাড়া আর কিছুই হবে না আমাদের। তবে ডক্টর ফেবারের ফরমুলা যাবে। সেটা এমনিতেও যাবে, ডেভিডকে আমরা ছাড়িয়ে আনতে না পারলে।'

গোয়েন্দাপ্রধানের যুক্তি মেনে নিলো অন্যেরাও।

পরের আলোচনাঃ কি করে উদ্ধার করে আনা যায়? ঠিক হলো সেটাও।

সুতরাং, আবার মাউন্ট পেলির উদ্দেশে রওনা হলো ওরা, সেদিনই বিকেলে।

সকাল বেলা যেখানে গাড়ি রাখা হয়েছিলো, সেখানেই এসে থামলো মাইক। সবাই বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। উঠতে শুরু করলো ওপরে, এমনভাবে এমন দূরত্বে রইলো, যাতে সবাই সবাইকে দেখতে পায়। এতে আরও একটা সুবিধে, কেউ থাকছে ওপরে, কেউ ডানে, কেউ বাঁয়ে, কেউ নিচে।

খুব ধীরে, সাবধানে উঠে চললো ওরা। লক্ষ্য, জ্বালামুখ।

চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছেই থমকে গেল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লো এখানে ওখানে। একটা পাথরের স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক!

উলফ আর ডিন। নিচের সরু পথের দিকে ওদের নজর। পায়চারি করছে।

একবার মাইকের এতো কাছাকাছি চলে এলো, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেতো। ঠ্যাঙ ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বাঁদরমুখোকে চিত করে ফেলার লোভটা অনেক কষ্টে সামলালো সে। পাথরের মতো জমে বসে রইলো ঝোপের ভেতরে।

ভয়টকেও দেখা গেল। হাত তুলে ইশারায় ডাকলো সঙ্গীদের। তারপর নিচে নামতে শুরু করলো।

ওরা বেশ খানিকদূর নেমে যেতেই আড়াল থেকে বেরোলো গোয়েন্দারা। শত্রুরা সরে যাচ্ছে। এই সুযোগে খোঁজার কাজটা সেরে ফেলা দরকার।

গাছটা যেখানে কাত হয়ে আছে, সেই ফাটলের কাছে চলে এলো ওরা। জোরে জোরে দম নিচ্ছে। বেশ পরিশ্রম হয়েছে এখানে আসতে। উঁকি দিলো ফাটলের ভেতরে।

'অনেক গুহা আছে আশেপাশে,' মাইক জানালো। 'চলো, খুঁজি ওগুলোত।'

খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে গেল ডেভিডকে, প্রায় আচমকাই বলতে হবে। একটা গুহার ভেতরে। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। উদ্ধারকারীদের দেখে জ্বলজ্বল করে উঠলো তার চোখ।

দ্রুত তার বাঁধন খুলে দেয়া হলো। কিন্তু অনেকক্ষণ বাঁধা অবস্থায় থাকায় রক্ত চলাচল ঠিকমতো করতে পারেনি, অবশ হয়ে গেছে যেন হাত-পা, দাঁড়াতেই পারছে না বেচারা।

বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানালো ডেভিড। তারপর বললো, 'দাঁড়াতেই তো

পারছি না। যাবো কি ভাবে?'

'কিচ্ছু ভেবো না,' অভয় দিয়ে বললো মাইক। 'দরকার হলে নিয়ে যাবো তোমাকে। আমি আর মুসা থাকতে কোনো অসুবিধে হবে না তোমার। চলো।'

গুহা থেকে বের করে ঢাল বেয়ে ডেভিডকে ওপরে আনতে যথেষ্ট কষ্ট হলো ওদের।

চূড়া থেকে নামার সময় হলো আরো বেশি অসুবিধে। সকাল থেকেই আকাশ খারাপ ছিলো, হঠাৎ ঝমঝম করে নামলো বৃষ্টি, একেবারে মুষলধারে। এসব এলাকায় এরকমই হয়। নামে, খুব বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিয়ে যায়।

ভিজেছে, তাতে তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু পথ সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে আছাড় খাওয়ার ভয় আছে, আর খেলে হয়তো গড়িয়ে গিয়ে পড়তে হবে একেবারে গোড়ায়। হাড়গোড় ভাঙবেই।

অর্ধেক নেমেছে, এই সময় দেখা গেল, ফিরে আসছে ভয়ট আর তার সহকারীরা।

'খাইছে!' আঁতকে উঠে বললো মুসা। 'এবার লুকাই কোথায়? কোনো জায়গাই তো দেখছি না!'

ডেভিড বললো, 'আমার জন্যেই তোমাদের এতো কষ্ট করতে হচ্ছে। আমাকে ফেলে চলে যাও। যা হয় হোক।'

'গাধা নাকি?' বললো মাইক। 'এতো কষ্টের পর ফেলে যাবো। ...ওই যে, কুয়াশা আসছে। লুকানোর জায়গা পাওয়া যাবে।'

পথ পিচ্ছিল করে যে বৃষ্টি অসুবিধেয় ফেলেছিলো, সেই বৃষ্টিই গাঢ় কুয়াশার জন্ম দিয়ে এখন বাঁচিয়ে দিলো ওদের।

দেখতে দেখতে কাছে চলে এলো কুয়াশা।

'কুইক!' বলে উঠলো মাইক। 'জলদি কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ো সবাই।'

ডেভিডকে বস্তার মতো পিঠে তুলে নিয়ে কুঁজো হয়ে ছুটলো মাইক। বললো 'একজন আরেকজনের হাত ধরে রাখো। ছাড়বে না। তাহলে হারাবে না।'

মুসা ধরলো মাইকের শার্ট, তার হাত ধরলো কিশোর, তার হাত রবিন, সব শেষে জিনা। রাফিয়ান চললো পাশে পাশে। এই এলাকা মাইকের পরিচিত, কুয়াশার মধ্যেও চলতে পারবে।

নীরবে এক সারিতে এগিয়ে চললো দলটা।

সত্যিই চেনে এই এলাকা মাইক, ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এমনভাবে চলছে, যেন নিজের বাড়িতে হাঁটছে।

নেমে চলেছে ঢাল বেয়ে।

একসময় বেরিয়ে এলো কুয়াশার ভেতর থেকে।

একটু দূরেই দেখা গেল মাইকের গাড়ি। ছুটলো সবাই সেদিকে।

'আল্লাহরে!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। পেছন ফিরে বললো, 'কুয়াশা, তোকে

সেলাম। বাঁচিয়ে দিলি।'

তার কথার ধরনে হেসে উঠলো অন্যেরা।

'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তোমাদেরকে!' মুসা আর কিশোরের মাঝখানে বসেছে ডেভিড। গাড়ি ছুটে চলেছে। 'ইস্, কি জঘন্য সময় গেছে ওই গুহার মধ্যে। নিজের ওপর খুব রাগ হয়েছে, এতো সহজে ব্যাটাদের হাতে ধরা দিলাম বলে। এমনভাবে ধরে নিয়ে গেল, যেন আমি একটা শিশু। আমার ঘরে লুকিয়ে বসেছিলো। যেই ঢুকলাম, মাথার ওপর চাদর ফেলে জড়িয়ে ধরে…'

'থাক থাক, এতো দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'আপনার বাবার কথা ভাবুন এখন। কি খুশিই না হবেন। ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন উনি, বুঝতেই তো পারছেন।'

টেলিফোনে খবর শুনে প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না ডক্টর ফেবার। সম্মেলন থেকে তাড়াহুড়ো করে হোটেলে ফিরে এলেন। তারপর বাপ-ছেলের এক নাটকীয় মিলন দৃশ্য। চোখ ছলছল করে উঠলো মুসা আমানের। তার মনটা বরাবরই খুব নরম। এসব দৃশ্য দেখলেই চোখে পানি এসে যায়।

ডক্টর ফেবারের চোখে পানি, মুখে হাসি। ডেভিডকে যেমন করে জড়িয়ে ধরেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এক এক করে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেমেয়েদেরকেও। মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

ডেভিডের উদ্ধার উপলক্ষ্যে সেরাতে বিরাট এক পার্টি দিলেন ফেবার। অনেক রাত পর্যন্ত নাচানাচি করলো ওরা। খেলো, আনন্দ করলো।

পুলিশকে জানালো ডেভিড, কিভাবে তাকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কোন্ জায়গায় রাখা হয়েছিলো, সেকথাও জানালো। জায়গাটার বিশদ বর্ণনা দিলো মাইক, ওই এলাকা ডেভিডের চেয়ে ভালো চেনে সে। পুলিশ গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু ভয়ট কিংবা উলফ-ডিনের টিকির সন্ধানও পেলো না। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে ওরা।

'এখানকার পুলিশ কোনো কাজের না,' রাতে শোবার ঘরে বিছানায় বসে মুসা বললো। 'ধরার জন্যে ছুটে গেছে। যেন তাদের জন্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে ব্যাটারা।'

মারটিনিক-পুলিশের ক্ষমতা সম্পর্কে পরদিনও মুসার ধারণা বদলালো না। কারণ, সেদিনও তিন-শয়তানকে ধরতে পারলো না ওরা। হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিশ বললো, 'ওরা দ্বীপে নেই। পালিয়েছে।'

সম্মেলনের শেষ দিন। হোটেলে ফিরে এসেছেন ডক্টর ফেবার আর মিস্টার পারকার। বললেন, পরদিন ছোট একটা জাহাজ ভাড়া করে বেড়াতে যাবেন সাগরে। আটলান্টিকের মারটিনিক উপকূলে উত্তর-পুব দিকে একটা ফিশিং পোর্ট আছে, ওটা

জেলেদের রাজত্ব'। ওখানেই ছেলেদের নিয়ে যাবেন, বললেন ফেবার। মহাসাগরের বিশাল ঢেউকে অগ্রাহ্য করে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে কিভাবে মাছ ধরতে যায় জেলেরা, কি দুঃসাহসের কাজ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তা-ই দেখতে পাবে ছেলেরা।

পরদিন রওনা হলো জাহাজ। সেই জেলে-বন্দরে এসে পৌঁছলো।

রেলিঙে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের কাজ দেখছে ছেলেরা।

হঠাৎ রবিন বললো, 'দেখো দেখো, ওই দু'জনকে চেনা চেনা লাগছে না?'

ছোট একটা জেলেনৌকা দেখা গেল, তীরে নোঙর করে আছে। দু'জন জেলে জাল নাড়াচাড়া করছে, একজন বিশালদেহী, আরেকজন বেঁটে।

সেদিকে চেয়েই গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করলো রাফিয়ান। জাহাজ থেকে নেমে ছুটে গেল নৌকাটির দিকে।

নৌকার ছোট ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো আরও একজন।

'ভয়ট!' বলে উঠলো জিনা। 'তিন ব্যাটাই আছে ওখানে!'

জাহাজ থেকে নেমে ছেলেমেয়েরাও ছুটলো সেদিকে। তিন গোয়েন্দা, জিনা, ডেভিড, মাইক।

লাফ দিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠেই ভয়টের হাত কামড়ে ধরলো রাফিয়ান।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে আরেক হাতে কুকুরটার গলার বেল্ট খামচে ধরলো ভয়ট, টেনে সরানোর চেষ্টা করলো। পারলো না। টানাটানিতে বেল্ট গেল ছিঁড়ে। আরও খেপে গেল রাফিয়ান। কামড় ছাড়লো না হাত থেকে।

বসকে বাঁচানোর চেষ্টা করলো না উল্ফ আর ডিন। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে নৌকা থেকে নেমে দিলো দু'জনে দু'দিকে দৌড়। ছেলেরাও দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'জনের পেছনে ছুটলো। জিনা গেল রাফিয়ানের দিকে।

তীরে জেলেদের ভিড়। এই ছুটোছুটি চোখে পড়লো ওদের। কৌতূহলী হয়ে উঠলো। দু'জন লোক ছুটছে, পেছনে ছুটছে কয়েকটা ছেলে। 'ধরো! ধরো!' বলে চেঁচাচ্ছে।

জেলেরা ভাবলো চোর। কাজকর্ম সব ফেলে ছুটলো 'চোরের' পেছনে।

আর কি পালাতে পারে?

সহজেই ধরা পড়লো উল্ফ।

ডিন ঘুসি মেরে ফেলে দিলো দু'জন জেলেকে। ফল আরও খারাপ হলো। তাকে ধরে কিলাতে শুরু করলো জেলেরা। ফাঁক দিয়ে ঢুকে মুসাও গোটা দুই কিল মেরে এলো। একান ওকান হয়ে গেছে হাসি। বললো, 'ভয়টটাকেও না কিলিয়ে ছাড়বো না।'

জিনার চেঁচামেচিতে ভয়টকেও ধরেছে জেলেরা। টেনেহিঁচড়ে নামালো নৌকা

থেকে। মুসা গিয়ে বললো, 'ওটা চোরের সর্দার।'

কিল–চড় ভয়টও এড়াতে পারলো না। বেচারার করুণ অবস্থা দেখে তাকে মাফ করে দিলো মুসা, কিল আর মারলো না।

ডক্টর ফেবার আর মিস্টার পারকারও জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন।

জেলেদের সহায়তায় তিন–শয়তানকে বন্দি করে স্থানীয় থানায় পুলিশের হেফাজতে দিয়ে এলেন। কমিশেয়ারের কাছে খবর পাঠালো থানার ইনচার্জ।

ওদিকে মারটিনিকে তখনও ভয়ট আর তার সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলো ওখানকার পুলিশ, খবর পেয়ে ছুটে এলো।

সেদিন রাতে জাহাজের খাবার ঘরে খেতে বসে ডক্টর ফেবার বললেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, হ্যারি, ভয়ট সত্যি ধরা পড়লো! তোমরা এসেছো বলেই, বুঝেছো। তোমরা আসাতেই ধরা পড়লো ব্যাটা। নইলে আমার সর্বনাশ করে ছাড়তো। ওর জ্বালায় কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। ফরমুলাটা শেষ করতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। তোমরা আমাকে বাঁচাতেই বুঝি এসেছো এখানে।'

'হয়েছে হয়েছে, থামো! লজ্জা পাচ্ছি,' হাত তুললেন মিস্টার পারকার।

ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরলেন ফেবার। বললেন, 'ডেভিড আর আমি জীবনে ভুলবো না তোমার কথা। জানি, তোমাদের ঋণ শোধ করা যাবে না। তবু তোমাদেরকে কিছু উপহার দিতে চাই। বলো, কার কি চাই?'

তিন গোয়েন্দা চুপ করে রইলো।

এমন ভাব দেখালা জিনা, যেন গভীর ভাবে ভাবছে, কি চাইবে? শেষে বললো, 'আমার কিছু চাই না, আংকেল। তবে রাফিয়ানের একটা মস্ত ক্ষতি হয়েছে। তার বহু পুরনো গলার বেল্টটা হারাতে হয়েছে। ছিঁড়ে ফেলেছে ভয়ট। নতুন যদি আরেকটা কিনে দেন...'

'হুফ!' গম্ভীর হয়ে ওপর–নিচে মাথা দোলালো চালবাজ কুকুরটা।

হাসির হুল্লোড় উঠলো।

হো হো করে হেসে উঠলেন এমনকি মিস্টার পারকারও, বিজ্ঞানী হ্যারিসন জনাথন পারকার, যাঁর গোমড়া মুখে মুচকি হাসিও ফোটে না সহজে।

হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরলেন ডক্টর ফেবার, অনেক দিন তিনিও হাসতে পারেননি এমন প্রাণখোলা হাসি।

—ঃ শেষ ঃ—

খেপা শয়তান

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৮৯

'মুসা ভাই,' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো ছোট্ট লিলিয়ান, 'দাও না খুঁজে আমার পুতুলটা! তোমরা তো গোয়েন্দা। এই নাও পঞ্চাশ সেন্ট, তোমাদের ভাড়া করলাম।'

হেসে ফেললো মুসা আমান। 'লিলি, পুতুল খোঁজার সময় নেই আমাদের।'

'আরও জরুরী কাজ আছে আমাদের, লিলিয়ান,' কিশোর পাশা বললো।

'হয়তো,' মুসার ছয় বছরের পড়শীর দিকে চেয়ে হাসলো রবিন মিলফোর্ড। 'ঘরেই কোথাও আছে। ভালোমতো খোঁজোগে, পেয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই করোগে,' আবার বললো মুসা। 'দেখছো না, হাতে কতো কাজ। বাবার এই প্রোজেক্টরটা সার্ভিসিং করতে হবে।'

'কিন্তু নিনিকে ছাড়া আমি থাকবো কি করে?' কাঁদতে শুরু করলো লিলি। 'ও উড়ে চলে গেছে। শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলো, হঠাৎ উড়ে চলে গেল। বিছানা সহ।'

চোখ মিটমিট করলো কিশোর। 'উড়ে গেল...'

'হয়েছে, লিলি,' বাধা দিয়ে বললো মুসা। 'খামোকা বানিয়ে গল্প বলো না। তুমি চাও, বাবার বকা খাই আমি?'

'না!' ফোঁপাতে শুরু করলো লিলি। 'কিন্তু আমার নিনি। ওকে তো আর ফিরে পাবো না!'

'এই লিলি, কেঁদো না,' রবিন সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো। 'পেয়ে যাবে...

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। রবিনের কথা শেষ না হতেই বললো, 'লিলি, নিনি কিভাবে উড়ে গেল?'

'উড়েই তো গেল!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলো লিলি। 'কাল রাতে ওকে বিছানায় শুইয়ে আমিও শুতে গেলাম। জানালার বাইরে চেয়ে দেখি, উড়ে গিয়ে সোজা গাছে উঠেছে। সকালে বাবা কতো খুঁজলো, পেলো না। চলেই গেছে আমার নিনি। আর কোনোদিন আসবে না।'

'বেশ,' বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'চলো, দেখবো।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'তাহলে প্রোজেক্টর?'

'পুতুল উড়তে পারে না, ফার্স্ট,' বললো রবিন।

'না,তা পারে না,' স্বীকার করলো কিশোর। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। 'সেজন্যেই দেখতে চাইছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

লিলির চোখ ভেজাই রইলো, কিন্তু মুখে হাসি ফুটেছে। 'চলো, দেখাবো।'

পাতাবাহারের বেড়ার ওধারে লিলিদের সীমানায় ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। পথের ধারে একটা পুরনো অ্যাভোকাডো গাছ দাঁড়িয়ে আছে, আরেক দিকের বেড়ার ওপাশে। মোটা ডাল এসে পড়েছে ডিকসনদের সীমানার মধ্যে। ডিকসন লিলির বাবার নাম। ডালটার নিচে মাটি দেখিয়ে লিলি বললো, 'ওখানে ঘুমাচ্ছিলো নিনি।'

গাছের ফল আর ঘন পাতার মধ্যে খুঁজে দেখলো ছেলেরা। নিচে জমে থাকা পাতা লাথি মেরে সরিয়ে খুঁজলো।

'এখানে নেই,' গাছের ওপর থেকে বললো মুসা।

'এখানেও নেই,' নিচে থেকে রবিন জানালো।

বেড়ার ধার দিয়ে হেঁটে রাস্তায় বেরিয়ে এলো কিশোর। একটা সরু ফুলের বিছানার মাঝখানে গজিয়ে উঠেছে গাছটা। ওখানে এসে খুঁজলো। বিছানার পাশে নরম মাটির দিকে চোখ পড়তেই ডাকলো, 'এই, দেখে যাও!'

ছুটে এলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

দেখালো কিশোর। গাছের গোড়ার নরম মাটিতে চারটে পায়ের ছাপ, স্পষ্ট। ছোট, সরু পা, বোধহয় স্নীকার পরা ছিলো।

'গাছে উঠেছিলো কেউ,' বললো কিশোর।

'কোনো বাচ্চা-টাচ্চা,' মুসা বললো। 'অনেক ছেলেমেয়ে আছে এদিকে, গাছে উঠতে পারে।'

'তা আছে। গাছে উঠে ডাল বেয়ে লিলিদের সীমানায় ঢুকে পড়েছিলো। মাটিতে নেমে পুতুলটা নিয়ে আবার উঠে পড়েছে।'

'ঠিক,' এক আঙুল তুললো রবিন। 'অন্ধকারে লিলির মনে হয়েছে, পুতুলটাই গাছে চড়েছে।'

'কিন্তু একটা পুতুল চুরি করতে আসবে কে?' প্রশ্ন রাখলো মুসা।

জবাব না দিয়ে বেড়ার ধার ধরে আবার হাঁটতে শুরু করলো কিশোর।

এই সময় অন্য পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। চেহারার সঙ্গে লিলির চেহারার অনেক মিল আছে।

'লিলি...আরে, মুসা? কি করছো এখানে?'

'নিনিকে খুঁজছে, মা,' লিলি বললো। 'ওরা গোয়েন্দা।'

হাসলেন মিসেস ডিকসন। 'হ্যাঁ, তা তো জানি। অযথা কষ্ট করছো তোমরা। নিনি গেছে।'

'আপনার ধারণা, চুরি হয়েছে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'প্রথমে শিওর ছিলাম না। লিলির বাবা অনেক খুঁজলো। পেলো না। পুলিসকেও জানানো হয়েছে।'

'পুলিশ কি বললো?' জানতে চাইলো কিশোর।

'রেগে গেছে। গতরাতে এই ব্লকে নাকি কয়েকটা চুরি হয়েছে।'

'আরও পুতুল?'

'না। একটা ড্রিল সেট, কয়েকটা টুলস, একটা মাইক্রোস্কোপ, আরও টুকিটাকি জিনিসের নাম বললো, ভুলে গেছি। চীফের অনুমান, কোনো ভ্যাগাবণ্ড কিংবা ছ্যাঁচড়া চোরের কাজ।'

'কোনো দুষ্টু ছেলেও হতে পারে,' মুসা বললো।

'ধরা পড়লে বুঝবে, যখন পিট্টি খাবে পুলিশের হাতে,' রবিন বললো।

হতাশ মনে হলো কিশোরকে। 'এখন আমারও মনে হচ্ছে, কোনো দুষ্টু ছেলেই হবে।'

আবার কাঁদতে শুরু করলো লিলি। 'আমার নিনিকে চাই! আমার নিনি!'

'খাইছে,' বলে উঠলো মুসা। 'পুতুল না পেলে তো সারাদিনই কাঁদবে।' কিশোরের দিকে ফিরে বললো, 'কয়েকটা শয়তানকে চিনি। চলো তো, ধমক দিয়ে দেখি।'

'পুতুলটা পেলে খুব ভালো হতো, বাবা,' বললেন মিসেস ডিকসন। 'নইলে লিলির যন্ত্রণায়...ওর বাবা আরেকটা কিনে দিতে চেয়েছে। ও নেবে না। বলে, নিনিকেই চাই। পুলিশ এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কান দিতে চায় না। কি যে করি?'

'তোমরাই খুঁজে দাও, মুসা ভাই,' কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করলো লিলি। 'এই নাও, পঞ্চাশ সেন্ট। আর নেই আমার কাছে।'

না নিলে লিলি বিশ্বাস করতে চাইবে না, তাই হাত বাড়ালো কিশোর। 'দাও। এখন তুমি আমাদের মক্কেল। বাড়িতে থাকবে, কান্নাকাটি করবে না, তোমার পুতুল খুঁজে দেবো আমরা। ঠিক আছে?'

আবার হাসি ফুটলো লিলির মুখে। মাথা কাত করে বললো, 'আচ্ছা। আমার নিনিকে এনে দাও, তিনজনকে তিনটে বড় চকলেট দেবো।'

কোথা থেকে কিভাবে খোঁজা শুরু করবে, আলোচনা করতে করতে মুসাদের বাড়ির দিকে চললো তিনজনে। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে, এই সময় শোনা গেল মুসার মায়ের চিৎকার, 'এই, এই এখানে কি করছো? এই, কে তুমি?'

মুসা দিলো দৌড়।

তার পেছনে কিশোর আর রবিন।

মুসাদের বাড়ির পেছন দিকে যখন পৌছলো তিন গোয়েন্দা, দেখলো, অদ্ভুত একটা

মূর্তি বেড়া ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল কালো দুটো পাখা।

হাঁ করে চেয়ে রইলো ওরা।

মুসার মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাগানের কিনারে। 'দেখো, কাণ্ড দেখো! ফুলগুলো মাড়িয়ে সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে!'

কিন্তু 'সর্বনাশ হওয়া' ফুলের দিকে নজর নেই ছেলেদের। ওরা বেড়ার দিকেই চেয়ে আছে। কালো পাখাদুটো হলো হাতাকাটা কোটের দুই কোণ। অদ্ভুত মূর্তিটার চেহারাও দেখতে পেয়েছে। পলকের জন্যে ফিরে তাকিয়েছিলো মানুষটা। হাড্ডিসর্বস্ব চেহারা, পুরু গোঁফ।

'খাইছে! বাচ্চা ছেলে তো নয়!' মুসা বললো।

ঘুরে গ্যারেজের দিকে দৌড় দিলো কিশোর। কিছু না বুঝেই তার পেছনে ছুটলো অন্য দু'জন।

হাত তুলে দেখলো গোয়েন্দাপ্রধান। প্রোজেক্টরটা নেই। খাপে ভরা ছিলো, খাপসহ গায়েব।

দুই

'কিছু বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলছে, 'কেন একটা প্রোজেক্টর, বাচ্চা মেয়ের একটা পুতুল, আর টুকিটাকি জিনিস চুরি করছে?' নাটকীয় ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত থামলো সে। 'হয়তো জিনিসগুলো তার দরকারই নেই।'

'তাহলে…,' মুসা শুরু করলো।

শেষ করলো রবিন, 'চুরি করলো কেন?'

প্রোজেক্টর চুরি যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পর, ডিনার সেরে এসে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, চুরিগুলো কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ নয়। প্রোজেক্টরটা চুরি যাওয়ার পর বেড়ার ধারে খুঁজে দেখেছে ওরা। লিলিদের বাড়ির ধারে গাছের নিচে যেমন পায়ের ছাপ ছিলো, মুসাদের বেড়ার ধারেও তেমনি ছাপ পাওয়া গেছে।

'তারমানে বলতে চাইছো।' মুসা বললো। 'লোকটার চুরি করার রোগ আছে?'

'ক্লেপটোম্যানিয়াক,' রবিন বললো।

কিশোর মাথা নাড়লো, 'আমার মনে হয় না। ক্লেপটোম্যানিয়াকরা লোকের বাড়িতে চুরি করতে আসে না। ওরা যায় দোকানে। যায়, সুযোগ খোঁজে, তারপর টুক করে কোনো একটা জিনিস তুলে পকেটে ভরে ফেলে।'

'ক্লেপটোম্যানিয়াকও নয়, জিনিসগুলোও তার দরকার নেই,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রবিন। 'তাহলে কেন চুরি করলো?'

'বোধহয় কিছু খুঁজছে।'

গোয়েন্দাপ্রধানের মুখের দিকে চেয়ে রইলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। বুঝতে পারছে না।

'তাহলে যে জিনিসটা খুঁজছে সেটা নিলেই পারে,' তর্ক করলো রবিন। 'যা খুশি তা-ই নিচ্ছে কেন? জানে না, কি খুঁজছে?'

'হয়তো ব্যাটার চোখ খারাপ,' মুসা বললো।

'তোমার যেমন বুদ্ধি,' বিরক্ত হলো রবিন। 'একটা পুতুল আর প্রোজেক্টরের তফাত কানাও বোঝে।'

'হতে পারে, ওগুলোর ভেতরে কোনো জিনিস লুকানো থাকার কথা। সেটাই খুঁজছে। শিকের ভেতরে তো হীরা পেয়েছি আমরা, মূর্তির ভেতরে পাথর। পাইনি?'

'তাই বলে সিনেমা প্রোজেক্টর আর পুতুলের মধ্যেও থাকবে!'

'থাকতেও পারে,' মুখ খুললো কিশোর। 'চুরি যাওয়া জিনিসগুলোর মাঝে হয়তো কোনো একটা মিল আছে। সেটা বুঝতে হবে আগে।'

'কি মিল?' বলতে বলতেই একটা তালিকা তুলে নিলো মুসা। 'লিলির পুতুল, বাবার প্রোজেক্টর। একটা ইলেকট্রিক ড্রিল কিট, একটা মাইক্রোস্কোপ, একটা ব্যারোমিটার, এক সেট কাঠ খোদাই করার যন্ত্র, এক সেট পাথর পালিশ করার যন্ত্র। আমাদের ব্লক থেকেই চুরি গেছে এসব জিনিস।'

চুপ করে আছে কিশোর। ভাবছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'মিলটা কি?' থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'সবগুলো ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র নয়।'

'সবগুলো যন্ত্রই নয়,' শুধরে দিলো রবিন।

'এমন কি খেলনাও নয়,' যোগ করলো কিশোর। কিংবা সবগুলোর মালিক বাচ্চারাও নয়। এমন হতে পারে, জিনিসগুলো সব একই দোকান থেকে কেনা হয়েছে।'

মাথা নাড়লো রবিন। 'না। পুতুল আর ব্যারোমিটার এক দোকানে বিক্রি হয় না।'

'আর আমার বাবার প্রোজেক্টরটাও এখান থেকে কেনা হয়নি,' মুসা বললো। 'কয়েক বছর আগে কিনেছে, নিউ ইয়র্ক থেকে। না, কিশোর, আমি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। সহজ কোনো কিছু। ভাবো, ভালো করে ভাবো।'

'সবগুলো কঠিন জিনিস,' বলেই শোধরালো মুসা। 'মানে, তরল নয়।'

'হ্যাঁ, তাতেই রহস্য ভেদ হয়ে গেল,' মুখ বাঁকালো রবিন। 'আহা, বাধা দিও না.'

হাত তুললো কিশোর। 'সবদিক ভেবে দেখতে হবে। বেশ, ধরা গেল কঠিন। সব কি ধাতব? না। সবগুলোর কি একই রঙ? না। সব…'

'সবগুলো বহনযোগ্য!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'বহনযোগ্য? এটাই বোধহয় জবাব। চলো, লিলির সঙ্গে কথা বলবো।'

কি কথা বলবে, সেটা জিজ্ঞেস করার আর সুযোগ পেলো না সহকারীরা, গিয়ে ততোক্ষণে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা তুলে ফেলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। পাইপের ভেতর দিয়ে এসে ওয়ার্কশপে বেরোলো তিনজনে। যার যার সাইকেল বের করে চেপে বসলো।

দরজা খুলে দিলেন মিসেস ডিকসন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পায়জামা পরা লিলি। চোখমুখ ফোলা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে, ঘুমায়নি।

'নিনিকে পেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, লিলি,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে শীঘ্রি পাবো। তুমি বলেছো, বিছানায় শুয়ে ছিলো নিনি। তারপর উড়ে গাছে উঠেছে। কি রকম বিছানা?'

'ওর নিজের বিছানা,' বললো লিলি।

'তা তো বুঝলাম,' অধৈর্য হয়ে উঠছে কিশোর। 'কিন্তু বিছানাটা কেমন? আমরা যেরকম বিছানায় শুই, সেরকম? ছোট করে বানানো?'

জবাব দিলেন মিসেস ডিকসন। 'না। পুরানো একটা ক্যারিইং কেস দিয়ে লিলির বাবা বানিয়ে দিয়েছে।'

'বাক্সটা কালো, না? বিশ ইঞ্চিমতো উঁচু? আগের দিনের ছোট ট্রাঙ্কের মতো, ছোট হ্যাণ্ডেলওয়ালা?'

'আমার বাবার প্রোজেক্টরের কেসের মতো!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা।

'হ্যাঁ। ওরকমই,' জানালেন মিসেস ডিকসন।

'থ্যাংকস,' চকচক করছে কিশোরের চোখ। 'লিলি, আবার আমরা আসবো। যাও, ঘুমাও গিয়ে।'

মুসাদের গ্যারেজের দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা। পুরোপুরি অন্ধকার তখনও হয়নি, কিছু আলো বাকি আছে। দেখা চলে।

'ক্যারিইং কেসেস!' বললো রবিন। 'যতো জিনিস চুরি হয়েছে, নিশ্চয় ওরকম কালো কেসের মধ্যে ছিলো।'

'হ্যাঁ, নথি,' ভোঁতা কণ্ঠে বললো কিশোর। 'জিনিসগুলোর মধ্যে এই একটাই মিল। ওই কালো খাপের মধ্যে কিছু খুঁজছে চোর।'

'কিন্তু কি?' মুসার প্রশ্ন। 'কি খুঁজছে?'

'হয়তো…,' থেমে গেল কিশোর।

গ্যারেজের পেছনে শব্দ। ভেতরে না বাইরে ঠিক বোঝা গেল না।

তিন রকমের আওয়াজ। তীক্ষ্ণ শব্দ, যেন কাঠের ওপর আঘাত হানছে কিছু। ভোঁতা শব্দ, চাপা গোঙানি আর গর্জনের মিশ্রণের মতো। আর খসখস, যেন নড়াচড়া করছে জীবন্ত কিছু।

সাইকেল রেখে ছুটে গ্যারেজে ঢুকলো ছেলেরা। পেছনের একমাত্র জানালা দিয়ে গিয়ে উঁকি দিলো। গোধূলির আলোয় দেখা গেল, মুসাদের বাড়ির ঘন ঝোপের ভেতরে হারিয়ে গেল একটা মূর্তি!

'চোর!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

গ্যারেজের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে পেছনে ছুটলো ওরা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর কোনো শব্দ কানে এলো না, কোনো নড়াচড়া নেই।

'গুপ্তচরও হতে পারে। আমাদের ওপর চোখ রাখছে। আড়িপেতে কথা শুনছে,' কিশোর বললো।

'কালো কোটওয়ালা সেই চোরটাই হয়তো,' রবিন বললো।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, নথি, এই লোকটা অনেক লম্বা। কোটওয়ালাটা বেঁটে ছিলো। ওই কালো খাপের পেছনে নিশ্চয় একাধিক লোক লেগেছে। কিংবা বলা যায় খাপের ভেতরের জিনিসের পেছনে।'

'একজন এখন জেনে গেল, ওরা কি খুঁজছে আমরা জানি,' গম্ভীর হয়ে বললো সহকারী গোয়েন্দা।

'হ্যাঁ,' আবছা অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করতে দেখা গেল কিশোরের চোখ, 'জানে। আর সেই কারণেই ওকে ধরতে পারবো আমরা। আমাদের কাছে আসতে বাধ্য করতে পারবো।'

'খাইছে! কিভাবে…'

মুসাকে কথা শেষ করতে দিলো না কিশোর। 'আমার ধারণা, এই ব্লকের ওপর নজর রাখবে সে, আমাদের ওপরও রাখবে। কালো খাপটা খুঁজবো আমরা…পেয়েও যাবো। এমন ভাব দেখাবো যেন আসলটাই পেয়েছি…'

'ফাঁদ!' একইসঙ্গে বলে উঠলো দুই সহকারী।

হাসলো কিশোর। 'হ্যাঁ, ছোট্ট একটা ফাঁদ, আমাদের চোর বাবাজীর জন্য; কিংবা হয়তো বাবাজীদের জন্যে।'

তিন

শহরের ওপর হালকা কুয়াশা। অন্ধকার রাত। রকি বীচের পথগুলো নির্জন, নীরব। এক

জায়গায় ল্যাম্প পোস্টের দুটো নিঃসঙ্গ আলো কুয়াশায় যেন কাঁপছে।

কোথায় যেন ঘেউ ঘেউ করে উঠলো একটা কুকুর।

ছুটে শূন্য রাস্তা পেরোলো একটা বেড়াল।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

তারপর গ্যারেজের আলোকিত দরজায় বেরোলো মুসা। পায়চারি করতে করতে বার বার তাকালো পথের দিকে, যেন কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে। এক-আধবার ফিরে চাইছে তার পেছনে ফেলে রাখা কয়েকটা কালো কেসের দিকে। জোগাড় করে আনা হয়েছে ওগুলো। এমনভাবে ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে সহজেই চোখে পড়ে।

হঠাৎ ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটে আসতে দেখা গেল কিশোর আর রবিনকে। কিশোরের হাতে আরেকটা কেস। হালকা কুয়াশায় ঢাকা পথ ধরে আসছে ওরা, উত্তেজিত হাবভাব।

'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

আরও এগিয়ে এলো দুই গোয়েন্দা।

'কিশোর ভাবছে, পেয়ে গেছি!' জবাব দিলো রবিন।

'দেখোই না আগে, চমকে যাবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর।

গ্যারেজের ভেতরে স্তূপ করে রাখা কেসগুলোর কাছে এসে বসলো তিন গোয়েন্দা।

হাতের কেসটা খুললো কিশোর।

কৌতূহলী চোখে ওটার ভেতরে তাকালো মুসা। 'খাইছে! কী!'

'এটাই চোর খুঁজছিলো,' জোরে জোরে জবাব দিলো কিশোর।

'এটা দিয়ে কি করবো আমরা?' জানতে চাইলো রবিন।

'কি করবো?' গাল চুলকালো কিশোর। 'আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এখানেই তালা দিয়ে রেখে যাবো। কাল সকালে খবর দেবো পুলিশকে।'

'হ্যাঁ, আজ দেরিই হয়ে গেছে,' বললো মুসা।

'আমার বাড়ি যাওয়া দরকার,' রবিন বললো। 'যা করার কাল সকালেই করা যাবে।'

গ্যারেজের কোণে একটা বেঞ্চের ওপর কেসটা রেখে, আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। দরজা লাগালো। সাইকেলে চড়ে মুসার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে প্যাডাল করে ব্লকের কোণের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন আর কিশোর। মুসা গিয়ে ঢুকলো তাদের বাড়িতে।

কিছুক্ষণের জন্যে কুয়াশাচ্ছন্ন পথ আবার নীরব, নির্জন।

যায়নি কিশোর আর রবিন। কোণের কাছে পৌঁছেই একটা অন্ধকার ছায়া দেখে নেমে পড়লো, সাইকেল দুটো লুকালো একটা ইউক্যালিপটাসের ঝাড়ের ভেতরে।

তারপর পা টিপে টিপে চলে এলো মুসাদের বাড়ির পেছন দিয়ে ডিকসনদের সীমানার মধ্যে। উঁচু পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলো।

মুসাদের গ্যারেজের সামনেটা অন্ধকার। চোখের পলকে উঠে গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ওখানে চলে যেতে পারবে দুই গোয়েন্দা।

মুসার শোবার ঘরে আলো। জনালায় দেখা গেল তাকে। কাপড় বদলাচ্ছে। কাপড় বদলে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে যেন হাওয়া খেলো কিছুক্ষণ, হাই তুললো কয়েকবার, তারপর ভেতরে চলে গেল। আলো নিভলো।

কুয়াশায় ঢাকা রাত সেই একই রকম রয়েছে। কিছুই নড়ছে না।

আধ ঘন্টা পেরোলো।

ঝিঁঝি ধরে গেছে কিশোরের বাঁ পায়ে।

ঠাণ্ডায় রবিনের দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগতে চাইছে।

ডাস্টবিনে খাবার খুঁজছে সেই বেওয়ারিস বেড়ালটা, খুটখাট শব্দ করছে।

জোরে কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে চলে গেল দু'জন লোক, থামলো না। পরের ব্লকের কাছে মিলিয়ে গেল তাদের গলার আওয়াজ।

কিশোর ভাবলো, তার ফন্দি বুঝি কাজে লাগলো না। চোর আসবে না। মুসার বাবা-মা কোথায় যেন বেরিয়েছেন সন্ধ্যাবেলা, যে-কোনো সময় ফিরে আসতে পারেন। তাহলে ছেলেদের এতো কষ্ট সব বিফলে যাবে।

রবিনের কাঁপুনি বাড়ছে।

অবশ হয়ে আসছে কিশোরের পা। উঠে পড়বে কিনা ভাবছে, এই সময় ঘটলো ঘটনা।

'কিশোর!' ফিসফিস করে বললো রবিন।

ড্রাইভওয়ের মাথায় দেখা দিলো একজন মানুষ। স্ট্রীটল্যাম্পের আবছা আলো পড়েছে তার মুখে। হাত কাটা কালো কোট আর পুরু গোঁফ।

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি,' জবাব দিলো কিশোর।

নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশে তাকালো ছোট্ট মানুষটা। ধীরে ধীরে এগোলো গ্যারেজের দিকে।

নিচুকণ্ঠে কিশোর বললো, ঢুকুক আগে। তারপর বাইরে থেকে দরজা আটকে দেবো। তুমি পাহারা দেবে পেছনের জানালা, আমি দরজা। মুসা ফোন করবে পুলিশকে।'

রবিন বললো, 'মনে আছে,' উত্তেজনায় কাঁপুনি চলে গেছে তার।

গ্যারেজের দরজার সামনে দাঁড়ালো লোকটা। কোটের পকেট থেকে কি যেন বের করে তালায় ঢোকালো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো সে।

'চলো, কুইক!' বলে উঠলো কিশোর।

পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে সেখান দিয়ে এপাশে চলে এলো দু'জনে। উঠে দাঁড়াতেই চোখে এসে পড়লো উজ্জ্বল আলো। ধাঁধিয়ে দিলো চোখ।

'আরে, কি...!' চেঁচিয়ে বললো রবিন। অন্ধ হয়ে গেছে যেন। আলোটা এসেছে গ্যারেজের প্রায় লাগোয়া পাতাবাহারের বেড়ার কাছ থেকে।

নিভে গেল আলো। শুরু হলো অদ্ভুত একটা শব্দ, কাঁপা কাঁপা, জোরালো। ভয়াবহ কোনো বুনো জানোয়ারের রক্ত–পানি–করা চাপা গর্জন যেন।

আলো যেখান থেকে এসেছিলো, শব্দটাও সেখান থেকেই এলো।

ভয়ে ভয়ে একবার বেড়ার দিকে, আরেকবার গ্যারেজের দিকে তাকাচ্ছে ছেলেরা, এই সময় দেখা গেল একটা ভূতুড়ে চেহারা।

মানুষের মুখ নয়। কোনো জন্তু। চওড়া, কুৎসিত। কালো চুল। লাল টকটকে চোখ। বিশাল হাঁয়ের ভেতর দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ণধার দাঁত। মস্ত মাথার দু'পাশে বড় বড় দুটো শিং। ভয়ংকর চেহারা। অনেকটা ফসফরাসের আলোর মতো আভা ছড়াচ্ছে মুখ থেকে। 'কিহ্...কিহ্...কিশোর!' কোনোমতে বলতে পারলো রবিন।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো দুই গোয়েন্দা। স্থির, আঙুল নড়ানোরও সাহস নেই।

'কিশোর! রবিন!' বাড়ির ভেতর থেকে মুসার ডাক শোনা গেল। শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ড্রাইভওয়ের দিকে দেখাচ্ছে। 'নিয়ে যাচ্ছে তো! কেসটা নিয়ে যাচ্ছে!'

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেছে চোর। ড্রাইভয়ে পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। তার কোটের ঝুল উড়ছে বাদুড়ের ডানার মতো।

আগে সামলে নিলো রবিন। 'কিশোর! পালাচ্ছে!' বলেই দিলো দৌড়, চোরটাকে ধরার জন্যে। জন্তুটার কথা ভুলে গেছে আপাতত।

তার পেছনে ছুটলো কিশোর।

রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা লাল একটা ডাটসান গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে লোকটা।

মুসাও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

চোরটাকে তাড়া করে যাচ্ছে তিনজনে, হঠাৎ একটা লোকের গায়ে ধাক্কা লাগলো রবিনের।

'এই, কি হয়েছে?' ধমক দিয়ে বললো লোকটা। 'দেখো না কিছু?' বলে চেপে ধরলো রবিনের হাত।

রোগাটে একজন মানুষ, মাথায় ধূসর চুল। চোখে রিমলেস চশমা, সেটা কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে তার গায়ের ধূসর কোটের সঙ্গে। বাঁ চোখটা কেমন যেন অস্থিরভাবে কাঁপে, যেন কড়া এক স্কুলমাস্টার।

'ওই ব্যাটা চোর!' লাল গাড়ির দিকে ছুটে যাওয়া লোকটাকে দেখিয়ে কৈফিয়ত

দিলো রবিন।

'পালাচ্ছে তো?' গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

গর্জে উঠলো ডাটসানের এঞ্জিন। চলতে শুরু করলো।

'চোরের পিছু নেয়া বিপজ্জনক, ইয়াং ম্যান,' উপদেশ দিলো রোগাটে লোকটা। 'কি চুরি করেছে?'

'কালো একটা ক্যারিইং কেস!' রাগ করে বললো রবিন। 'আপনি আটকেই তো দিলেন...'

'কি ছিলো কেসটাতে?' বাধা দিয়ে বললো লোকটা।

'কি ছিলো জানি না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলো কিশোর।

'জানে না,' বিড়বিড় করলো লোকটা। 'চোর চোর খেলা...যাও, বাড়ি যাও। গিয়ে ঘুমাও।'

রবিনের হাত ছেড়ে আচমকা ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। লোকটা ব্লকের কোণ ঘুরে হারিয়ে গেল। 'এই ব্লকেই থাকে ও, মুসা?'

'দেখিনি আর কখনও,' জবাব দিলো মুসা। 'এই কিশোর, আমাদের আটকে রেখে চোরটাকে পালানোর সুযোগ করে দিলো না তো?'

'হতেও পারে।'

'কিশোর,' রবিন বললো। 'ওই চেহারাটা...যেটা দেখলাম একটু আগে...কি ওটা?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'জানি না।'

'কিসের চেহারা?' জানতে চাইলো মুসা।

অদ্ভুত চেহারাটার কথা মুসাকে জানালো রবিন। মুসার শোবার ঘরের জানালা থেকে গ্যারেজের পেছনটা দেখা যায় না। আজব জীবটাকে দেখতে পায়নি সে।

'খাইছে!' শুনে ঢোক গিললো মুসা। 'হয়তো চোখের ভুল। কুয়াশা পড়ছে তো।'

'সে যা-ই হোক,' রবিন মনে করিয়ে দিলো। 'চোরটা পালিয়েছে।'

'হয়তো পারেনি,' দুই সহকারীর দিকে চেয়ে হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওরকম কিছু ঘটতেই পারে, ভেবে, কেসের মধ্যে একটা "হোমার" (কিশোরের নিজের আবিষ্কার ছোট একধরনের বেতার যন্ত্র) ভরে দিয়েছি। বেশি দূরে না গিয়ে থাকলে, পিছু নিতে পারবো।'

'দূরেই গেছে কিনা কে জানে,' মুসা বললো।

'মনে হয় না,' বললো কিশোর। দু'দিন ধরে এই ব্লকে আনাগোনা করছে সে। নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও থাকার জন্যে উঠেছে। চলো, দেখি।' ছোট একটা যন্ত্র বের করে রিসিভিং সুইচটা অন করলো সে। এক মুহূর্ত নীরব রইলো যন্ত্র। তারপর শুরু

করলো একটানা বিপ···বিপ···বিপ···

'আছে!' তুড়ি বাজালো কিশোর। 'বড়জোর দু'মাইল দূরে।'

সাইকেল আনার জন্যে দৌড় দিলো তিনজনে।

চার

শব্দ অনুসরণ করে সাগরমুখো এগিয়ে যেতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। হালকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্যাডাল করে চলেছে। মাঝে মাঝে থেমে যন্ত্রের দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। বিপ বিপ করেই চলেছে যন্ত্র, দিক নির্দেশ করছে— যে দিকে রয়েছে প্রেরক যন্ত্র।

'সৈকতের ধারে কোথাও,' চলতে চলতে বললো কিশোর। 'হয়তো বন্দরের কাছে।'

কয়েকটা বিশেষ কাজ করে কিশোরের যন্ত্র। বিপ বিপ তো করেই, শব্দটা কোন্‌দিক থেকে আসছে সেটা বোঝানোর জন্যে একটা কাঁটাও রয়েছে। ঘোরে কাঁটাটা। প্রেরক যন্ত্র যেদিকে থাকে সেদিকে মুখ করে থাকে মাথা। একটা বিল্ট-ইন ইমারজেন্সি সিগন্যাল সিসটেম রয়েছে। প্রেরক যন্ত্রের কাছে থেকে কেউ যদি 'বাঁচাও' কিংবা 'হেল্প' বলে চেঁচায়, দপদপ করে একটা উজ্জ্বল লাল আলো জ্বলতে থাকে রিসিভারে।

'শব্দ বাড়ছে,' বললো মুসা।

যন্ত্রটার দিকে চেয়ে কিশোর বললো, 'বাঁয়ে দেখাচ্ছে।'

তারমানে বন্দরে নেই লোকটা। মোড় নিয়ে কোস্ট রোড ধরে চললো ওরা। নির্জন পথ। এই কুয়াশার মধ্যে নেহাত ঠেকা না পড়লে বাইরে বেরোবে কে? রাস্তায় গাড়িই নেই। আবহাওয়া ভালো হলে এ-সময়ে এখানে তরুণ-তরুণীদের ভিড় থাকে, হাওয়া খেতে বেরোয়। এখন একজনকেও দেখা গেল না।

নীরবে প্যাডাল ঘুরিয়ে চললো ছেলেরা। যতোই এগোচ্ছে, বাড়ছে বিপ বিপ।

মোটেল এলাকা পেরোলো ওরা।

হঠাৎ কমে গেল শব্দ।

'পেরিয়ে এসেছি!' বলে উঠলো রবিন।

'হ্যাঁ, ওই মোটেলগুলোর কোনোটাতে রয়েছে,' মুসা বললো।

'তা-ই,' একমত হলো কিশোর। 'সাইকেল রেখে হেঁটে যাবো। হুঁশিয়ার থাকবে। চোর ব্যাটা এখন চেনে আমাদেরকে।'

দুটো মোটেলের মাঝের ফুলের ঝাড়ে সাইকেলগুলো লুকিয়ে রাখলো তিন গোয়েন্দা। বাড়িগুলোর পেছনের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগোলো। আবার বেড়ে

গেল রিসিভারের বিপ–বিপ। কাঁটা নির্দেশ করছে সৈকতের দিকে।

'ওদিকে!' হাত তুলে দেখালো কিশোর।

রাস্তা আর সৈকতের মাঝখানে আরেকটা মোটেল, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে। লাল–সবুজ নিয়ন আলোয় জ্বলজ্বল করছে নামটা, 'দি শোর রেস্ট'। সদর দরজার আশেপাশে রঙিন স্পটলাইট জ্বলছে। ছোট একতলা একটা বাড়ি, তিন খণ্ডে বিভক্ত, রাস্তার দিকে মুখ করা, আকৃতি ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো। প্রতিটি খণ্ডের সামনে কারপার্কে গাড়ি পার্ক করা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি গাড়ির ওপর নজর বোলালো ছেলেরা।

'নেই,' মাথা নাড়লো মুসা। 'কিশোর, লাল ডাটসানটা নেই।'

'হোমারটা দেখে ফেললো না তো?' রবিন বললো। 'আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্যে হয়তো মোটেলে ফেলে গেছে।'

'তাই বোধহয় করেছে,' কিশোরের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'ওদেরকে ফাঁকি দিতে চেয়েছি এটা নিশ্চয় বুঝে গেছে,' মুসা বললো। 'খুলে থাকলে কসের ভেতর লোহার একটা পাইপ ছাড়া আর তো কিছু পায়নি...'

'হ্যাঁ, ফাঁদ পেতেছিলাম, বুঝে গেছে। তবে এখুনি হাল ছেড়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না। হোমারটা কোথায় ফেলে গেছে, অন্তত দেখা দরকার।'

রিসিভারে চোখ রেখে, কাঁটার নির্দেশ মতো এগিয়ে চললো কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা। বাড়িটার পাশ ঘুরে চলে এলো পেছনে। খোলা ছড়ানো সৈকত। একধারে পাম গাছের সারি। বালির উঁচু উঁচু ঢিবি রয়েছে এখানে ওখানে। নির্জন। অন্ধকার। কুয়াশায় ঢাকা।

বাড়ির একটা খণ্ডের দিকে ফিরে আছে রিসিভারের কাঁটা।

'অন্ধকার, কিশোর,' ফিসফিস করে বললো রবিন। 'ওই বাড়িতে কেউ নেই।'

'চলে গেছে!' মুসা বললো।

'গেছে, হয়তো আবার ফিরে আসবে,' আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর। 'এমনও হতে পারে কেসটা খোলেইনি, ফেলে গেছে। এসো, যাই।'

সাবধানে এগিয়ে চললো গোয়েন্দাপ্রধান, বাড়ির অন্ধকার অংশের দিকে। মাথা নুইয়ে কুঁজো করে রেখেছে শরীর। পেছনে দুই সহকারী। নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছে, পারছে না। জুতোর তলায় মাড়াচ্ছে আলগা নুড়ি। শব্দ হয়েই চলেছে।

রিসিভারের কাঁটাটা স্থির হয়ে আছে মোটেলের দিকে। বিপ বিপ জোরালো হচ্ছে।

হঠাৎ এক ধাক্কায় কিশোর আর রবিনকে ফেলে দিয়ে মুসাও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

অন্ধকার বাড়িটার পেছনের দরজা খুলে যাচ্ছে।

হালকা–পাতলা একটা মূর্তি বেরিয়ে এলো অন্ধকার আকাশের নিচে, চুপ করে

দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো কুয়াশার দিকে। মুখ দেখা যাচ্ছে না।

যেখানে পড়েছে, পড়ে রইলো ছেলেরা। কুয়াশা ছাড়া আর কোনো আড়াল নেই, ইচ্ছে করছে বালির নিচে ঢুকে যায়। সেটাও সম্ভব নয়।

অন্ধকারে সাবধানে নজর বোলাচ্ছে যেন লোকটা, বোধহয় কিছু খুঁজছে। কোনো শব্দ কানে গেছে, কিংবা কিছু দেখেছে।

বিপ–বিপ শব্দ! বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা মনে পড়লো কিশোরের। সঙ্গে সঙ্গে 'অফ' বোতামটা টিপে বন্ধ করে দিলো। আস্তে করে ছাড়লো চেপে রাখা নিঃশ্বাস।

দীর্ঘ আরেক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মানুষটা। তারপর দরজা থেকে নেমে ঘুরে বাড়ির কোণের দিকে এগোলো। মোড় নেয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যে মুখে পড়লো মোটেলের অন্য অংশ থেকে আসা আলো।

'কিশোর!' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

গোয়েন্দাপ্রধানও দেখতে পেয়েছে। সেই ধূসর স্যুট পরা লোকটা, যে তাদের পথ আটকেছিলো।

'চোরের দোসর!' মুসা মন্তব্য করলো।

'তাই তো মনে হয়,' বললো কিশোর।

আরও কয়েক মিনিট ওভাবেই পড়ে থাকলো ছেলেরা। লোকটা ফিরলো না। উঠে কোণের দিকে এগোলো ওরাও। কাউকে দেখতে না পেয়ে মোটেলের দুটো অংশের মাঝখান দিয়ে পা টিপে টিপে এগোলো। চত্বরে দেখা গেল লোকটাকে। অফিসের সামনে দাঁড়ানো কালো একটা মার্সিডিজ গাড়িতে উঠছে।

স্টার্ট নিয়ে চলে গেল দামী সুন্দর গাড়িটা।

অন্ধকার বাড়িটার কাছে ফিরে এলো আবার ওরা। পেছনের একটা জানালার পাল্লা আংশিক খোলা। পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। বাইরের স্পটলাইটের আলোয় আবছা আলোকিত ঘর। লোক নেই। মেঝেতে পড়ে রয়েছে কালো কালো কি যেন।

পেছনের দরজার নব ধরে মোচড় দিলো কিশোর, তালা নেই, খুলে গেল। ঢুকলো ভেতরে। রবিন আর মুসাও ঢুকলো।

'জানালায় পাহারা দাও,' মুসাকে বললো কিশোর।

মেঝেতে পড়ে রয়েছে অনেকগুলো কালো কেস। ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো কিশোর আর রবিন।

'মনে হয় এখানেই আছে সব,' রবিন বললো। 'যতোগুলো জিনিস চুরি করে এনেছে, সব।'

'হ্যাঁ,' কিশোর মাথা ঝাঁকালো। 'লিলির পুতুলটা আছে, আমান্দের লোহার পাইপটাও। এসব কেসের মধ্যে কি খুঁজছে চোরটা?...রবিন, বাঁ থেকে শুরু করো। আমি ডানদিক থেকে দেখছি। কি চাইছে, দেখি বোঝা যায় কিনা।'

খোঁজার তেমন কিছু নেই। ঘরটাতে কোনো জিনিসই নেই, কেসগুলো ছাড়া। সুটকেস নেই, কাপড়-চোপড় কিচ্ছু নেই। এমন কিছুই নেই, যেটা দেখে চোরের চুরি করার উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

জানালার কাছ থেকে মুসা জানালো, 'লাল একটা গাড়ি মোর নিচ্ছে। ডাটসান। এদিকেই আসছে।'

'বেরোঁও! কুইক্!' বলে উঠলো কিশোর।

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। জানালার নিচে ঘাপটি মেরে রইলো।

খানিক পরেই ঘরের আলো জ্বললো।

চোরটাকে এই প্রথম স্পষ্ট দেখলো তিন গোয়েন্দা। বেশ বেঁটে, মাত্র পাঁচ ফুট। মলিন একটা স্পোর্টস জ্যাকেট গায়ে, পরনে দোমড়ানো বাদামী প্যান্ট। জ্যাকেটের ওপরে রয়েছে সেই বিচ্ছিরি কালো কোটটা। এলোমেলো বাদামী চুলে জীবনে কোনোদিন চিরুণী চালিয়েছে কিনা সন্দেহ। পাতলা, চোখা চেহারা। ছোট দাঁত। ছুরির মতো নাক। ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ। পুরু গোঁফ। চেহারাটা দেখলেই ধাড়ি মেঠো ইঁদুরের কথা মনে পড়ে যায়।

'খাইছে!' জানালার নিচে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললো মুসা। 'চোরের মতো তো লাগছে না। ঠিক যেন ইন্দুর!'

'ভীতু ইঁদুর,' শুধরে দিলো রবিন।

খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কালো কেসগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। ভ্রূকুটি করলো। লম্বা নাকটা কুঁচকালো ইঁদুরের মতো করেই। যেন বাতাসে বিপদের গন্ধ শুঁকছে। ঠোঁট নড়ছে, নিজের সঙ্গেই কথা বলছে নাকি? এখান থেকে অবশ্য শোনা যাচ্ছে না কিছু। ছেলেদের কানে আসছে না ওর কথা।

কনুই দিয়ে দুই সহকারীকে গুঁতো দিলো কিশোর। 'ব্যাটা সন্দেহ করেছে, ঘরে লোক ঢুকেছিলো।'

'চলো, কেটে পরি,' পরামর্শ দিলো মুসা।

মাথা নিচু করে পিছাতে লাগলো ওরা। কিছু দূর সরে এসে ঘুরে দৌড়াতে শুরু করলো। এক ছুটে চলে এলো একটা টিবির আড়ালে। বাতাসে এখনও কুণ্ডুলী পাকাচ্ছে কুয়াশা। সৈকতের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা পামের সারিকে কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

'ব্যাটাকে ধরবো নাকি?' রবিন বললো। 'তিনজনে একসাথে গিয়ে ঝাপটে ধরলে ছুটতে পারবে না।'

রাজি হলো না কিশোর। 'না, নথি। মুসাদের বাড়িতে ধরা এক কথা ছিলো। বলতে পারতাম চোর। এখানে কি বলবো? তাছাড়া যদি সঙ্গে পিস্তল থাকে?'

'কিন্তু কিছু একটা করা দরকার,' হাত নিশপিশ করছে মুসার।

'পুলিশকে খবর দেবো,' বললো কিশোর। 'মুসা, তুমি পাহারায় থাকো। রবিন,

লাল ডাটসানটার নম্বর দেখো গিয়ে। আমি যাই। চীফ ফ্লেচারকে ফোন করবো। আমি এলে...' তার কথা শেষ হলো না।

জ্বলে উঠলো চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। একটা টিবির ওধার থেকে সাদা ঘন ধোঁয়া উঠছে।

টিবির চূড়ায় দেখা দিলো অদ্ভুত মূর্তি।

'সেই...সেই চেহারাটাই...!' কেঁপে উঠলো রবিন।

লম্বা শিং, লাল চোখ, তীক্ষ্ণ দাঁত, মুখে ফসফরাসের আলোর আভা। তখন শুধু চেহারাটা দেখেছিলো কিশোর আর রবিন। এখন দেখতে পেলো পুরো শরীর। রোমশ চামড়ায় ঢাকা। গলায় ঝোলানো একটা নেকড়ের খুলি। কোমরের বেল্টে ঝোলানো নানারকম বিচিত্র জিনিসঃ হাড়, ঘন্টা, ঝুমঝুমি, গমের শিষ। বুকেপিঠে জড়িয়ে রেখেছে একটা নেকড়ের ছাল।

'আল্লাহ্‌গো, বাঁচাও...,' কোনোমতে বললো মুসা। থরথর করে কাঁপছে। বেহুঁশ হয়েই যায় বুঝি।

নাচতে শুরু করলো বিচিত্র জীবটা। ঘন্টার টুংটাং, ঝুমঝুমির ঝনঝন হাড়ের সঙ্গে হাড়ের ঠোকাঠুকি, সব কিছু মিলে যেন এক বিচিত্র বাজনা। সেই সঙ্গে কিম্ভূত নাচ।

নাচতে নাচতে ছেলেদের দিকে এগোচ্ছে জীবটা।

'ওরে বাবারে, খেয়ে ফেললোরে!' চেঁচিয়ে উঠেই দৌড় দিলো মুসা।

পাঁচ

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে তিন গোয়েন্দা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। সৈকতের পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ছে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার দিচ্ছে দৌড়। কেউ কারও পেছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়।

বড় একটা পাথরের স্তূপ, লম্বালম্বি ভাবে সৈকতের ওপর দিয়ে গিয়ে নেমেছে সাগরের পানিতে। ডানে মোড় নিয়ে ওটার দিকে ছুটলো ছেলেরা।

স্তূপের ওপরে উঠে তারপর ফিরে তাকালো।

'নেই...চলে গেছে!' কম্পিত কণ্ঠে বললো রবিন।

বিছিয়ে রয়েছে যেন অন্ধকার, শূন্য সৈকত। দূরে কোস্ট রোড ধরে চলে যাচ্ছে দু'একটা গাড়ি, হেডলাইটের আলো টিমটিম করছে কুয়াশায়।

'কি...কি ওটা?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা। 'সত্যি দেখলাম তো?'

'নিশ্চয়ই,' জোর দিয়ে বললো রবিন।

'হ্যাঁ,' বসে পড়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। 'দেখেছি…কিন্তু কি ওটা, জানি না।'

মুসা আর রবিনও তার পাশে বসে পড়লো।

'ভূত না তো!' মুসার প্রশ্ন। 'পানির ভূত?'

'না, ভূত নয়,' বললো কিশোর। 'কোনো ধরনের…'

'চোখের ভুল?' বলে উঠলো রবিন।

'চোখের ভুল হয় কি করে?' প্রশ্ন রাখলো মুসা।

'জানি না,' মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান।

'শয়তান, বুঝেছো, শয়তান,' বললো রবিন। 'আধা জন্তু আধা মানুষ। হরর সিনেমায় দেখোনি? ওরকম।'

'শয়তান!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'আসল শয়তান! দোজখে থাকে যে ওই জিনিস?'

'চেহারাটা শয়তানের মতোই,' বললো কিশোর। 'যা-ই হোক ওটা আমাদের ভয় দেখাতে এসেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে,' রবিন বললো।

'হয়েছে মানে?' বললো মুসা। 'আরেকটু হলেই প্যান্ট খারাপ করে ফেলতাম।'

আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে জিরিয়ে নিলো ওরা। বার বার সৈকতের দিকে তাকাচ্ছে মুসা, কুয়াশার ভেতরে খুঁজছে। আবার যদি দেখা দেয় জীবটা! কিন্তু আর দেখা দিলো না।

'যাওয়া উচিত,' অবশেষে বললো কিশোর। 'সৈকত ধরে আর নয়। পথে উঠবো। ঘুরে গিয়ে মোটেলের ফাঁকে ঢুকবো। আগের প্ল্যান মতোই কাজ করবো। আমি পুলিশকে ফোন করতে যাবো, তোমরা কড়া নজর রাখবে চারদিকে। দেখো, আরও কেউ ওই ঘরটায় ঢোকে কিনা। আমি এখন শিওর, চোর একজন নয়, কমপক্ষে দু'জন। দরজায় দাঁড়িয়ে ছোট চোরটা কথা বললো। তখন ভেবেছিলাম, নিজের সঙ্গেই বলছে, আসলে তা নয়! নিশ্চয় পেছনে কেউ দাঁড়ানো ছিলো। দরজার বাইরে। সে-জন্যেই আমরা দেখতে পাইনি।'

'শয়তানের সঙ্গে বলেনি তো?' রসিকতা করলো রবিন।

'পোষা শয়তান!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

'ভয় নেই, মুসা আমান,' রবিন হাসলো। 'ওটা চলে গেছে।'

'আসতে কতোক্ষণ!…ওরে বাবারে! ওই দেখো!'

জমে গেল যেন তিনজনে।

আবার সেই ভয়ংকর চেহারা! পাথরের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামান্য

দূরে। নাচতে শুরু করলো ওটা, তালে তালে দুলতে লাগলো গলার নেকড়ের খুলি। ঝাঁকুনি লেগে বেল্টে ঝোলানো অদ্ভুত জিনিসগুলোর বিচিত্র বাজনাও শুরু হলো।

ভারি ফাঁপা গলায় কথা বলে উঠলো জীবটা। মনে হলো, চারপাশ থেকে আসছে শব্দ, কেমন যেন যান্ত্রিক।

'প্রেতকে যারা বিরক্ত করে, মরবে!'

দুড়দাড় করে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে সৈকতের ওপর দিয়েই আবার দৌড় দিলো ছেলেরা।

কয়েক পা এগিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে ধুড়ুস করে পড়লো রবিন। হুঁক করে বুকের বাতাস সব বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। শ্বাস নিতে কষ্ট হলো।

শব্দ শুনে ফিরে তাকালো অন্য দুই গোয়েন্দা।

স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে খড়খড়ে হাসি হেসে উঠলো জীবটা। মস্ত দুই লাফ দিয়ে নেমে এলো অনেকখানি। রবিনকে ধরতে চায় বোধহয়।

'ধরবো এবার, ধরবো! কচকচিয়ে খাবো!' সুর করে বললো ওটা।

ফিরে দাঁড়ালো মুসা। বন্ধুর বিপদ দেখে ভয়ডর চলে গেছে। রুখে দাঁড়ালো। একটা পাথর তুলে নিয়ে ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলো জীবটার মাথা সই করে।

'গঁক!' করে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল ওটা। তারপর আবার এগোলো রবিনকে ধরার জন্যে।

'এই কিশোর, দাঁড়িয়ে আছো কেন?' চেঁচিয়ে বললো মুসা। 'মারো, ব্যাটাকে মারো! মাথা ফাটিয়ে দাও!' বলতে বলতেই ছুঁড়ে মারলো আরেকটা পাথর।

কিশোরও আর চুপ করে রইলো না।

'বোকারা! বুঝবে মজা!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জীবটা।

ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে রবিন। সরে এসে সে-ও পাথর ছুঁড়তে শুরু করলো।

ঝিলিক দিয়ে উঠলো উজ্জ্বল আলো। এক ঝলক সাদা ধোঁয়া দেখা গেল। গায়েব হয়ে গেল দানবটা।

'গেছে!' ঢোক গিললো মুসা। 'হারামজাদা!'

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়ালো রবিন। মুসার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো, 'থ্যাংকস...'

'এতো সহজেই পালালো!' রবিনের কথায় কান নেই মুসার।

'চলো তো দেখি,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোয়েন্দাপ্রধানকে অনুসরণ করে আবার পাথরের স্তূপের ওপর ফিরে এলো দুই সহকারী। কুয়াশায় বেমালুম মিলিয়ে গেছে শয়তানটা। খানিক আগে ওটা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে বসে পড়ে দেখলো কিশোর। 'ছাই!' সাদাটে ছাইয়ের ছোট একটা স্তূপ! তাতে আঙুল রাখলো সে। 'গরম!'

শয়তানটা পুড়েই যেন হয়েছে ওই স্তূপ।

'চলো···বাড়ি যাই,' মুসার আর এসব ভালো লাগছে না।

'যাবো। পরে,' বললো কিশোর। 'আগে কাজ শেষ হোক।'

'আবার মোটেলে?'

'হ্যাঁ। আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি।'

ফোন পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই এলো পুলিশ। মাত্র কয়েকটা মিনিট। তবু ততো–ক্ষণেই দেরি হয়ে গেছে। মোটেলে পৌঁছে মুসা আর রবিন দেখলো, লাল ডাটসানটা নেই। ইঁদুরমুখো লোকটাও নেই। ঘরটায় পড়ে রয়েছে শুধু কালো খাপগুলো।

'ম্যানেজার বললো,' ছেলেদের জানালেন ইয়ান ফ্লেচার, 'লোকটা একা এসেছিলো। কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি। নিশ্চয় ভুয়া পরিচয় দিয়েছে। একমাত্র সূত্র এখন ওই ডাটসান গাড়িটা। ওটা খুঁজে বের করতে হবে। আর ওই শয়তান দেখানোটাও একটা বড় রকমের শয়তানী, আমি শিওর।'

মলিন হাসি হাসলো কিশোর।

'যাই হোক, ছেলেরা,' বললেন আবার চীফ। 'ভালো কাজ করেছো। সমস্ত চোরাই মাল এখানে আছে। মালিকদেরকে পৌঁছে দিতে হবে। আরেকটা কেসের সমাধান করে দিলে। থ্যাংক ইউ। চলো, গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেই।'

পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়ে কিশোর বললো, তাদের সাইকেল আছে, গাড়িতে যাওয়া লাগবে না।

মুসার বাবার প্রোজেক্টর, ওটার খাপ, আর হোমারটা নিয়ে মোটেলের ঘর থেকে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। ঝাড়ের ভেতর থেকে বের করে নিলো সাইকেল। তারপর নীরবে প্যাডাল করে চললো।

কিশোর যাবে স্যালভিজ ইয়ার্ডে, রবিন আর মুসা যার যার বাড়িতে।

একসময় বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'কাল সকালে এসো। কেসটা শেষ হয়নি এখনও। চোর এখনও ধরা পড়েনি। শয়তানের রহস্যও ভেদ করতে পারিনি আমরা। চোখের ভুল নয়, তিনজোড়া চোখ একসঙ্গে ভুল করতে পারে না।'

'না না, চোখের ভুলই,' শয়তান–রহস্যে নাক গলাতে আর রাজি নয় মুসা, তাই তাড়াতাড়ি বললো।

'কি করে চোখের ভুল হলো? তোমার ঢিল খেয়ে আর্তনাদ করে ওঠেনি? তার মানে ব্যথা পেয়েছে।'

'তুমি কি বলছো ওটা বাস্তব?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'তোমার আমার মতোই বাস্তব। তবে মানুষ না–ও হতে পারে।'

ছয়

'মোটেই শেষ হয়নি এই কেস,' বললো কিশোর। 'বরং বলা যায়, মাত্র শুরু হয়েছে।'

পরদিন সকালে কথামতো এসে হাজির হয়েছে মুসা আর রবিন। ট্রেলার হোমের হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

'চোরটাকে ধরেছে পুলিশ?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'না,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে গাড়িটা পেয়েছে। পরিত্যক্ত। শহরের মাঝে একজায়গায় ফেলে গেছে। কয়েক মিনিট আগে চীফের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি জানালেন, ভাড়া করা গাড়ি ছিলো। রেজিস্টারে নাম একটা লিখেছে যে ভাড়া করেছে, তবে সেটা ছদ্মনাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাঁর ধারণা, এই শহরে নেই চোর। আমার তা মনে হয় না। আমি ভাবছি, কাছাকাছিই কোথাও আছে।'

'কি করে বুঝলে?' জানতে চাইলো রবিন।

'লোকটা যা খুঁজছে, এখনও পায়নি। যা যা চুরি করেছিলো, সব পাওয়া গেছে মোটেলের রুমে। তারমানে ওগুলোর মধ্যে তার জিনিসটা পায়নি। তাছাড়া, যদি পেয়েই যেতো, ভয় দেখিয়ে আমাদেকে তাড়ানোর জন্যে এতো চেষ্টা করতো না।'

'এমনও হতে পারে, মোটেল থেকে পালানোর পর জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে,' বললো রবিন।

'তা পারে। তবে মুসাদের ব্লকে নতুন আর কোনো চুরির খবর পাওয়া যায়নি। সহজেই ধরে নিতে পারি, জিনিসটা পায়নি চোর।'

'কোথায় আছে তাহলে জিনিসটা?' আনমনে বললো মুসা।

'সেটাই জানতে হবে আমাদের।'

'কিভাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'বুদ্ধি খরচ করে। এখন বলো, কি কি জানি আমরা?'

'অনেক কিছুই জানি। লিলির পুতুল চুরি…'

'ওসব তো জানিই। মোদ্দা কথাটা কি?'

'কালো কেসে কোনো একটা জিনিস লুকানো আছে, সেটা খুঁজছে চোর।'

'এবং সেই জিনিসটা রয়েছে মুসাদের ব্লকের কোথাও। একথাটা জানা আছে চোরের। আর সেটার মালিকও ওই ব্লকে কেউ নয়।'

গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকিয়ে রইলো দুই সহকারী।

'কালো কেসের মধ্যে আছে, একথাও জানে,' আবার বললো কিশোর। 'তবে জানে না কোন্ বাড়িতে কিসের কেসের মধ্যে আছে।'

'যদি জানেই কি জিনিস, কোথায় আছে কেন জানবে না?' প্রশ্ন তুললো রবিন।

'তা বলতে পারবো না এখন। আরও একটা কথা আন্দাজ করা যায়, জিনিসটা হয়তো ওরই ছিলো। কিংবা একবারের জন্যে হলেও তার হাতে পড়েছিলো।'

মুসা হাঁ করে রইলো।

কিন্তু রবিন বুঝতে পারলো। 'বলতে চাইছো, জিনিসটা হারিয়ে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ। কিংবা তার কাছ থেকে চুরি গেছে।'

'কোথায় পড়েছে, কিংবা কে নিয়েছে, জানে না। শুধু কোনোভাবে জেনেছে, মুসাদের ব্লকে কোথাও আছে।'

'তোমাদের কথাবার্তা বুঝতে পারছি না আমি,' মুসা বললো। 'জানেই যদি, তাহলে কেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করছে না—আমার জিনিসটা পেয়েছেন? কিংবা পুলিশকে কেন জানাচ্ছে না?'

'কারণ, হয় জিনিসটা বেআইনী, নয়তো বেআইনী কিছু করছে সে,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে কারণ যা-ই হোক, জিনিসটা মূল্যবান। চুরি করে এনেছিলো কিনা কে জানে।'

'চোরের ওপর বাটপাড়ি করে থাকতে পারে। কিংবা কারো বাড়িতে ডাকাতি।'

'তা পারে।'

রবিন প্রতিবাদ করলো, 'তাহলে আমরা জানতাম না? খবরের কাগজে কিছু ছাপা হয়নি। আই মীন, রকি বীচে কারো বাড়িতে ডাকাতি...'

'রকি বীচের না-ও হতে পারে,' বাধা দিলো কিশোর। 'কিংবা চুরি যে হয়েছে, সেটাই হয়তো এখনও জানে না মালিক।'

'বেশ, ধরে নিলাম তা-ই হয়েছে! চোর খুঁজছে, এখন থেকে আমরাও খুঁজবো। কিন্তু কিভাবে? চোর জানে জিনিসটা কি, আমরা তো তা-ও জানি না। কোন্ জায়গা থেকে কিভাবে শুরু করবো?'

'আরেকটা কথা,' মুসা বললো। 'জিনিসটা কার কাছে আছে জানে না চোর, তাহলে কি করে বুঝলো আমাদের ব্লকেই কারো কাছে আছে?'

'সেই রহস্যেরই সমাধান করতে হবে আমাদের। তাহলেই চোরকে ধরা সম্ভব।'

পরস্পরের দিকে তাকালো দুই সহকারী। গোয়েন্দাপ্রধানের কথার মানে বুঝতে পারলো না।

ওদের দিকে চেয়ে হাসলো শুধু কিশোর।

'দেখো কিশোর,' রবিন বললো। 'করবো বলাটা খুব সোজা। বেশ, তোমার মতো আমিও নাহয় বলছি, করবো। কিন্তু শুরুটা হবে কোত্থেকে?'

'শুরু তো ইতিমধ্যেই করে দিয়েছি,' সামনে ঝুঁকলো কিশোর। 'পয়লা চুরিটা কোন্ দিন হয়েছে?'

'দু'রাত আগে,' জবাব দিলো মুসা।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ। চোর নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়িই জেনেছে, তার জিনিস হারিয়ে গেছে। ধরা যাক, যেদিন রাতে পয়লা চুরিটা করলো সে, সেদিনই দিনের বেলা কালো কেসটা হারিয়েছে। দিনের বেলা কোন্ সময়? ধরি, বিকেলে।'

'মুসাদের বাড়ির কাছে?' রবিন বললো।

'মনে হয়। আর কিভাবে হারালো? দামী জিনিস। হুঁশিয়ার নিশ্চয় ছিলো?'

'স্বাভাবিক অবস্থায় হারানোর কথা নয়।'

'হ্যাঁ। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিলো। তার নজর সরে গিয়েছিলো অন্য দিকে হয়তো ভয় পেয়েছিলো।'

'আর ওই সময় শত্রু ছিলো ঠিক পেছনেই। ধরা যাক, সেই রোগাটে লোকটা।'

'নাকি পুলিশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো?' মুসা বললো।

'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টও করে থাকতে পারে,' বললো কিশোর। 'তখন কোনোভাবে কেসটা বাইরে পড়ে গিয়েছিলো। তুলে নেয়ার সময় পায়নি, দ্রুত পালিয়েছিলো।'

ভুরু কোঁচকালো রবিন। 'এমনভাবে বলছো, যেন সামনে ছিলে!'

'রবিন, ও আমাদেরকে খেলাচ্ছে,' তিক্তকণ্ঠে বললো মুসা। 'পুলিশকে ফোন করে নিশ্চয় জেনেছে, সেদিন কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো।'

হাসলো কিশোর। 'হ্যাঁ, সেকেণ্ড, ঠিকই বলেছো। দুই দিন আগে, বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। একটা গাড়ি তোমাদের ব্লকে মোড় নেয়ার সময় রাস্তা থেকে পিছলে সরে গিয়েছিলো, ঢুকে পড়েছিলো এক বাড়ির আঙিনায়। তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছিলো ড্রাইভার। নম্বর রাখতে পারেনি, তবে প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছে, গাড়িটা লাল ডাটসান। নিশ্চয় ইঁদুরমুখো চোরটাই তখন গাড়ি চালাচ্ছিলো, কেসটা ফেলে গিয়েছে কোনোভবে। এখন আমরা গিয়ে খোঁজ নেবো...'

হাত তুললো মুসা। কান পাতলো। তার শ্রবণশক্তি অন্য দু'জনের চেয়ে প্রখর।

তিনজনেই শুনলো। বাইরে কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

'দেখো তো,' বললো রবিন।

উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখলো মুসা। 'কিশোর, মেরিচাচী,' চোখ না সরিয়েই বললো সে। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। 'সেই রোগাটে লোকটা...চলে যাচ্ছে!'

'কুইক!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

যতো তাড়াতাড়ি পারলো, দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোলো ওরা। ওয়ার্কশপ থেকে ইয়ার্ডের আঙিনায় বেরিয়ে দেখলো, কালো মার্সিডিজে উঠছে লোকটা। কড়া চোখে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন মেরিচাচী।

স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করলো গাড়ি।

ছুটে গেল ছেলেরা, কিন্তু ধরতে পারলো না। গাড়িটা তার আগেই বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে!

মেরিচাচীর কাছে ফিরে এলো তিনজনে।

'কি হয়েছে, চাচী?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ইয়ার্ডের মধ্যে ঘুরঘুর করছিলো,' রাগতঃ কণ্ঠে বললেন মেরিচাচী। 'জিজ্ঞেস করলাম কি চায়? বললো, তিনটে কিশোর কালো একটা কেস আমার কাছে বিক্রি করেছে কিনা। বেশ মেজাজ দেখালো। ওর মেজাজের নিকুচি করি আমি!' ভুরু কুঁচকে এক এক করে তাকালেন তিন কিশোরের মুখের দিকে। 'কি নিয়ে মেতেছিস এখন?'

'ওই ব্যাটাই মেতেছে, আমরা না,' কিছুটা গরম হয়েই জবাব দিলো মুসা। 'ধরতে পারলে...'

চাচীকে সব খুলে বললো কিশোর। 'এখন আমরা দুর্ঘটনার জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি, চাচী। চোরটাকে ধরবোই।'

'কিন্তু ইয়ার্ডে তো অনেক কাজ জমে আছে...,' কিশোরকে মুখ কালো করে ফেলতে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, যা। পুলিশকে সাহায্য করবি তো, ভালো কথা। দেখি, বোরিস আর রোভারকে দিয়ে করিয়ে নেবো'খন আমি। ব্যাটা যদি চোর হয়, আর ধরতে পারিস, আগে আমার কাছে নিয়ে আসবি। ঝাঁটাপেটা করে ছাড়বো। আমার সঙ্গে মেজাজ দেখায়, হুঁহ!'

ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে হেসে মুসা বললো, 'মেরিচাচীকে রাগিয়ে দিয়ে আমাদের বাঁচালো লম্বু মিয়া।'

সাত

সাদা একটা কটেজ। মুসাদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে। শাদা খুঁটি আর তারের বেড়া। ভেতরে চমৎকার গোলাপ ফুলের বাগান আর পরিচ্ছন্ন লন ছিলো এক সময়। এখন বেড়া ভাঙা, ফুলের চারটে ঝাড় দলে-মুচড়ে শেষ, কিছু কিছু গাছ উপড়ানো।

বেল বাজালো কিশোর।

দরজা খুলে দিলেন এক মহিলা। রাগী চেহারা। মাথার চুল শাদা। 'কি চাই?' ঝাঁঝালো কণ্ঠ। 'এমনিতেই যন্ত্রণার একশেষ...'

'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, ম্যাডাম,' মোলায়েম গলায় বললো কিশোর। 'গাছগুলো দেখে আমাদের খারাপ লাগছে, আপনার তো লাগবেই।'

'কে করেছে, বলতে পারবেন?' এমনভাবে জিজ্ঞেস করলো মুসা, যেন মহিলা

বলতে পারলে এখনই গিয়ে লোকটাকে ধোলাই লাগাবে সে।

কিন্তু নরম হলেন না মহিলা। 'আমার সময় কম। বকবক করে...'

'নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'এমন ফুলের ঝাড় যাঁর বাড়িতে, তিনি যে কাজের লোক হবেন, এতে আর সন্দেহ কি? ফুল যে ভালোবাসে না...'

'তুমি বাগান করো, ইয়াং ম্যান?' অবাক মনে হলো মহিলাকে।

'আপনার মতো কি আর পারবো?' দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। শুরু হয়ে গেছে তার অভিনয়।

রাগ চলে গেল মহিলার চেহারা থেকে। 'ওই ঝাড়গুলোর জন্যে পুরস্কার পেয়েছিলাম আমি, জানো...'

'আর ওই বেকুবটা গাড়ি দিয়ে মাড়িয়ে সব নষ্ট করে দিয়ে গেল! ইস্, কি ক্ষতিই না করেছে!'

'ওই শয়তানটার কথা আর বলো না! ইঁদুরের মতো মুখ...'

'বেঁটে না লোকটা? হাতকাটা কালো কোট পরে।'

'হ্যাঁ। কোট না ছাই। লাগে তো বাদুড়ের ডানার মতো। লাল একটা গাড়ি, বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এমনভাবে লাফিয়ে নামলো, যেন বোমা ছিলো গাড়ির ভেতরে। তারপর আবার উঠে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় লোকেরা ধরার চেষ্টা করেছিলো। পারেনি। পালালো ব্যাটা। নম্বরও রাখা যায়নি।'

'ফেলেটেলে গেছে নাকি কিছু? সনাক্ত করা যেতে পারে এমন কিছু! এই সুটকেস-টুটকেস...'

'দেখলাম তো না। এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা, ভিড় জমে গেল, দেখার সুযোগই ছিলো না।'

'হুঁ। এতো উত্তেজনায় তখন দেখার কথাও নয়। থ্যাংক ইউ, ম্যাডাম।'

দুই সহকারীকে নিয়ে মহিলার সীমানা থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর।

'ইন্দুরমুখোটাই,' বললো রবিন।

'তোমার অনুমানই ঠিক, কিশোর,' মুসা বললো। 'গাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো ব্যাটা।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'দেখি, পড়শীরা কিছু বলতে পারে কিনা।'

মহিলার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ, বাগানে পানি দিচ্ছেন।

তাঁর কাছে এগিয়ে গেল ছেলেরা।

'এক্সকিউজ মী, স্যার,' বললো কিশোর। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সময় হবে? পাশের বাড়ির মহিলার গাছ ভেঙে দিয়েছিলো যে গাড়িটা। আমরা

তদন্ত করছি…'

ফিরে তাকালেন ভদ্রলোক। চোখে সন্দেহ। 'তদন্ত?'

'স্কুলের ম্যাগাজিনে লিখবো,' রবিন বললো। 'আজকাল খুব বেখেয়ালে গাড়ি চালায় লোকে। সে-সম্পর্কে একটা ফিচার…'

'কিশোর ডিটেকটিভ' কথাটা শুনলেই বড়দের অনেকে ভুরু কোঁচকান, কিন্তু স্কুলের কোনো কাজের কথা শুনলে সেই তাঁদেরই হাসি বেরোয়, সন্তুষ্ট হন, ভাবেন কাজের ছেলে। এই বৃদ্ধও তেমনি একজন। রবিনের কথা শুনে তাঁর কোঁচকানো ভুরু সোজা হলো, হাসি ফুটলো মুখে। বললেন, 'তাই বলো। ঠিকই বলেছো, বড় বেখেয়াল এখানকার ড্রাইভাররা, আইন-কানুন মানতে চায় না। অথচ মানা উচিত।…তা, বিশেষ কিছু তো বলতে পারবো না। বেড়া ভেঙে গাড়িটাকে ঢুকতে দেখেছি আমি। এঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। লাফ দিয়ে নামলো লোকটা, যে চালাচ্ছিলো, হয়তো ভেবেছে আগুন ধরে যাচ্ছে। ওর হাতে একটা কালো ব্যাগমতো ছিলো। আসলে ধোঁয়া না। একটা হোস পাইপের ওপর উঠে গিয়েছিলো গাড়িটা, হোসের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোনো পানিই ধোঁয়ার মতো লাগছিলো। দৌড় দিয়ে গেলাম। ধরতে পারলাম না ব্যাটাকে। পালালো।'

'হ্যাণ্ড ব্যাগ?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ঠিক ব্যাগ না। কোনো যন্ত্রের খাপের মতো লাগলো।'

'বেরিয়ে ওটা কি করেছে?'

'তা-ও জানি না। লোক জমে গেছে তখন। বাচ্চারা ঘিরে ধরেছে। বেনটার বোধহয় দেখেছে। ওই যে, পথের ওধারে বাড়ি। ও তখন বারান্দায় ছিলো।'

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

বড় একটা নীল রঙের বাড়ির আঙিনায় ঢুকলো। চওড়া বারান্দায় বসে আছে আরেকজন বৃদ্ধ।

'মিস্টার বেনটারকে চিনি আমি,' নিচু গলায় বললো মুসা। 'পাদ্রী,' এগিয়ে গেল সে। 'স্যার। কথা বলতে এসেছি…'

'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে, না?' মিটিমিটি হাসছেন পাদ্রী সাহেব। 'দুই বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম। তা, তিন গোয়েন্দা এই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে এতো আগ্রহী কেন?'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার,' হেসে বললো মুসা। 'আমরা আগ্রহী। কিছু জানাতে পারবেন?'

'কি জানতে চাও?'

'লোকটার হাতে কালো একটা কেস ছিলো। কি করেছে ওটা? ফেলে গেছে?'

'হ্যাঁ। ডিটেকটিভ লোকটাকে তাই বলেছি···'

'ডিটেকটিভ?' চোখের পাতা সরু হলো কিশোরের।

'গাড়িটা চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই এলো। ছোটখাটো মানুষ। জানতে চাইলো, কালো একটা কেস দেখেছি কিনা। বললাম, দেখেছি। একটা বাচ্চা তুলে নিয়ে সাইকেলে করে চলে গেল। তোমাদের বয়েসী। এদিকে আরও দেখেছি ওকে। দেখলে চিনতে পারবো। নাম জানি না।'

'কেসটা নিয়ে কি করলো?' জানতে চাইলো রবিন।

'চলে গেল। মুসা, তোমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই গেল। ডিটেকটিভকে তাই বললাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে সেদিকে দৌড় দিলো সে।' ভ্রূকুটি করলেন বেনটার। 'অবাক কাণ্ড! একজন ডিটেকটিভ, তার গাড়ি নেই। হেঁটে চলাফেরা করে। আশ্চর্য লেগেছে আমার কছে।'

মিস্টার বেনটারকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

'চোরটাই ডিটেকটিভ, তাই না কিশোর?' রবিন বললো। 'মিস্টার বেনটারকে মিছে কথা বলেছে।'

'কেসটার জন্যে ফিরে এসেছিলো,' বললো মুসা।

'এবং মিস্টার বেনটার বলে দিয়েছেন, একটা ছেলে তুলে নিয়ে গেছে,' কিশোর যোগ করলো। 'নিশ্চয় মুসাদের বাড়ির ওদিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন, ছেলেটা ওদিকে গেছে। এভাবেই জেনেছে চোর, কেসটা কোন্ ব্লকে আছে।'

আচমকা দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কিন্তু এই ব্লকেই, শিওর হলো কি করে? মিস্টার বেনটার তো শুধু বলেছেন, মুসাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে গেছে ছেলেটা, আমাদেরকে যেমন বলেছেন। তার মানে এই নয় যে, মুসাদের ব্লকেই আছে। ছেলেটা এই ব্লকের হতে পারে, পরের ব্লকের হতে পারে, আশপাশের যে কোনো ব্লকেরই হতে পারে।'

'তাই তো!' বলে উঠলো কিশোর।

'সিউয়ার!' চেঁচিয়ে বললো মুসা। পথের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্লকটা ওখানে শেষ। 'ড্রেনের কাজ যে চলছে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

বিশাল এক খাল পথের মাথায়, ব্লকটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে। ওটার জন্যে পথ পেরিয়ে ওপাশে যাওয়ার উপায় নেই।

'ঠিক বলেছো!' একমত হলো রবিন। 'সাইকেল চালিয়ে যেতে পারবে না। ওপাশে যেতে হলে সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে পার করতে হতো। সেটা চোখে পড়তোই মিস্টার বেনটারের। খাল যখন পেরোয়নি, সে তোমাদের ব্লকেরই কোনো বাড়ির ছেলে।'

'মুসা,' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'আমাদের বয়সী ক'টা ছেলে আছে এই ব্লকে?'

'আমি ছাড়া আর একজন। নতুন এসেছে। জারসি হেকটর। আমাদের বাড়ির চার বাড়ি পরেই ওরা থাকে। আরেকটা ছেলে আছে, আমাদের চেয়ে বছর দু'য়েকের বড় হবে। তাকে তুমি চেনো। ওই যে মোট্‌কাটা, রস উড। আমাদের সঙ্গেই পড়ে। আস্ত হারামী।'

'চলো দু'জনকেই জিজ্ঞেস করি।'

প্রথমে হেকটরদের বাড়িতে এলো ওরা।

মুসা বেল বাজালো। হাসিখুশি এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

'জারসি আছে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'তুমি মুসা আমান, না?' হেসে বললেন মিসেস হেকটর। 'না, জারসি তো নেই। ওর দাদীকে দেখতে গেছে, স্যান ফ্রানসিসকোয়।'

'কখন গেছে?'

'তা প্রায় হপ্তাখানেক তো হয়ে গেল। কেন?'

'না, এমনি। এরা আমার বন্ধু, কিশোর পাশা, আর রবিন মিলফোর্ড। নতুন এসেছেন আপনারা। ভাবলাম, জারসির সঙ্গে আলাপ করে যাই। প্রায়ই দেখি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যায়,' মিথ্যে বললো মুসা। 'কথা হয় না। কথা বলতেই এসেছিলাম।'

'ও। জারসি থাকলে খুশি হতো। ঠিক আছে, এলে বলবো। তোমাদের বাড়িতে যাবে একদিন।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

রাস্তা ধরে এগিয়ে আরেকটা বাড়ির সামনে থামলো মুসা। গাছপালায় ঘেরা একটা বাঙলো।

'রস উড এখানেই থাকে,' মুসা জানালো।

ড্রাইভওয়ে ধরে বাড়ির দিকে এগোলো ওরা। পথের দু'ধারে গাছ।

'ছেলেটাকে দেখতে পারি না আমি,' হাঁটতে হাঁটতে বললো মুসা। 'কি করে যে কথা বলি···'

'তোমার বলার দরকার নেই,' বললো কিশোর। 'আমিই বলবো। মনে হচ্ছে, কেসটা সে-ই নিয়ে এসেছে। ওর মনে সন্দেহ জাগানো চলবে না···'

হঠাৎ ঝুরঝুর করে ওদের মাথার ওপর ঝরে পড়লো কতগুলো পাতা। শিস কেটে উড়ে গেল কি যেন।

'কী···!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

আবার শিস! ছোট্ট একটা জিনিস, অনেকটা বুলেটের মতোই শব্দ তুলে পাতা ঝরিয়ে চলে গেল ওর কানের পাশ দিয়ে।

তারপর আরেকটা ছুটে এসে আঘাত হানলো মুসার পায়ে।

'বাপরে!' বলে বসে পড়লো মুসা। আহত জায়গা চেপে ধরলো।

'জলদি শুয়ে পড়ো!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

ড্রাইভওয়েতেই শুয়ে পড়লো তিনজনে।

মাথার ওপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে উড়ে যেতে লাগলো জিনিসগুলো। খটাস খটাস করে আশেপাশেও পড়লো কয়েকটা।

আট

'হাহ্ হাহ্ হা!'

গ্যাবেজের চালের ওপর থেকে শোনা গেল হাসি। ভীষণ মোটা একটা ছেলে, হাতে একটা গুলতি নিয়ে এমন ভাব করে আছে, যেন দুনিয়ার সেরা স্নাইপার সে।

'তারপর, কেমন লাগছে?' হি হি করে হাসলো আবার ছেলেটা। 'চাইলে তিনজনকেই চিত করে দিতে পারতাম। তোমরা কি? কভার নিতে জানো না। কিচ্ছু জানো না।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। রাগে চোখমুখ লাল। 'চিত আর কি করবে? আমার ঠ্যাংই ভেঙে দিয়েছো, গাধা কোথাকার।'

'আরে না, এই গুলিতে কি আর ঠ্যাং ভাঙে?' কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের থলে থেকে একটা কাঠের গুলি বের করে গুলতিতে লাগিয়ে আস্তে করে ছুঁড়লো মুসার পেট সই করে। 'এই দেখো না, হালকা। কপাল ফুলিয়ে দেয়া যাবে বড় জোর। তবে হ্যাঁ, মারবেল কিংবা সাইকেলের বল দিয়ে যদি মারি, বেহুঁশ করে ফেলতে পারবো। এই যে দেখো...'

মুসা সতর্ক হওয়ার আগেই গুলতি চালালো রস। শাঁ করে মুসার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল সাইকেলের বল, পেছনে একটা গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়লো।

যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো মুসা। রসকে চটাতে চায় না। সত্যি সত্যি যদি চোখে বা কপালে মেরে বসে?

রসের ওপর চোখ রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কিশোর।

'বোকামি করছো তুমি, রস,' শান্তকণ্ঠে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'এরকম করতে থাকলে ভীষণ বিপদে পড়বে কোনদিন। লোকের গায়ে গুলতি দিয়ে গুলি ছোঁড়া বেআইনী, জানো তো?'

'কচু হবে,' বুড়ো আঙুল দেখালো রস।

'কচু হবে?' রাগ আর থামাতে পারলো না মুসা। 'আমরা বলে ছেড়ে দিলাম। অন্য কেউ হলে এতোক্ষণে কান ডলে লাল করে ফেলতো।'

'আহ্, তুমি থামতো মুসা,' মৃদু ধমক দিলো কিশোর। 'তো রস, যা বলছিলাম, ধরো, গিয়ে যদি এখন পুলিশে রিপোর্ট করি আমরা? কি হবে আন্দাজ করতে পারো?'

হাসি মুছে গেল রসের মুখ থেকে। 'যাও না, করোগে না। চুরি করে যে অন্যের বাড়িতে ঢুকেছো, পুলিশ জিজ্ঞেস করলে তার কি জবাব দেবে? আমি তো বলবো, তোমরা চুরি করতে ঢুকেছো, সেজন্যেই গুলি করে ঠেকিয়েছি।'

'নামকা ওয়াস্তে ইস্কুলে যাও। লেখাপড়া তো কিছু করো না, জানোও না কিছু,' কড়া গলায় বললো রবিন। 'দু'চারটা প্রাথমিক আইনের বই-টই পড়ে নিও...'

'আচ্ছা, বাদ দাও ওসব কথা,' হাত নেড়ে বললো কিশোর। আবার রসের দিকে তাকালো। 'শোনো, যে কারণে এসেছি। সেই যে কালো কেসটা তুলে এনেছো, ওর মধ্যে কি পেয়েছো?'

'আরে তোমরা জানলে...,' বলতে বলতেই থেমে গেল রস। 'কি বলছো, বুঝতে পারছি না। কিসের কেস? কোনো কেসটেসের কথা জানি না আমি।'

'ওসব বলে পার পাবে না, জলহস্তী,' মুসার রাগ যায়নি। 'তোমাকে চুরি করে আনতে দেখা গেছে।'

'আমি আনিনি।'

'সাক্ষী আছে।'

'তাহলে পুলিশ এসে ধরেনি কেন এখনও আমাকে?'

'কারণ, তারা জানে না,' বললো কিশোর। 'শোনো রস, লাল ডাটসান গাড়ির সেই ড্রাইভারটা একটা চোর। ওই কেসের মধ্যে চোরাই মাল আছে। বিপদে পড়ে যাবে, বলে দিলাম।'

'কি বলছো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'না জানার ভান করো না,' গম্ভীর হলো কিশোর। 'তাহলে পুলিশ তোমাকেও ছাড়বে না। চোরের সহকারী হিসেবে হাজতে ভরবে, কষে দু'চার ঘা যে লাগাবে না, তা-ও নয়। আর চোরটাও ছেড়ে দেবে না তোমাকে। ওই কেসের জন্যে পাগল হয়ে গেছে সে।'

ঠোঁট কামড়ালো রস। দ্বিধা করছে। তারপর বললো, 'চালাকি করে কথা আদায় করতে চাইছো, না? কোনো কালো কেস দেখিনি আমি, যাও। বেরোও আমার বাড়ি থেকে। নইলে ভালো হবে না।'

'তাহলে পুলিশের কাছেই যেতে বলছো?'

'ভয় দেখাচ্ছো, কিশোর পাশা? ওই কথাটা আমিও তো বলতে পারি। বেরোবে,

না পুলিশ ডাকবো?'

'ওখানে দাঁড়িয়ে বলছিস কেন?' আস্তিন গোটাতে শুরু করলো মুসা। 'নেমে আয় না। নেমে এসে বল, সাহস থাকলে।'

'আরে ওটা নামবে কি?' খোঁচা দিয়ে বললো রবিন। 'ভীতুর ডিম। শরীরটা যেমন হাতির মতো, মাথায়ও গোবর ছাড়া কিছু নেই।'

'বেরো! হারামজাদা!' চেঁচিয়ে উঠলো রস। রাগে লাল টকটকে হয়ে গেছে তার গোলআলুর মতো মুখ।

'চলো,' নিচুকণ্ঠে বন্ধুদের বললো কিশোর। 'ও মুখ খুলবে না।'

হতাশ হয়ে গোয়েন্দা প্রধানের পিছে পিছে চললো দুই সহকারী। মুসাদের বাড়ির সামনে যেখানে সাইকেল রেখে গেছে, সেখানে এসে থামলো।

'শিওর, কেসটা এই ব্যাটাই পেয়েছে,' রবিন বললো।

'আমিও শিওর,' বললো মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো কিশোর। 'ব্যাটাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছি আমরা। কেসটা জায়গামতো আছে কিনা দেখতে যাবেই।'

'ওকে পিছু নেবো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। মুখে যতোই বড় বড় কথা বলুক, আসলে ছোকরা ভয় পেয়ে গেছে। কেসটা যেখানে রেখেছে, সেখানে যাবে, সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। সেখানে তখন হাজির থাকবো আমরা।'

দ্রুত আলোচনা করে নিলো তিনজনে। মুসাদের বাড়ির পেছনে চলে এলো। তারপর ছুটলো পেছনের গলি দিয়ে। উডদের বাড়ির পেছনে এসে থামলো। ঘন ঝোপ রয়েছে একধারে, একটানা এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলো তিনজনে। উডদের গ্যারেজটা দেখা যেতেই থামলো। চুপ করে বসে রইলো।

রসকে দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট পর গ্যারেজের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো সে। দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো ড্রাইভওয়ে ধরে, রাস্তার দিকে।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বললো রবিন। 'চলে যাচ্ছে তো।'

'কেসটা নেই হাতে,' বললো মুসা।

'চলো, দেখি কোথায় যায়,' বলে ঝোপের ভেতর দিয়েই এগোতে শুরু করলো কিশোর।

চলতে চলতে ব্লক পেরোলো রস। কোমরে গোঁজা রয়েছে গুলতি। এগিয়ে গেছে পথটা, দু'ধারে আর কোনো বাড়িঘর নেই এখানে। আরও কিছুদূর এগিয়ে মোড় নিলো সে।

দূর থেকে অনুসরণ করে চললো তিন গোয়েন্দা।

থামছে না রস। শহরের বাইরে চলে এলো। সামনে বাদামী পাহাড়ের উপত্যকা।

বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে রস। কিন্তু তিন গোয়েন্দা তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক। এমনভাবে আড়ালে থেকে অনুসরণ করে চলেছে, দেখা তো দূরের কথা, কোনোরকম সন্দেহও জাগলো না রসের মনে।

রেললাইন পেরিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছলো। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো। ছোট পাহাড়টার ওখানে গাছপালা বিশেষ নেই। যা আছে, বেশির ভাগই কাঁটাঝোপ। আর কিছু ওক গাছ আছে। মাটি অনুর্বর। তাই বাড়তে পারেনি গাছগুলো। আকারও বিকৃত। কোনোটা বেঁকে রয়েছে, কোনোটা এমনভাবে মুচড়ে রয়েছে, যেন ঝড়ে মুচড়ে দিয়েছে। ওগুলোর আড়ালে আড়ালে চললো তিন গোয়েন্দা।

ঘন একটা মেসকিট ঝাড়ের কাছে পৌঁছে ফিরে তাকালো রস। কেউ নেই দেখে ঢুকে পড়লো ভেতরে। আর তাকে দেখা গেল না।

'খাইছে! চলে গেল তো!' নিচুকণ্ঠে বললো মুসা।

'চুপ!' সতর্ক করলো কিশোর। 'হয়তো লুকিয়ে বসে চোখ রাখছে। শিওর হতে চাইছে, কেউ পিছু নিলো কিনা।'

গাছপালার আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে চলে মেসকিট ঝাড়টার কাছাকাছি চলে এলো তিন গোয়েন্দা। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে বাড়লো মুসা, ঝাড়ের ভেতরে ঢুকলো। ফিরে এসে জানালো, 'একটা গুহা! ঝোপের ওধারে।'

তিনজনই ঢুকলো ঝাড়ের ভেতরে। ঘন ঝাড়। খোঁচা লেগে কাপড় ছিঁড়লো ওদের, গায়ের চামড়া ছড়লো। বেরিয়ে এলো অন্য পাশে। কালো একটা গুহামুখ দেখতে পেলো। ঢুকে পড়লো তার মধ্যে। ছোট একটা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে হঠাৎ করেই এসে পড়লো বেশ বড়সড় এক গুহার ভেতরে। আবছা আলো। চুপচাপ একভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে চোখে আলো সইয়ে নিলো ওরা।

কিন্তু রস কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা কমলার বাক্স, ওগুলোকে চেয়ার-টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাথুরে মেঝেতে বিছানো রয়েছে পুরনো কার্পেট। কয়েকটা ঘুমানোর ব্যাগ আছে, বৈদ্যুতিক লণ্ঠন আছে। বিস্কুট আর চকোলেটের বাক্স আছে অনেকগুলো। আর আছে বাস-স্টপ সাইন, একটা ভাঙা মটর সাইকেল, দুটো পুরানো গাড়ির ভাঙা দরজা, একটা ইউনিফর্মের খানিকটা, আর আরও কিছু বাতিল জিনিস, জঞ্জাল।

'মনে হচ্ছে...,' শুরু করলো মুসা।

'কোনো ক্লাবহাউস,' শেষ করলো রবিন। 'হাঁদাটার একটা দল আছে না, সব ক'টা বলদ এই ক্লাবের মেম্বার।'

'ঠিক তা-ই,' একমত হলো কিশোর। 'সাবধান। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রয়েছে

ব্যাটা।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে আগে বাড়লো তিনজনে। মাথা নিচু করে রেখেছে। দশ গজ মতো এগিয়ে বাঁয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে গুহাটা। মোড়ের ওধারে চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর ঝুঁকে বসে আছে রস। পাথরটার ওপর রাখা একটা কালো কেস, খোলা।

শব্দ শুনে ঝট্ করে ফিরলো রস।

'তোমার কাছে নাকি নেই?' হেসে বললো কিশোর।

সত্যি সত্যি অবাক মনে হচ্ছে রসকে। বললো, 'ওটা…ওটা…নেই।'

এগিয়ে গেল ছেলেরা।

কেসের ভেতরে নীল মখমলের লাইনিং। শূন্য।

'একটা মূর্তি ছিলো!' বিড়বিড় করলো রস। 'অদ্ভুত একটা পুতুল…'

'দেখতে কেমন, ঠিক করে বলো তো,' কিশোর জানতে চাইলো।

ছেলেদের মাথার ওপর দিয়ে কি যেন দেখতে পেয়ে হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল রসের চোখ। আতঙ্কিত। 'ও–ওরকম!'

পাঁই করে ঘুরলো তিন গোয়েন্দা।

'আল্লাহ্‌রে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

গুহার আবছা আলোয় বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জীবটাকে। সেদিন রাতে সৈকতে দেখা সেই শয়তান!

'পুতুল!' ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চোখ উল্টে পড়ে যাবে রস। 'পুতুলটাই জ্যান্ত হয়ে উঠেছে!'

বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করলো বিকট চেহারার শয়তান। নেচে নেচে এগিয়ে আসছে।

নয়

স্তব্ধ হয়ে গেছে চার কিশোর। পালানোর পথ নেই। এগিয়ে আসছে দানবটা। টকটকে লাল চোখ জ্বলছে।

পেছনে গুহার বদ্ধ দেয়াল, সামনের পথ আগলে রয়েছে শয়তান। কোথায় যাবে ছেলেরা?

'কিশোর, কি করবো?' কাঁপছে রবিন।

'আ–আমি জানি না…'

মাথামোটা রস উডই সবার আগে সামলে নিলো। সে মোটা, বোকাও, কিন্তু সাহস আছে। একটানে কোমর থেকে গুলতি খুলে নিয়ে মারবেল পরিয়ে ছুঁড়লো।

ঘোঁৎ করে উঠে পিছিয়ে গেল শয়তান।

গুলতিতে আবার মারবেল পরালো রস। তিন গোয়েন্দাকে বললো, 'দাঁড়িয়ে আছো কেন? পাথর মারো। মাথা ফাটিয়ে দাও ব্যাটার।'

শুরু হয়ে গেল পাথর-বৃষ্টি। বড় বড় পাথর তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। সেই সাথে চলেছে রসের গুলতি ছোঁড়া।

প্রায় প্রতিটি পাথরই গায়ে লাগছে শয়তানের, কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তার রোমশ চামড়ায় লেগে ফিরে আসছে পাথরগুলো, যেন মোটা রবারের পুরু চামড়ার ঢাল পরে আছে।

শিংওলা মাথাটা নাড়ছে আর ঘররর ঘররর করছে দানবটা। এগিয়ে আসছে।

'কিছুই তো হচ্ছে না!' চেঁচিয়ে বললো রস।

গুহার আবছা আলোয় বিকট দেখাচ্ছে শয়তানের চেহারা। দ্বিগুণ জোরে নাচানাচি জুড়ে দিয়েছে।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। আচমকা ঘুরে গিয়ে বড় একটা পাথর তুলে নিলো। কেসটার ওপর ধরে বললো, 'খবরদার! আর এক পা এগোলেই গুঁড়িয়ে দেবো ভেতরের জিনিস!'

থেমে গেল শয়তান। লাল চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে কিশোরকে। কিন্তু নড়লো না আর। দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

'ইংরেজি তাহলে বোঝো,' শয়তানের দিকে চেয়ে বললো কিশোর।

'মূর্তিটা চাইছে,' রবিন বললো।

'তা-তো চাইবেই,' বলে উঠলো রস। 'ওরই মতো যে।'

বিচিত্র ভঙ্গিতে শরীর দোলালো শয়তান। অদ্ভুত শব্দ তুললো তার গলায় আর কোমরে ঝোলানো ঘন্টা, হাড়ের মালা, ঝুমঝুমি। গমগম করে উঠলো ভারি কণ্ঠ, 'সাবধান, খুদে জীবেরা! শয়তানকে ঘাঁটালে মরবে!'

পাথরটা ধরে রেখেই জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কে তুমি?'

জবাব এলো, 'শ্যামানের প্রেতাত্মা! গোল্ডেন হোর্ডের মহান খানবাতাসের রাজ্যে অপেক্ষা করছেন খেপা শয়তানের জন্যে!'

ঢোক গিললো মুসা। 'খেপা শয়তান! খান! গোল্ডেন···কি?'

তার কথার জবাব না দিয়ে জীবটার দিকে চেয়ে বললো কিশোর, 'মূর্তিটাই তাহলে খেপা শয়তান? নাকি তুমি খেপা শয়তান? ইংরেজিও জানো।'

জবাব, 'মূর্তিটা যা, আমিও তাই। দু'জনেই এক। সব দেখি, সব জানি। আমরা নীল আকাশ, সোনালি সূর্য, অসীম মরুপ্রান্তর, তলোয়ার, এবং শস্য! অগ্নিশিখা দিয়ে ধ্বংস করে দিই আমরা।' বলেই ভারি একটা হাত তুললো সে। চকিতের জন্যে দেখা

গেল আলোর ঝিলিক, উজ্জ্বল একটা শিখা ছুটে গেল চ্যাপ্টা পাথরটার দিকে, পরক্ষণেই একঝলক শাদা ঘন ধোঁয়া দেখা দিলো।

'খবরদার!' চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল রস।

আবার হাত তুললো শয়তান। মুসার পায়ের কাছে দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন, দেখা দিলো শাদা ধোঁয়া।

'নিজের জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছেন মহান খান,' গুরুগম্ভীর কণ্ঠ শয়তানের।

ভয়ে কাঁপছে চার কিশোর। পিছাতে পিছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। ভারি ডান হাতটা তুলে ওদের দিকে নিশানা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শয়তান।

পাথরটা ফেলে দিলো কিশোর।

'এই নাও,' বলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলো কালো কেসটা। 'নিয়ে যাও তোমার জিনিস।'

বিকট চিৎকার করে ঘুরলো শয়তান। ছুটে গেল কেসটার দিকে।

জঞ্জালের মধ্যে পড়েছে ওটা।

'দৌড় দাও!' সঙ্গীদেরকে বললো কিশোর।

তার বলার অপেক্ষায় নেই কেউ। ছুটতে শুরু করেছে গুহামুখের দিকে। ওদেরকে বাধা দিলো না শয়তান, সে তখন জঞ্জাল থেকে কেসটা বের করতে ব্যস্ত।

গুহামুখের বাইরে বেরিয়ে মেসকিট ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটলো ওরা। হাত-পা-মুখের চামড়া ছড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে; কেয়ারই করলো না।

ঝাড় থেকে বেরিয়ে সবার আগে আগে ছুটলো মোটা রস। এতো ভারি শরীর নিয়ে এতো জোরে কিভাবে ছুটছে, সেটাই এক আশ্চর্য। আপাতত সেদিকে কারও খেয়াল নেই। ভয়ংকর ওই জায়গা থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে পারলে বাঁচে।

রসের পিছে পিছে একটা খাঁড়িতে এসে নামলো তিন গোয়েন্দা। মাটিতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়লো চারজনে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে।

কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না। হাঁপাচ্ছে, আর কান পেতে শুনছে শয়তান আসছে কিনা।

শুধুই নীরবতা। কেউ আসছে না।

প্রচণ্ড উত্তেজনা, পরিশ্রম, আর গরম বাতাসে দরদর করে ঘামছে চারজনেই।

'সৈকতেও দেখলাম! এখানেও!' অবশেষে মুসা বললো। 'সবখানেই যেতে পারে!'

কেউ জবাব দিলো না।

আরও কিছুক্ষণ নীরবতা। শয়তান এলো না।

আস্তে করে মাথা তুললো কিশোর। ঢালের ওপর দিকে তাকালো। আগের মতোই কড়া রোদে পুড়ছে কাঁটা ঝাড় আর মোচড়ানো ওক। কেউ নেই। শয়তানের চিহ্নও দেখা

যাচ্ছে না।

অন্য তিনজনও সাবধানে মাথা তুললো।

'গেল কোথায়?' ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে রস।

'হয়তো দোজখে,' মুসা বললো। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

জবাব দিলো না কিশোর। গুহামুখের কাছের মেসকিট ঝাড়ের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

আধ ঘন্টা ওই খাঁড়িতেই বসে রইলো ওরা।

তারপর উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'গিয়ে দেখা দরকার!'

'পাগল হয়েছো!' বললো রস। 'আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'না। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। নইলে পুলিশকে বলে দেবো, তুমি অন্যের জিনিস চুরি করেছিলে।'

চুপসে গেল রস। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে যেতে বাধ্য হলো।

সাবধানে উঠে চললো ওরা। আরও সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে পেরোলো মেসকিটের ঝাড়। গুহায় ঢুকলো।

নীরব গুহা। শূন্য। শয়তান নেই, কালো কেসটাও নেই। খানিক আগে শয়তানটা যেখানে ছিলো, সেখানে পাওয়া গেল শাদা ছাইয়ের দুটো ছোট ছোট স্তূপ।

ছুঁয়ে দেখলো মুসা।

গরম লাগলো না।

'বেরোনোর আর কোনো পথ আছে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না,' জানালো রস। 'তাহলে শয়তানটা বেরোলো কোন্ পথে?'

'ধোঁয়া হয়ে বাতাসে মিশে গেছে,' সহজ ব্যাখ্যা দিলো মুসা।

'কিংবা আমরা যখন দৌড়াচ্ছিলাম,' কিশোর বললো। 'মেসকিটের ভেতর দিয়ে বেরিয়েই গাছপালার আড়ালে লুকিয়েছে। পেছনে ফিরে তাকাইনি আমরা একবারও। তাই দেখিনি।'

'যা-ই হোক,' রবিন বললো। 'শয়তান আর আমাদের পিছু নেবে না। মূর্তিটা চোরে নিয়ে গেছে, কালো কেসটা নিয়ে গেছে শয়তান। এই রহস্যের ইতি এখানেই।'

'আমার তা মনে হয় না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'চোর নেয়নি মূর্তিটা। তার জানার কথা নয়, ওটা কোথায় লুকানো হয়েছিলো।'

'তুমি জানলে কিভাবে?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'ওই খেপা শয়তানের সঙ্গে চোরের যোগসাজশ রয়েছে,' জবাব দিলো কিশোর। 'চোর যদি মূর্তিটা নিয়েই যেতো, শয়তান পিছু লাগতো না আমাদের। এখানে গুহায় আসতো না। তার জানার কথা ছিলো, কেসটা শূন্য, ভেতরে মূর্তিটা নেই। তারমানে মূর্তিটা তৃতীয় কেউ চুরি করেছে,' রসের দিকে ঘুরলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ক্লাবের

মেম্বাররা ছাড়া আর কেউ এই গুহা চেনে, জানো? ঢুকেছিলো?'

দ্বিধা করছে রস।

'ভুলে যেও না রস, কেসটা তুমি চুরি করেছিলে। তোমার কারণে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাদের,' শীতল কণ্ঠে বললো কিশোর। 'হয় মুখ খুলবে, নয়তো হাজতে যাবে। সোজা কথা।'

ভাবসাব দেখে মনে হলো, কিশোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে রস। সামলে নিলো। বললো, 'এক বুড়ো থাকতো এখানে, ভবঘুরে। আমরা ওকে তাড়িয়ে গুহাটা দখল করেছি। গতকাল এখানে ঘুরঘুর করতে দেখেছি তাকে। গুহার ভেতরে একটা খালি বোতলও পেয়েছি।'

'নাম কি ওর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'জানি না। তবে ওকে চেনা সহজ। বয়েস সত্তরের কম না। দাড়িও সব পেকে শাদা। মেলা ওজন, দু'শো পাউণ্ড হবে। পায়ে কাউবয় বুট, গায়ে পুরানো নেভি কোট।'

'দেখো, রস, অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছো,' কঠিন কণ্ঠে বললো কিশোর। 'সত্যি যদি বলে থাকো, ভালো। আর মিথ্যে হলে বুঝতেই পারছো।' সহকারীদের বললো, 'এসো, যাই।'

মুসাদের বাড়িতে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। দুপুরের খাবার সময় হয়েছে। কিন্তু খাবারের কথা ভাবছে না কিশোর। 'ভবঘুরে!' বিড়বিড় করলো সে। ঝট্ করে ফিরলো মুসার দিকে। 'মুসা, একটা লোক প্রায়ই আমাদের ইয়ার্ডে আসে পুরানো জিনিস বেচতে। তুমিও দেখেছো। ওই যে, গিটার বাজায়। নাম হান্ট। চাচা বলে, লোকটা জিনিয়াস। কিন্তু বাউণ্ডুলে বলে, আর খাপছাড়া স্বভাবের জন্য লোকে পছন্দ করে না তাকে। আমার মনে হয়, রকি বীচের সব ভবঘুরেকে চেনে হান্ট। খাওয়ার পর তুমি আর রবিন বেরোও। খুঁজে বের করো ওকে।'

'তা না হয় গেলাম। তুমি কি করবে?'

'আমি? মহান খান, গোল্ডেন হোর্ড আর খেপা শয়তানের খোঁজে যাবো।'

দশ

'এই যে, খেপা শয়তান,' বললো কিশোর।

রস-এর গুহায় শয়তানের তাড়া খেয়ে এসেছে যেদিন, সেদিনই বিকেলে, হেডকোয়ার্টারে মিলিত হয়েছে তিন গোয়েন্দা। মুসা আর রবিন গিয়েছিলো হান্টকে খুঁজতে। রকি বীচের অনেক ছেলেই চেনে ওকে, তাদেরকে বলে এসেছে দু'জনে, হান্টের সঙ্গে দেখা হলেই যেন পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে আসতে বলে। কিশোর পাশা

কথা বলতে চায়।

বিরাট একটা বই নিয়ে এসেছে কিশোর। সেটাই মেলে রেখেছে টেবিলের ওপর। ছবিটা দেখলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'মূর্তির ছবি!' বললো রবিন।

'এটা...এটার বড় ভাইই তাড়া করেছিলো আমাদেরকে!' মুসা বললো।

তার কথায় হাসলো অন্য দু'জন।

নাচের ভঙ্গি করে আছে মূর্তিটা। সৈকতে আর গুহায় যে শয়তানকে দেখেছে, অবিকল তারই খুদে প্রতিমূর্তি। কোনো অমিল নেই।

ছবির তলায় ক্যাপশন। পড়তে শুরু করলো রবিন, 'বাটু খানের খেপা শয়তান। উনিশ দশকের শেষ দিকে পাওয়া গেছে উত্তর চীনে। মূর্তিটার ভঙ্গি আর চেহারা দেখেই বোধহয় ওরকম অদ্ভুত নামকরণ করা হয়েছে। ব্রোঞ্জের তৈরি। বানানো হয়েছিলো সম্ভবতঃ খ্রিস্টের জন্মের বারো–তেরোশো বছর আগে,' মুখ তুললো রবিন। 'একটা সাধারণ মূর্তি।'

'অসাধারণ,' বললো কিশোর।

'ব্রোঞ্জের মূর্তি অসাধারণ হয় কি করে?' প্রশ্ন করলো মুসা। 'সোনা হলেও না হয় এক কথা ছিলো...'

'মূল্যটা ধাতুর নয়। অসাধারণ ওটার অ্যানটিক ভ্যালু,' ছবিটার দিকে তাকালো আরেকবার কিশোর। 'তখন শয়তানের মুখে গোল্ডেন হোর্ড আর শ্যামানের কথা শুনেই ঠিক করলাম, প্রফেসর লিয়াঙের সঙ্গে দেখা করবো। প্রফেসরকে আমি চিনি। ওরিয়েন্টাল আর্টে বিশেষজ্ঞ। শয়তানের চেহারার বর্ণনা দিতেই চিনলেন...'

'গোল্ডেন হোর্ড কি জিনিস?' হাত নাড়লো মুসা। 'কোনো ফুটবল টীমের নাম? আর বাটু খান কে?'

'চেঙ্গিস খানের নাম শুনেছো?'

'শুনেছি। চাইনিজ। সম্রাট–টম্রাট গোছের কিছু ছিলেন।'

'চাইনিজ নন, মঙ্গোলিয়ান। চীনের উত্তর অঞ্চলের এক যাযাবর জাতি। আগে আলাদা ছিলো, এখন অবশ্য রাজ্যটা চীনের অন্তর্গত। বাটু খানও ছিলেন চেঙ্গিস খানের মতোই এক মঙ্গোলিয়ান, দুর্ধর্ষ সেনাপতি। তাঁর সেনাবাহিনীকেই ডাকা হতো গোল্ডেন হোর্ড নামে।''

'তা নাহয় বুঝলাম,' অধৈর্য হয়ে বললো মুসা। 'মঙ্গোলদের ইতিহাস পড়লেই আরও ভালোমতো জানতে পারবো। আমার কথা হলো, ওই গোল্ডেন হোর্ড আর শ্যামানের সঙ্গে আমাদের শয়তানের মূর্তির সম্পর্ক কি?'

'মঙ্গোলরা বিশ্বাস করতো,' বলে চললো কিশোর। 'পাহাড়, বাতাস, আকাশ,

পৃথিবী, গাছপালা, সব কিছুরই প্রেতাত্মা রয়েছে। আর ওসব প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতো একমাত্র শ্যামানরা…'

'শ্যামানরা কি ওঝা?' কথার মাঝে বলে উঠলো রবিন।

'হ্যাঁ, মঙ্গোলদের ওঝা। প্রফেসর লিয়াং তাই বললেন। ভেনট্রিলোকুইজমে ওস্তাদ ছিলো ওরা। মঙ্গোলরা বিশ্বাস করতো, শ্যামানরা প্রেতাত্মা তো ডাকতে পারেই, দরকার হলে খোদ শয়তানকেও ডেকে আনার ক্ষমতা রাখে।'

'এই ছবিটা কি শয়তানের প্রতিমূর্তি, না শ্যামানদের?' জানতে চাইলো মুসা।

'শয়তানের।'

'বুঝলাম। মূর্তিটার মালিক ছিলো বাটু খান। এজন্যেই ওটার নাম হয়েছে বাটু খানের খেপা শয়তান। উপযুক্ত নামই রেখেছে।'

'শ্যামানরাও এই শয়তানের মতোই পোশাক পরতো। মুখোশ পরতো। গায়ে জড়াতো পশুর ছাল। কোমরে বিচিত্র বেল্ট পরতো। তাতে থাকতো ঘন্টা, ঝুমঝুমি, হাড়, গমের শিষ…'

'ওঝাগুলোর কাণ্ডই ওরকম,' নাকমুখ বাঁকিয়ে বললো মুসা। 'ছবিতে দেখো না আফ্রিকানগুলোর চেহারা-সুরত, কেমন শয়তানের মতো করে রাখে…মরুকগে ব্যাটারা। তো বাটুখানের শয়তান রকি বীচে এলো কিভাবে?'

'রবিন,' কিশোর বললো। 'পরের পাতায় লেখা আছে। পড়ো।'

পাতা উল্টে পড়লো রবিন, 'চীনের এক মিউজিয়মে ছিলো মূর্তিটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিখোঁজ হয়ে গেল। উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে লণ্ডনে উদয় হলো আবার। কিনে নিলেন এক ধনী আমেরিকান, কারম্যান রিকটার…'

'কারম্যান রিকটার?' ভুরু কোঁচকালো মুসা। 'ফারনাণ্ড পয়েন্টের সেই কোটিপতি না তো? তেল ব্যবসায়ী? তারমানে রকি বীচে প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে আছে মূর্তিটা! তারপর…'

'চুরি হয়েছে,' কথাটা শেষ করলো কিশোর। 'এখন গিয়ে মিস্টার রিকটারের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাদের।'

খবর পেয়ে দেখা করতে আসতে পারে হান্ট। সেকথা বোরিসকে জানালো কিশোর। এলে তাকে যেন বসিয়ে রাখে, বলে, সাইকেল নিয়ে বেরোলো।

কোস্ট রোড ধরে দক্ষিণে চলেছে তিন গোয়েন্দা।

'কিশোর,' পাশাপাশি চলতে চলতে বললো মুসা, 'মূর্তিটার অ্যানটিক ভ্যালু হলেই বা আর কতো হবে? ওটা নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করছে কেন চোরেরা?'

'আমাদের কাছে ওটার কোনো দাম নেই,' জবাব দিলো কিশোর। 'কিন্তু মঙ্গোলদের কাছে আছে। এখনও কিছু মঙ্গোল আছে, যাদের শ্যামান আছে, ওরা মূর্তিটা

পেলে লুফে নেবে। যতো দামই হোক, কিনবে।'

'কেন, মূর্তিটার বিশেষ ক্ষমতা আছে ভাবে নাকি?'

'হয়তো ভাবে। কে জানে।'

এরপর আর তেমন কোনো কথা হলো না।

ফারনাণ্ড পয়েন্ট দেখা গেল। এক পাশে সাগর, অন্য পাশে পাহাড়ি এলাকা। একখানে প্রায় বিশ একর জায়গা জুড়ে বন, বন ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া, ভেতরে কোনো বাড়ি চোখে পড়লো না।

লোহার গেট খোলা। সাইকেল চালিয়ে ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। আঁকাবাঁকা লম্বা ড্রাইভওয়ে ধরে এগোলো। অবশেষে ছড়ানো লনের ওপাশে দেখা গেল বিশাল এক প্রাসাদ। দোতলা মুরিশ স্টাইলে তৈরি একটা বিল্ডিং, শাদা দেয়াল, বাদামী থাম, লাল টালির ছাত। কারুকাজ করা লোহার গ্রিলের ওধারে ছোট ছোট এক সারি জানালা।

বড় সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজালো কিশোর।

ডোরাকাটা পাজামা পরা বয়স্ক এক লোক দরজা খুলে দিলো, পোশাক-আশাকেই বোঝা গেল সে খানসামা। 'কি চাই?'

'আমি কিশোর পাশা,' ভদ্রভাবে বললো কিশোর, এমন ভাবভঙ্গি করলো যেন সে নিজেও কেউকেটা গোছের একজন। 'মিস্টার রিকটারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ও,' মৃদু হাসলো খানসামা। 'কিন্তু তার সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না। বাড়ি নেই।'

'খুব জরুরী,' কিশোর ভাবলো খানসামা মিছে কথা বলছে। 'তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

লোকটার পেছন থেকে কথা বলে উঠলো কেউ, 'কে, উইলি?'

'কিশোর পাশা,' মুখ ঘুরিয়ে বললো খানসামা। 'মাস্টার ডজম্যান, আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

হাসিমুখে বেরিয়ে এলো লম্বা এক তরুণ, বয়েস বিশের বেশি হবে না। ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলো। 'বাবা শহরে গেছে। তার কাজ কি আমাকে দিয়ে হবে?'

দ্বিধা করলো কিশোর। 'ইয়ে...'

'এসো, ভেতরে এসো,' ডাকলো ডজম্যান। খানসামার দিকে ফিরে বললো, 'যাও, কাজ করোগে। আমি এদের দেখছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল খানসামা।

পথ দেখিয়ে বড় একটা ঘরে ছেলেদের নিয়ে এলো তরুণ। অসংখ্য তাক, আর তাকে বোঝাই বই দেখে ছেলেরা বুঝলো, ঘরটা লাইব্রেরি।

'বসো,' বললো ডজম্যান। 'তা, কি জন্যে এসেছো? কি কথা?'

'একটা খেপা শয়তানের ব্যাপারে এসেছি, মিস্টার রিকটার,' বিনীত কণ্ঠে বললো

কিশোর।

'শুধু ডজ বলে ডাকলেই চলবে,' বললো তরুণ। 'তো, খেপা শয়তানের কথা কি বলবে?'

'চুরি গেছে!' বলে উঠলো মুসা।

'চুরি?'

'হ্যাঁ, আপনাদের মূর্তিটা…'

'কে বললো? তিন–চারদিন আগেও তো দেখলাম…'

'চুরি হয়েছে দু'দিন আগে,' রবিন বললো।

'দু'দিন?' একে একে তিন কিশোরের মুখের দিকেই তাকালো ডজ। 'কই, চলো তো দেখি।'

বড় একটা হলঘর পার করে ছেলেদেরকে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে এলো ডজ। ভারি একটা দরজার তালা খুললো। ছেলেদের নিয়ে ঢুকলো আরেকটা বড় ঘরে। আবছা আলোয় দেখা গেল এলোমেলো হয়ে আছে বিচিত্র সব জিনিসপত্র…আর…একটা মূর্তি। নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যাণ্ডের ওপর। মাথার দু'পাশে দুই শিং। লাল চোখ। গায়ে পশুর ছাল জড়ানো।

এগারো

'আরে, ওই তো।' বলে উঠলো কিশোর।

অবাক হয়ে মূর্তিটার দিকে চেয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।

আলো জ্বেলে দিলো ডজ। অবাক হয়ে তাকালো। 'কী?'

'খেপা শয়তান!' হাত তুলে দেখালো মুসা। 'ওই যে…'

'আরে না, ওটা নয়,' বললো ডজ। 'খেপা শয়তান আরো ছোট, ব্রোঞ্জের তৈরি। এটা একটা সাধারণ পুতুল, মঙ্গোল শ্যামানের পোশাক পরিয়ে রাখা হয়েছে।'

কিশোরও কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পুতুলটার পোশাকে হাত দিতেই ধুলো ঝড়ে পড়লো। মাথা নেড়ে পিছিয়ে এলো সে। 'হ্যাঁ, এটা অন্যরকম। শিংগুলো ছোট। গায়ের ছালটা ভালুকের, নেকড়ের নয়। তাছাড়া ধুলোই বলে দিচ্ছে, অনেকদিন ধরে একভাবে পড়ে রয়েছে, নড়ানো হয়নি।'

'কিসের থেকে অন্যরকম, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো ডজ।

'আসলটা থেকে। জ্যান্ত যেটাকে দেখেছি।'

'জ্যান্ত?' হাসলো কোটিপতির ছেলে। রসিকতা করলো, 'এটাই জ্যান্ত হয়ে

অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো আরকি।...ঠিকই বলেছো, আসল পুতুল এটা নয়, ওই যে...' একটা কাচের বাক্সের দিকে চেয়েই চমকে গেল সে।

শূন্য বাক্স! নেই।

তাড়াতাড়ি ঘরের প্রতিটি কাচের বাক্স খুঁজে দেখলো ডজ। 'আশ্চর্য!' ছেলেদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'চুরি যে হয়েছে, তোমরা কি করে জানলে?'

সব কথা খুলে বললো তিন গোয়েন্দা।

মন দিয়ে শুনলো ডজ। তারপর পায়চারি শুরু করলো। খানিক পরে বললো, 'বাবা সাংঘাতিক রেগে যাবে।...' হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকলো, 'হেনরি! হেনরি?'

ঘরে ঢুকলো একজন লোক।

বড় বড় হয়ে গেল রবিনের চোখ।

কিশোর আর মুসাও অবাক। এই তো সেই লোক! চোখে রিমলেস চশমা। সেদিন রাতে রবিনকে আটকেছিলো, চোরটাকে তাড়া করার সময়।

'ও-ই তো!' বলে উঠলো মুসা।

মুসার দিকে ফিরলো ডজ। 'কী?'

মুসা জবাব দেয়ার আগেই ডজকে প্রশ্ন করলো কিশোর, 'লোকটা কে?'

'বাবার সেক্রেটারি! হেনরি মল। অ্যানটিক জোগাড়েও সাহায্য করে বাবাকে। কেন?'

'এই লোকই সেদিন আটকেছিলো আমাকে,' জানালো রবিন। 'চোরটাকে তাড়া করেছিলাম, আমাকে ধরে রাখলো। মোটেলেও চোরের ঘরে ঢুকেছিলো।'

সেক্রেটারির দিকে ফিরলো ডজ। 'কি বলে ওরা?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছে,' স্বীকার করলো মল। 'ইঁদুরমুখোটা কয়েক দিন ধরে এ-বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছিলো, দেখেছি। সন্দেহ হলো, তাই পিছু নিয়েছিলাম। ছেলেরা যখন বললো, লোকটা চোর, বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক। ওর পিছু আর ছাড়লাম না। তবে মোটেলে গিয়ে হারিয়ে ফেললাম। মেটেলের ঘরে খুঁজে দেখেছি, কিছু পাইনি।'

'তাহলে আপনি জানেন খেপা শয়তান চুরি গেছে?'

'চুরি!' কাচের বাক্সটার দিকে তাকালো মল। চমকে উঠলো। ডজের মুখের দিকে চেয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ, জানি...।' বাঁ চোখটা কাঁপছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে লক্ষ্য করছে কিশোর।

'আমাকে জানালেন না কেন?' অধৈর্য হয়ে বললো ডজ। 'পুলিশে রিপোর্ট করেছেন? বাবাকে বলেছেন?'

'না। অসুবিধে হতে পারে, জানেনই।'

'মঙ্গোলদের ভয়?'

'হ্যাঁ। চুরি গেছে একথা ওরা বিশ্বাস করবে না। ভাববে, না দেয়ার জন্যে বাহানা করে আপনার বাবাই লুকিয়ে ফেলেছেন।'

'কিন্তু কিছু একটা করা দরকার। মূর্তিটা খুঁজে বের করতে হবে। এক কাজ করুন, কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভকে খবর দিন।'

'ওদের কি বিশ্বাস করা যায়? তাছাড়া সাহেব খবরটা কিভাবে নেবেন···'

'ডজ,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'আমরা এমন কিছু গোয়েন্দাকে চিনি, যারা ইতিমধ্যেই খেপা শয়তানের কথা জেনে গেছে।'

'কারা? ওরা কারা, কিশোর?'

'আমরা,' একসঙ্গে বললো মুসা আর রবিন।

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

'চুরি করা একটা পুতুল খোঁজার জন্যে ভাড়া করা হয়েছিলো আমাদের,' বললো কিশোর। 'সেটা খুঁজতে গিয়েই খেপা শয়তানের কথা জেনেছি।'

'বাচ্চা গোয়েন্দা!' বিড়বিড় করলো মল।

রেগে গেল মুসা। 'ওকে চীফের সার্টিফিকেটটা দেখাও, কিশোর।'

ইয়ান ফ্লেচারের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটটা বের করে দেখালো কিশোর।

'হুঁ,' মাথা দোলালো ডজ। 'পুলিশের চীফ যখন সার্টিফাই করেছে, তোমাদের ওপর ভরসা করা যায়। সময় কম। তাড়াতাড়ি···'

'কি করছেন, ডজ!' বাধা দিয়ে বললো মল। 'আপনার বাবা···'

তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে কিশোর বললো, 'কিভাবে খুঁজতে হবে, জানি আমরা, ডজ। কে খোঁজ দেবে, তা-ও জানি,' হান্টের কথা জানালো সে।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো,' বলে মলের দিকে ফিরলো ডজ। 'পুলিশকে জানাতে চান?'

দ্বিধা করলো মল। মাথা নাড়লো, 'না।'

বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি।

'কতোদিন কাজ করছে আপনাদের এখানে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'তা বছর দুই হবে। তুমি কি···'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'চুরিদারিতে অনেক সময় ঘরের লোকেরও হাত থাকে। মূর্তি চুরি হয়েছে শুনে কেমন চমকে উঠলো দেখলেন না?'

'দেখেছি। আরও একটা ব্যাপার অবাক লাগছে আমার কাছে, চোরটা পিছু নিয়েও তাকে ধরার চেষ্টা করলো না কেন?'

'কিংবা পুলিশে খবর দিলেও পারতো।'

পুলিশকে কেন জানায়নি, বুঝতে পারছি।'

'কেন?'

গাল চুলকালো ডজ। 'খুলেই বলি। মূর্তিটা ফেরত চাইছে চীন সরকার। কেন জানি না। হয় মঙ্গোলদের চাপাচাপিতে, নয়তো ভাবছে, নিজেদের অ্যানটিক নিজেদের মিউজিয়মেই রাখবে, অন্য দেশে কেন? হাজার হোক, ঐতিহাসিক মূল্য আছে পুতুলটার। বাটু খানের জিনিস।

'অনেকদিন থেকেই চাইছে চীনারা, কিন্তু গা করেনি আমাদের সরকার। ইদানীং করছে, রাজনৈতিক কারণে। মূর্তিটা ফেরত দেয়ার জন্যে বাবাকে অনুরোধ করলো আমাদের সরকারের বিশেষ মহল। বাবা প্রথমে রাজি হলো না। শেষে প্রেসিডেন্ট নিজে অনুরোধ করলেন তাকে। আর মানা করতে পারলো না বাবা। সে-কারণেই ওয়াশিংটনে গেছে। চীনা দূতাবাসের লোকদের সঙ্গে কথা বলবে। আজকালের মধ্যেই তাদের কাউকে নিয়ে চলে আসবে। এসে যদি দেখে মূর্তি নেই, কি অবস্থা হবে ভেবেছো? কেউ বিশ্বাস করবে না যে চুরি গেছে। ভাববে, বাবাই লুকিয়ে ফেলেছে।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'তারমানে মূর্তিটা খুঁজে বের করতেই হবে। যে করেই হোক।'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ জানালার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে গেল ডজ। 'চোরটার চেহারা কেমন ছিলো?'

'ছোটখাটো মানুষ, মুখটা ইঁদুরের মতো...,' বলতে বলতে কিশোরও ফিরলো জানালার দিকে। 'আরে না না, ও নয়। ওতো আমাদের হান্ট।'

লম্বা, ছিপছিপে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে জানালার বাইরে। সরু মুখ। উজ্জ্বল চোখ। ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে এলোমেলো লাল চুল। দাড়িও লাল, চুলের মতোই অগোছালো।

বারো

গোঁফ-দাড়িতে সামান্য ফাঁক দেখা দিলো। হাসছে।

'ওকে ভেতরে ডেকে আনতে বলুন,' বললো কিশোর।

খানসামাকে ডেকে আদেশ দিলো ডজ।

উইলির সঙ্গে কালেকশন রুমে ঢুকলো হান্ট। কিশোরের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'বোরিস বসতে বলেছিলো। ভাবলাম, কতোক্ষণ আর বসে থাকি? তার চেয়ে চলেই যাই। এখানে আসবে, বোরিসকে বলে ভালোই করেছো। চলে এলাম।'

'ভালো করেছেন,' বললো কিশোর।

ঘরের জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে বলে উঠলো হান্ট, 'বাহ্, দারুণ কালেকশন তো!'

সারা ঘরে ঘুরতে লাগলো সে। 'মঙ্গোল শ্যামান পোশাক, একেবারে আসল! আরে, একটা মিং ফুলদানী! এটাও আসল।··· সুঙের পর্দা···চিঙের সিংহ···ট্যাঙের বুদ্ধ···সবই আসল!'

হান্টের বয়েস পঁচিশ মতো হবে। হ্যাণ্ডসামই বলা চলে। পুরানো, কুঁচকানো একটা ইনডিয়ান শার্ট গায়ে, পরনে প্যান্ট কয়েক জায়গায় ছেঁড়া, পায়ে ইনডিয়ান মোকাসিন জুতো। পিঠে ঝোলানো গিটার। গলায় রুপার একটা বড় মেডেল।

শার্টের ওপরের দিকে বোতাম খোলা। হাঁটার সময় দুলছে মেডেলটা। 'দারুণ! চমৎকার!' বলছে হান্ট।

লোকটার কাপড়-চোপড়ের দিকে চেয়ে অবিশ্বাস ফুটলো ডজের চোখে। 'আপনি এসব ওরিয়েন্টাল আর্ট বোঝেন, মিস্টার···'

'ফাইন আর্টসে মাস্টার ডিগ্রি নিয়েছেন উনি,' হেসে বললো কিশোর।

'স্বাধীন থাকতে ভালো লাগে আমার,' ডজের দিকে চেয়ে হান্টও হাসলো। 'বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, আসবাব নেই, ন'টা-পাঁচটা ডিউটি নেই। যেখানে খুশি যাই, যেখানে খুশি থাকি, যা ইচ্ছে করি।···আপনি কারম্যান রিকটারের ছেলে না? হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে বনবে না। আপনার বাবার সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল ফারাক।'

'আমার বাবা সফল মানুষ,' গম্ভীর হয়ে বললো ডজ।

'সফলতার সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেক রকম। এই যে দেখুন না, কি সুন্দর সব জিনিস। একেকটা মাস্টার পীস। যাঁরা বানিয়েছেন তাঁরা মহৎ লোক, যাঁরা এর কদর বোঝেন, তাঁরাও মহৎ। কিন্তু যারা এগুলোকে জোগাড় করে ঘরে বন্ধ করে রাখছে, লুকিয়ে রাখছে, তারা রীতিমতো অপরাধ করছে।'

'ন্যায্য দাম দিয়ে এগুলো কিনে এনেছে বাবা,' রেগে যাচ্ছে ডজ।

'এনে খুব ভালো করেছেন। যার যার জিনিস, তাদের ফিরিয়ে দিতে পারলে অনেক বড় একটা মহৎ কাজ করবেন।' ডজের থমথমে চেহারার দিকে চেয়ে হাসলো হান্ট। 'লেকচার মারছি, বিরক্ত হচ্ছেন, না?···কিশোর, আমাকে খুঁজছিলে কেন?'

রস-এর গুহার বুড়ো ভবঘুরের কথা জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ, চিনি ওকে,' জবাব দিলো হান্ট। 'চীফ বলে ডাকি। সব সময় নেভির চীফ পেটি অফিসারের জ্যাকেট পরে থাকে।'

'কোথায় আছে এখন ও?' জিজ্ঞেস করলো ডজ। 'জানেন?'

'হয়তো,' কিশোরের দিকে চেয়ে বললো হান্ট। 'ওকে খুঁজছো কেন?'

'আমাদেরকে ভাড়া করা হয়েছে···,' শুরু করে বাধা পেলো রবিন।

হাত তুললো ডজ। 'মিস্টার হান্ট, তিন গোয়েন্দার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই।'

কোটিপতির ছেলের দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকালো হান্ট। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

'খেপা শয়তানের কথা ওকে বলতে চাই না,' নিচু কণ্ঠে বললো ডজ। 'যতো কম লোকে জানে, ততোই ভালো।'

'হান্টকে সব কথা খুলে না বললে সে আমাদেরকে সাহায্য করবে না,' বললো কিশোর।

'কিন্তু ব্যাটা তো আমার বাবাকে দেখতে পারে না, কথা শুনে বুঝলাম। বিশ্বাস করা যায় ওকে?'

'যায়। সব কথা শুনলে খুশি হয়েই সাহায্য করবে ও। কি বললো শুনলেন না, যার যার জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত।'

তিক্ত হাসি হাসলো ডজ। 'ঠিক আছে। বলো তাকে।'

ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর। মূর্তি খোঁজায় সাহায্য করতে রাজি হলো হান্ট, যখন শুনলো ওটা আবার চীনে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

'না জেনে আপনার বাবার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে ফেলেছি,' ডজকে বললো হান্ট। 'কিছু মনে করবেন না। একটা মহৎ কাজ করতে যাচ্ছেন আপনার বাবা। চলুন এখন, চীফকে খুঁজে বের করি।'

'বেশি দূরে?' জানতে চাইলো ডজ।

'কোথায়-কে জানে? দূরেও হতে পারে, কাছেও হতে পারে। এক জায়গায় তো থাকে না।'

'তাহলে গাড়ি নিতে হবে,' বললো ডজ। 'তোমরা কিভাবে এসেছো?'

'সাইকেল।'

'হুঁ। স্টেশন ওয়াগনটা নিতে হবে। সাইকেলগুলো তুলে নেয়া যাবে পেছনে।'

বড় একটা বুইক গাড়ি। চালাচ্ছে ডজ। প্রথমে তাকে রেললাইনের দিকে যেতে বললো হান্ট।

লাইনের ধারে অনেক ভবঘুরেকে দেখা গেল, তবে চীফ নেই। কোথায় আছে, কেউ বলতে পারলো না।

এরপর বার্ড রিফিউজের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলো হান্ট।

কিছুদূর যাওয়ার পর বললো, 'রথটা এখানেই রাখুন। হেঁটে যাবো। এতোবড় গাড়ি দেখলে কেউ কথা বলতে চাইবে না। সন্দেহ করবে।'

বার্ড রিফিউজের কাছেও আস্তানা গেড়েছে অনেক ভবঘুরে। ওরাও চীফের খবর বলতে পারলো না।

ওখান থেকে উপকূলের দিকে চললো ওরা। এক জায়গায় একটা পিকনিক স্পট আছে। তার পরে বুনো এলাকা। ওখানেও থাকে ভবঘুরেরা।

খোলা হাইওয়ে ধরে পাহাড়ের গোড়ায় চলে এলো ওরা। শহরের যতো আবর্জনা ওখানে এনে ফেলা হয়। দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে আসে। বড় বড় বুলডোজার দিয়ে ওই ময়লা আবর্জনা বিশাল খাদে ফেলা হচ্ছে। খাবারের লোভে আবর্জনার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে সীগাল।

আবর্জনার স্তূপ থেকে খানিক দূরেই ভবঘুরেদের আস্তানা, চওড়া উপত্যকা, ঘন ঝোপঝাড় রয়েছে ওখানে।

বড় রাস্তার ধারে গাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে চললো ওরা।

কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললো হান্ট।

হাত তুলে দেখিয়ে দিলো একজন।

চট কিংবা পলিথিন দিয়ে ছোট ছোট ঝুপড়ি বানিয়ে তাতে বাস করে ভবঘুরেরা। শেষ মথায় ওরকম একটা ঝুপড়ির মধ্যে পাওয়া গেল চীফকে।

'চীফ?' বাইরে থেকে ডাকলো হান্ট। 'আরে ভাই কতো ঘুমাও? বেরিয়ে এসো।'

ছেঁড়া একটা মাদুরের ওপর শুয়ে ছিলো চীফ, ডাক শুনে চোখ ডলতে ডলতে বেরোলো। অগোছালো শাদা দাড়ি। গায়ের জ্যাকেটটার বয়েস যে কতো, কে জানে! পায়ে কাউবয় বুট, ওগুলোর অনেক বয়েস।

'কি হলো, আজ বড় খুশি খুশি লাগছে?' বললো হান্ট। 'টাকাপয়সা পেয়েছো নাকি'

'হ্যাঁ,' ঘুমে ঢুলুঢুলু বুড়োর চোখ। মদের নেশায়ও হতে পারে, কিংবা হেরোইন। 'আজ কপালটা ভালোই।'

এগিয়ে এলো ডজ। লাথি মেরে সরালো একটা খালি বোতল। 'গুহার ভেতরে একটা মূর্তি পেয়েছো। কি করেছো ওটা?'

সতর্ক হয়ে গেল চীফ। ভয় দেখা দিলো চোখে।

কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করলো হান্ট। 'ভয়ের কিছু নেই, চীফ। আমরা শুধু জানতে এসেছি। বেচে দিয়েছো, না?'

'সত্যি কথা বলুন,' কিশোর বললো। 'টাকা দেবো।'

পুরোপুরি খুলে গেল চীফের চোখের পাতা। 'টাকা!'

'দশ ডলার,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা নোট বেছে নিলো ডজ। 'পুলিশকেও জানাবো না। কার কাছে বেচেছেন?'

'ড্যামের দোকানে। এইবার আর ঠকাতে পারেনি, নিজেই ঠকেছে,' হাসলো বুড়ো। 'বিশ ডলার দিয়েছে!'

'বিশ?' গুঙিয়ে উঠলো ডজ। 'দোকানটা কোথায়?'

'বন্দরের ধারে। ড্যাম হ্যাগার্ডের কিউরিও শপ বললেই দেখিয়ে দেবে। পুরানো কিছু পেলেই আমরা নিয়ে গিয়ে বেচি তার কাছে,' হাত বাড়ালো চীফ। 'দিন, দশ ডলার।'

নোটটা বুড়োর হাতে দিয়ে হান্টের দিকে ফিরলো ডজ। 'আর কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করুন আপনারা। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। তাড়াতাড়ি যেতে হবে বন্দরে।' দৌড়ে চলে গেল সে।

কড়কড়ে নোটটা হাতে নিয়ে দাঁত বেরিয়ে গেল বুড়োর।

'চীফ, মূর্তিটার কথা আর কেউ এসে জিজ্ঞেস করেছিলো?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

মাথা নাড়লো চীফ। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরলো।

'চীফ,' বললো হান্ট। 'আপনার খোঁজ করেছে আর কেউ?'

আবার মাথা নেড়ে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে গেল বুড়ো। শুয়ে পড়লো ছেঁড়া মাদুরে। মুহূর্ত পরেই নাক ডাকানো শুরু হলো তার।

'দোকানের মালিক মূর্তিটার মূল্য জানে কিনা কে জানে!' গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললো কিশোর।

'মনে হয় না,' হান্ট বললো। 'ওই ব্যাটা বেচে শুধু পুরানো বাতিল জিনিস। এই, লোকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে–টুড়িয়ে যা পায়, নিয়ে গিয়ে দেয় ওকে।'

গাড়িতে উঠলো সবাই।

ফ্রীওয়ে ধরে বন্দরের দিকে ছুটলো গাড়ি। ট্র্যাফিক এখানে খুব বেশি। তাড়াহুড়ো করছে ডজ, লাভ হলো না। গাড়ির ভিড় দেরি করিয়েই দিলো।

পার্কিং লটের কাছ থেকে বেশ দূরে দোকানটা।

'তোমরা জলদি যাও,' বললো ডজ। 'আমি গাড়ি পার্ক করে আসছি। দেখো গিয়ে বেচেটেচে ফেললো কিনা। নাহলে আটকাও।'

একসারি দোকানের মাঝে দোকানটা। বাড়িগুলোর মাঝের ফাঁক দিয়ে পানি চোখে পড়ে। নানারকম বোট আর জাহাজের ভিড়।

কিউরিও শপের খানিক দূরে একটুখানি খোলা জায়গা, চত্বরের মতো। ওখানে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলো মুসা। 'আরি, ইঁদুরমুখো! চোরটা!' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

লোকটার গায়ে এখনও রয়েছে সেই হাতাকাটা কালো কোর্ট। চিৎকার শুনে ফিরে তাকালো।

'ধরো, ধরো ব্যাটাকে!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

দুটো দোকানের মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে দৌড় দিলো লোকটা।

তাড়া করলো তিন গোয়েন্দা আর হান্ট।

ফাঁক থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো হান্ট, 'ওই যে, ওই যে ব্যাটা!'

একটা কাঠের জেটির দিকে ছুটে যাচ্ছে লোকটা। জেটিতে উঠলো। ছুটে গিয়ে উঠে পড়লো জেটিতে ভেড়ানো একটা কেবিন ক্রুজারে। হুইল হাউসের ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোটটার দিকে ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা আর হান্ট।

গলুইয়ের কাছের একটা খোলা হ্যাচ দেখিয়ে মুসা বললো, 'আমি ওটার কাছে যাচ্ছি। তোমরা হুইল হাউস ঘিরে ফেলো।'

লাফিয়ে বোটে উঠলো রবিন, কিশোর আর হান্ট। হুইল হাউসে দেখা গেল না লোকটাকে। ডেকের নিচে নামার জন্যে একটা ফোকড় রয়েছে, সেটার ঢাকনা খোলা।

'আমি আগে নামছি। তোমরা সাবধানে আসবে,' বলেই ফোকড় গলে কাঠের মই বেয়ে বোটের খোলে নামতে শুরু করলো হান্ট।

নিচেও দেখা গেল না চোরটাকে। সামনের হ্যাচের ভেতর দিয়ে নামলো মুসা। মিলিত হলো অন্য তিনজনের সঙ্গে।

'ব্যাটা গেল কোথায়!' বললো গোয়েন্দা-সহকারী।

'ফাঁকিটাতো ভালোই দিলো!' বললো কিশোর। 'ওপরেই কোথাও...'

দড়াম করে হুইল হাউসের দরজা বন্ধ হলো। পরমুহূর্তেই ছিটকিনি লাগানোর শব্দ।

সামনের হ্যাচের দিকে দৌড় দিলো ওরা।

কিন্তু কাছে পৌঁছার আগেই ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল। হুড়কো লাগানো ওটাতেও।

তেরো

ডেকের ওপর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। বোটের কিনার থেকে লাফিয়ে জেটিতে নামলো কেউ, বোটের দুলুনিই সেটা বুঝিয়ে দিলো।

'গাধা বানিয়ে ছাড়লো আমাদের,' নিরস কণ্ঠে বললো হান্ট।

'নিশ্চয়ই হুইল হাউসে লুকিয়েছিলো,' রবিন বললো। 'লকারটকারের মধ্যে।'

'এখন তো আমাদেরকেই আটকে দিয়ে গেল,' তিক্ত শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। 'ইচ্ছে করেই আমাদেরকে এখানে এনেছে। ফাঁদ পেতেছিলো। বোকার মতো তাতে পা দিলাম আমরা।'

'তবে নিয়ে এসেছে বেশ আরামের জায়গায়,' সাজানো সৌখিন কেবিনটার চারদিকে তাকাচ্ছে হান্ট। ঘুমানোর বিছানা আছে। একটা টেবিল ঘিরে রাখা হয়েছে গদিমোড়া কয়েকটা চেয়ার। সেগুন কাঠে তৈরি আসবাবপত্র, চকচকে বার্নিশ। তাক বোঝাই টিনের খাবার।

পিঠ থেকে গিটারটা খুলে নিয়ে ধপ করে বিছানায় বসে পড়লো হান্ট। বাজাতে বাজাতে গলা ছেড়ে গান ধরলোঃ ইয়ো হো হো অ্যাণ্ড আ বটল অভ রাম!

'আপনি গান গাইছেন!' কিছুটা উষ্মার সঙ্গেই বললো মুসা। 'নৌকার খোলে আটকা পড়েছি, বেরোনোর উপায় নেই…'

'তাতে কি?' হেসে বললো হান্ট। 'খাবার আছে, বিছানা আছে, আর কি চাই? এক সময় না এক সময় নৌকার মালিক আসবেই। আরামসে বেরিয়ে যাবো তখন। খামোকা ভেবে মাথা গরম করে লাভ কি? ঠাণ্ডা হয়ে বসো, উপভোগ করো ব্যাপারটা।'

'বসতে পারছি না অন্য কারণে!' বললো কিশোর। 'আমাদের এখানে আটকে রেখেছে মূর্তিটা নিয়ে পালানোর জন্যে। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে এখান থেকে।'

'ও-কে, বস্,' হাসিমুখে বললো হান্ট। 'তা এখন কি করতে হবে?'

'রবিন, তুমি পোর্টহোলে গিয়ে চোখ রাখো,' নির্দেশ দিলো কিশোর। 'কাউকে দেখলেই চেঁচানো শুরু করবে। মুসা, তুমি হ্যাচের ঢাকনা খোলার চেষ্টা করোগে,' হান্টের দিকে ফিরলো। 'আপনি এই কেবিনে খুঁজুন। অনেক কেবিনে সার্ভিস হ্যাচ থাকে। আমি দেখছি হুইল হাউস থেকে বেরোনো যায় কিনা।'

সবার আগে ফিরে এলো মুসা। হতাশ হয়ে জানালো, ঢাকনা খোলা যাচ্ছে না। হান্টও বিফল হলো। কিশোর জানালো, হুইল হাউসের দরজার ছিটকিনি ভেতর থেকে খোলা অসম্ভব।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে ডাকলো রবিন। পোর্টহোলে চোখ। 'রিকটারের সেক্রেটারি, হেনরি মল!'

হুড়োহুড়ি করে এলো সবাই পোর্টহোলের কাছে। সারি সারি নৌকার ওধারের পানির কিনার ঘেঁষে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।

'অনেক দূরে। ভালোমতো দেখা যায় না,' মুসা বললো। 'ও-ই কি?'

'ও-ই,' রবিন জোর দিয়ে বললো। 'চশমাটা দেখছো না? মার্কা মারা জিনিস…'

'হ্যাঁ, মলই,' রবিনের সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'ওই যে মার্সিডিজ গাড়িটাও আছে। কিন্তু এমন করছে কেন ব্যাটা! চুরিদারি করে এসেছে নাকি?'

পার্কিং লট যথেষ্ট দূরে, স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে পুরানো কমদামী গাড়িগুলোর মাঝে মর্সিডিজটা চিনতে অসুবিধে হলো না ওদের। রোদে চকচক করছে, কালো রঙ।

'ওই যে, ডজের ওয়াগনটাও দেখতে পাচ্ছি,' রবিন বললো।

'ডজকে দেখা যায়?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

রবিনের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে কিশোরও তাকিয়ে আছে পোর্টহোল দিয়ে। হঠাৎ বললো, 'চলে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে মল!'

আরেকজনকে দেখা গেল খোলা চত্বরে।

'আরে, ডজ না?' রবিন বললো। 'হ্যাঁ, ডজই তো। ...এই ডজ!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'ডঅজ! আমরা এখানে!'

মুসাও এসে মুখ রাখলো পোর্টহোলে।

একসাথে চেঁচাতে শুরু করলো তিনজনে।

কিন্তু ডজ অনেক দূরে রয়েছে, ওদের চিৎকার ওর কানে যাবে না। এদিক ওদিক চাইছে, বোঝাই যায় তিন গোয়েন্দাকে খুঁজছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করলো, এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকেই। বার বার মুখ খুলছে। নিশ্চয় ওদেরকেই ডাকছে।

আরও কাছে চলে এলো ডজ। ওর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর! মুসা! কোথায় তোমরা? রবিন!'

'এই যে এখানে!' চেঁচিয়ে জবাব দিলো মুসা। 'নৌকার মধ্যে।' পোর্টহোল দিয়ে হাত বের করে নাড়তে লাগলো।

থমকে দাঁড়ালো ডজ। দেখতে পেয়েছে। ছুটতে শুরু করলো বোটের দিকে।

খানিক পরে ডেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুটখাট নানারকম আওয়াজ। খুলে গেল হুইল হাউসের দরজা।

ছেলেরা বেরোলো। সবশেষে হান্ট।

'কি হয়েছিলো?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো ডজ।

জানানো হলো তাকে।

'চোরটা নিশ্চয় মূর্তি নিয়ে পালিয়েছে,' মুসা বললো।

'মনে হয় না,' ডজের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'দোকানের সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাউকে ঢুকতেও দেখলাম না, বেরোতেও না।'

'তাহলে আছে হয়তো এখনও,' বলতে বলতেই বোট থেকে জেটিতে নেমে পড়লো কিশোর। প্রায় ছুটতে লাগলো দোকানের দিকে। তার পিছু নিলো অন্যেরা।

দোকানে একজন খরিদ্দারও নেই। নানারকম ফালতু জিনিস পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে, ভালো জিনিস যে দু'চারটা আছে, ওগুলো যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

বেঁটে, ভীষণ মোটা এক লোক বসে আছে কাউন্টারের ওধারে। গায়ে ময়লা সোয়েটার। দাঁতের ফাঁকে পাইপ, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেই বোধহয় ওটা তার কাছে বিক্রি করেছিলো কেউ। চোখে সার্বক্ষণিক লোভ, মুখে তৈলাক্ত হাসি।

ছেলেদের পেছনে হান্টকে দেখে হাসিটা চলে গেল মুখ থেকে। কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিলো, 'এই ফকিরের বাচ্চা, বেরোও।'

শান্ত কণ্ঠে বললো কিশোর, 'ও আমাদের সঙ্গে এসেছে।'

'তাতে কি?' বিন্দুমাত্র নরম হলো না লোকটা। 'তোমাদেরকেও বেরোতে বলছি। জানি, কিছু কিনতে আসোনি। এটাওটা ঘাঁটবে, দাম জিজ্ঞেস করবে, তারপর চলে যাবে। পয়সা আছে পকেটে?'

'দেখুন,' এগিয়ে এলো ডজ। 'ভদ্রভাবে কথা বলুন। ছোটলোকের মতো ব্যবহার করছেন কেন? কাস্টোমারের সঙ্গে এরকমই করেন নাকি…'

'আপনি আবার কে…'

'থামুন!' ধমক দিলো ডজ। 'রিকটারের নাম শুনেছেন কখনও? কারম্যান রিকটার?'

'রি-রি-রি-রিকটার?' দাঁড়িয়ে গেল হ্যাগার্ড। 'মানে তেল…কোটিপতি?'

'হ্যাঁ, আমি তার ছেলে। ডজম্যান রিকটার। আমাকেও বেরিয়ে যেতে বলবেন?'

নোংরা হাতে কপাল ডললো হ্যাগার্ড, সেই হাতটাই আবার সোয়েটারে মুছলো। নিমেষে বদলে গেছে মুখের ভাব। তৈলাক্ত হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। 'আর লজ্জা দেবেন না, স্যার। বলুন কি করতে পারি?'

'মূর্তিটা কিনতে চাই,' সরাসরি বলে ফেললো মুসা। লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না।

'মূর্তি?' অবাক মনে হলো হ্যাগার্ডকে। তারপর জ্বলজ্বল করে উঠলো চোখ। 'শিংওলা শয়তানের মূর্তিটা তো? দারুণ জিনিস।'

'ন্যায্য দাম পাবেন,' বললো কিশোর।

'কিন্তু,' দ্বিধা করছে হ্যাগার্ড, 'ওটা তো…বিক্রি…'

'জিনিসটা আমার, হ্যাগার্ড,' কঠিন কণ্ঠে বললো ডজ। 'আমি ওটা ফেরত চাই। বুঝেছেন? দাম বলুন।'

কুতকুতে চোখজোড়া বড় হলো লোকটার। 'ফেরত চান?'

'এক কথা ক'বার বলতে হবে, মোটো?' শান্ত হান্টও রেগে গেল। 'চুরি গিয়েছিলো। চীফ চুরি করেনি, অন্য একজন।'

'চুরি?' হান্টের দিকে ফিরেও তাকালো না হ্যাগার্ড, ডজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'নিশ্চয় আপনার বাবার কালেকশন থেকে? তাহলে তো অনেক দামী জিনিস। যাকগে। আমি ওটার জন্যে একশো ডলার দিয়েছি…'

'কেন খামোকা মিছে কথা বলছেন?' মুখের ওপর বলে ফেললো রবিন। 'দিয়েছেন তো মোটে বিশ ডলার।'

নির্লজ্জের মতো হাসলো লোকটা। 'ব্যবসা করি, বাবা, বোঝোই তো। লাভ করতেই হয়…'

'দেবো লাভ,' বললো ডজ। 'আনুন ওটা।'

'আসুন আমার সঙ্গে,' বলে ঘুরলো হ্যাগার্ড। পেছনের একটা ঘরে ঢুকলো। এলোমেলো করে রাখা বাতিল জিনিসের স্তূপ। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। 'আরে, গেল কোথায়!' পেছনের দরজার কাছের একটা টেবিল দেখালো সে। 'ওখানে রেখেছিলাম।'

'চুরি গেছে!' ইঁদুরমুখো লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে কিশোর বললো, 'ওকে দোকানে ঢুকতে দেখেছেন?'

'গায়ে হাতাকাটা কালো কোট তো? দোকানের বাইরে দেখেছিলাম ওরকম একটাকে।'

পেছনের দরজার কাছে চলে গেছে মুসা। বললো, 'কিশোর, তালা ভাঙা!'

তালাটা পরীক্ষা করলো কিশোর। দরজায় ঠেলা দিলো। জোরে ক্যাঁচক্যাঁচ করে খুলে গেল পাল্লা। দরজার বাইরে খানিকটা খোলা জায়গা। দরজার দিকে তাকালো আরেকবার কিশোর, তারপর চত্বরের দিকে।

'এখান দিয়েই ঢুকেছে চোর,' হতাশ হয়ে বললো মুসা। 'আমাদেরকে বোটে আটকে রেখে এসে।'

'দেখে তা-ই মনে হয় বটে,' মাথা দোলালো কিশোর।

'মোটো,' হান্ট জিজ্ঞেস করলো। 'সামনে দিয়ে এঘরে কেউ ঢুকতে পারবে? তোমার ওই শকুনী চোখ এড়িয়ে?'

ভাব দেখে মনে হলো এখুনি হান্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে হ্যাগার্ড। কিন্তু সামলে নিলো নিজেকে। 'না। তোমার কি মনে হয়, কাস্টোমার এলে বসে বসে ঘুমাই আমি? হায় হায়রে! সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে আমার। ডাকাতি করেছে।'

সামনের ঘরে ফিরে এলো ওরা।

কপাল চাপড়ে প্রায় মেয়েমানুষের মতো বিলাপ শুরু করলো হ্যাগার্ড।

এখানে আর কিছু করার নেই। বেরোনোর জন্যে পা বাড়িয়েই থমকে গেল কিশোর। পকেটে হাত দিলো। 'এহ্হে, আমার কলমটা বোধহয় ফেলে এসেছি, ওঘরে। এক মিনিট, আসছি আমি।'

কেউ কিছু বলার আগেই আবার পেছনের ঘরে চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো। তখনও কপাল চাপড়ে হায় হায় করছে হ্যাগার্ড।

বাইরে বিকেলের রোদ। বেরিয়ে এলো ওরা। হান্ট শান্ত, পুরো ব্যাপারটাকেই সহজ ভাবে নিয়েছে সে। কিন্তু ডজ ভীষণ উত্তেজিত। মুষড়ে পড়েছে সে। রবিন আর মুসাও উত্তেজিত। কিশোর চিন্তিত।

'গেছে ওটা!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো ডজ।

'এতোক্ষণে পগার পার হয়ে গেছে চোর,' হাত নাড়লো রবিন। 'হয়তো মেকসিকোর দিকে রওনা হয়ে গেছে।'

'হয়তো,' নিচের ঠোঁটে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিলো কিশোর। 'তবে মূর্তিটা

সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি।'

একই সঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ।

চোদ্দ

'হ্যাগার্ড মিথ্যে কথা বলেছে,' বললো কিশোর। 'আমি শিওর, মূর্তিটা কোথায় সে জানে। চোর ওটা নিতে পারেনি।'

'কি করে বুঝলে?' জানতে চাইলো ডজ।

'পেছনের দরজা। তালাটা ভাঙা বটে, তবে বহুদিন ওই দরজা কেউ খোলেনি। ধাক্কা দিয়ে যখন খুললাম, কি-রকম জোর লেগেছিলো মনে আছে? ক্যাঁচকোঁচ করে উঠলো। কব্জায় মরচে, চৌকাঠে জমাট ময়লা। দরজাটা খোলা হয়ে থাকলে ময়লা আর মরচে ওরকম লেগে থাকতো না, কিছুটা ঝরে যেতোই। আমার মনে হয় ওই তালা বহুদিন ধরেই ভাঙা। মেরামতের চেষ্টা করেনি হ্যাগার্ড। বদলায়ওনি।'

'ঠিক বলেছো,' তুড়ি বাজালো মুসা। 'আমিও দেখেছি। তালায়ও অনেক মরচে।'

'হ্যাগার্ড খুব ভালো করেই জানে মূর্তিটা চুরি হয়নি,' বলে চললো কিশোর। 'শুধু অভিনয় করেছে। চোরের ওপর দোষ চাপিয়েছে। তবে তার বিলাপটা সত্যি।'

'বুঝলাম না,' অবাক হলো ডজ।

লোকটার কথাবার্তা আর ব্যবহারে প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো আমার,' বুঝিয়ে বললো কিশোর। 'কলম ফেলে আসার ছুতো করে আবার গিয়ে ঢুকলাম তার পেছনের ঘরে,' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো সে। 'অ্যাকাউন্ট বুক থেকে ছিঁড়ে এনেছি। তখন ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি বুইটা বন্ধ করতে দেখেছি তাকে। ফিরে গিয়ে ওটারই পাতা ওল্টালাম। এই যে লেখা রয়েছে; শয়তানের মূর্তি—একশো ডলার।'

'বেচে দিয়েছে!' জ্বলে উঠলো রবিনের চোখ। 'মিথ্যুক কোথাকার!'

'কার কাছে বেচলো?' চেঁচিয়ে বললো ডজ। 'ধরে আচ্ছামতো ধোলাই দিলে...'

'বলবে এমনিতেও,' কিশোর শান্ত। 'ও এখন বুঝে গেছে, মূর্তিটার দাম একশো ডলারের অনেক বেশি। কাজেই ওটা আবার ফিরিয়ে আনতে যাবে। আমাদের এখন শুধু চোখ রাখতে হবে ওর ওপর, আর কিছু না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মাথা দোলালো হান্ট।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

দোকান থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগালো হ্যাগার্ড। পুরানো একটা ফোর্ড গাড়িতে চেপে রওনা হলো। ওর পিছু নিলো গোয়েন্দারা।

মাইলখানেক এগিয়ে একটা চীনা ধোপার দোকানের সামনে গাড়ি রাখলো হ্যাগার্ড।

ধীরে ধীরে ওটার পাশ কাটালো ডজের বুইক। বললো, 'জানালা দেখেছো? অনেক মূর্তি সাজানো।'

'সস্তা মাল,' বললো হান্ট। 'নকল। আসল একটাও নেই।'

ব্লকের শেষ মাথায় গাড়ি রাখলো ডজ।

মুসাকে পাঠানো হলো হ্যাগার্ডের ওপর গুপ্তচরগিরি করার জন্যে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিলো হ্যাগার্ড, আরেকটু হলেই তার গায়ে ধাক্কা লাগিয়েছিলো মুসা।

গাড়িতে বসে রয়েছে অন্য চারজন। দেখলো, মোটা দোকানির হাতে একটা প্যাকেট।

ফিরে এলো মুসা। 'শুধু কাপড়! ধোলাই করতে দিয়েছিলো।'

আবার পিছু নেয়া হলো হ্যাগার্ডের।

পাহাড়ের গোড়ায় একটা শপিং সেন্টারে দ্বিতীয়বার থামলো লোকটা। একটা মদের দোকানে ঢুকলো।

'এবার আমি যাই,' প্রস্তাব দিলো হান্ট।

'আপনাকে চিনে ফেলবে,' মুসা বললো।

'দেখলে তবে তো চিনবে। দোকানটায় সব সময়ই ভিড় থাকে। আমার মতো লোকই বেশি। আমাকে বাদ দিলে ডজকে যেতে হয়। সে ওখানে বেমানান। আর তোমরা ছেলেমানুষ, হয়তো ঢুকতেই দেবে না।'

চলে গেল হান্ট। ফিরে এলো পাঁচ মিনিট পরেই। জানালো, 'স্যাণ্ডউইচ আর বিয়ার খাচ্ছে। কথা বলছে বারম্যানের সঙ্গে। কিছুক্ষণ থাকবে মনে হয়।'

আর ধৈর্য রাখতে পারছে না ডজ। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর কিল মারলো। এই কিলটা হ্যাগার্ডের পিঠে মারলে খুশি হতো। 'ইস্, কতোক্ষণ বসে থাকবো।'

হান্ট বললো, 'আমি আর থাকতে পারছি না। এক জায়গায় যেতে হবে। কথা দিয়ে এসেছি।'

শুনে নিরাশ হলো তিন গোয়েন্দা। কিন্তু কি আর করা? এতোক্ষণ ওদের সঙ্গে রয়েছে, সাহায্য করেছে বলে তাকে ধন্যবাদ দিলো ডজ।

হেসে, 'গুড লাক' জানিয়ে পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে শুরু করলো হান্ট।

গাড়িতে বসে রইলো তিন গোয়েন্দা আর ডজ।

বসে থাকার ধৈর্য নেই ডজের। খালি উসখুস করছে, আর বেরোচ্ছে না বলে গালমন্দ করছে হ্যাগার্ডকে।

অবশেষে বেরোলো হ্যাগার্ড।

আবার চললো ফোর্ড। পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে থামলো ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের একটা বাড়ির সামনে। একটা টিলার ওপরে বাড়িটা। টিলার ঢালে ঘন গাছপালা।

গাড়ি থামালো ডজ। গাড়িতে পাহারায় রইলো মুসা। অন্য তিনজন নেমে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোলো বাড়িটার দিকে।

শোবার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, লম্বা এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে হ্যাগার্ড। লোকটার চামড়া কেমন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে, ছুরির মতো নাক, কালো চুল। পরনের পোশাকও সব কালো।

'আরে, এ-তো দেখি আস্ত এক ভ্যাম্পায়ার,' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'একেবারে কাউন্ট ড্রাকুলা।'

ফ্যাকাসে চেহারা লোকটার কোটরে বসা কালো শীতল চোখ। হ্যাগার্ডের কথা শুনলো, তারপর তাকে সঙ্গে যাওয়ার ইশারা করলো। আরেকটা ঘরে ঢুকে গেল ওরা।

ঘুরে সেদিকের ঘরের বাইরে চলে এলো গোয়েন্দারা। কিন্তু জানালার পর্দা নামানো। ভেতরে কিছু দেখা গেল না।

অন্যান্য জানালা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলো ওরা, কিন্তু ওসব ঘরে কেউ নেই। গাড়িতে ফিরে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

কয়েক মিনিট পর বাড়ি থেকে বেরোলো হ্যাগার্ড। হাতে কিছু নেই।

ফোর্ডের পিছু নিলো আবার বুইক।

গোয়েন্দারা নীরব।

একসময় ডজ বললো, 'লোকটাকে কোথাও দেখেছি…ওই ভ্যাম্পায়ারটাকে।'

'হ্যাঁ, ড্রাকুলা ছবিতে,' রসিকতা করলো রবিন।

'না না, সত্যি সত্যি…,' চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগলো ডজ। মনে করার চেষ্টা করছে।

আবার বন্দরে ফিরে গেল হ্যাগার্ড। দোকানে না ঢুকে পাশের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। একটা জানালায় আলো জ্বললো। বোঝা গেল, ওই ঘরেই থাকে সে।

'কিশোর,' লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললো মুসা। 'গেল আমাদের মূর্তি!'

'না,' মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের, 'মনে হয় না গেছে…'

'চিনেছি!' হঠাৎ বলে উঠলো ডজ। 'ভ্যাম্পায়ারটাকে চিনেছি। ওর নাম ক্যাভেলিয়ার ইকন।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।

'লোকটা আর্ট ডিলার। অসৎ। আর্ট ডিলার এসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলো, ওরা বের করে দিয়েছে। জালিয়াতির কারণে দু'বার পুলিশে ধরেছে। ওরিয়েন্টাল আর্টে

যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা করতে চেয়েছিলো। একবার আমাদের বাড়িতেও এসেছিলো, বাবা পাত্তা দেয়নি, বের করে দিয়েছে।'

'হুম্‌ম্‌!' চকচক করছে কিশোরের চোখ। 'খেপা শয়তানকে চেনার উপযুক্ত লোক। ঠিক চিনেছে মূর্তিটা।'

'কিন্তু কিশোর,' মুসা বললো। 'সে-ই যদি কিনে নিয়ে থাকে, হ্যাগার্ড ফেরত আনতে পারলো না কেন?'

'অনেক কারণ আছে। হয়তো ইকনের বেচার ইচ্ছে নেই। কিংবা হয়তো ইতিমধ্যেই কারো কাছে বেচে দিয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে, এমন দাম চেয়ে বসেছে, যা দেয়ার সাধ্য নেই হ্যাগার্ডের।'

'কিংবা হয়তো ইকনের কাছে বেচেইনি ওটা হ্যাগার্ড,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো ডজ।

'খাইছে!' উত্তেজিত হয়ে উঠলো মুসা। 'ঠিকই তো বলেছো। ইকনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি না কেন, সে মূর্তিটা কিনেছে কিনা? এমনও তো হতে পারে, যার কাছে বেচেছে, তার কাছে যায়ইনি এখনও হ্যাগার্ড।'

'তাতে অসুবিধেও আছে,' ডজ বললো। 'ইকন যদি এখনও জেনে না থাকে, গিয়ে জিজ্ঞেস করলে জানিয়ে দেয়া হবে। আরেকটা শয়তান তখন লেগে যাবে মূর্তিটার পেছনে।'

'তার চেয়ে আরেক কাজ করা যাক,' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'ইকন আর হ্যাগার্ড, দু'জনের ওপরই চোখ রাখি আমরা।'

'আমিও তাই ভাবছি,' ডজ বললো। 'তাহলে দু'ভাগ হতে হবে আমাদের। যোগাযোগ রাখবো কি করে?'

'ওয়াকি-টকি,' রবিন বললো। 'অনেকগুলো আছে আমাদের। হেডকোয়ার্টারে। তবে রেঞ্জ কম।'

'তাহলে তো অসুবিধে। ধরো, অনুসরণ করতে করতে রিসিভারের রেঞ্জের বাইরে চলে গেলাম। তখন?'

'তখন চক আছে,' বললো কিশোর। 'একেকজনের জন্যে একেক রঙ। আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকতে আঁকতে যাবো। ওই চিহ্ন দেখেই বোঝা যাবে কে কোন্‌ দিকে গেছি। তবে...'

'তবে কি?'

'গাড়িতে করে গেলে চিহ্ন দিতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে।'

'তবু, কিছু একটা তো করতেই হবে,' কান পেতে কি শুনলো ডজ। 'হ্যাগার্ডের বাচ্চা টিভি দেখছে। এখন বেরোবে বলে মনে হয় না। ডিনারেরও সময় হয়ে এলো। চলো, তোমাদের হেডকোয়ার্টারেই যাই। ওয়াকি-টকি আর চক নেবে। খেয়েও নেবে। একটা ওয়াকি-টকি আর কিছু চক নিয়ে আমি চলে আসবো এখানে। সাইকেলে করে

তোমরা চলে যাবে ইকনের বাড়িতে। জরুরী কিছু জানতে পারলে জানাবে আমাকে। আমি হ্যাগার্ডের দোকানের কাছাকাছিই থাকবো। ও-কে?'

সূর্য অস্ত গেছে।

ইকনের বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়েছে তিন গোয়েন্দা। বাড়ির দুই পাশে রয়েছে কিশোর আর মুসা। রবিন রাস্তার ধারে। কাউকে আসতে দেখলেই সতর্ক করে দেবে অন্য দু'জনকে।

ওয়াকি-টকিতে ডজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে। রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে।

'কিছুই ঘটছে না, ডজ,' কিশোর জানালো। 'গ্যারেজে গাড়ি। ওপরতলায় আলো। কোনো নড়াচড়া দেখছি না, সাড়াশব্দ নেই।'

'এখানেও ঘটছে না,' ডজ জানালো। 'হ্যাগার্ডের বাচ্চা টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছে। রেডিও খুলে শুনেছি। রেডিও আর টিভিতে একই প্রোগ্রাম। দুটো খেলা আজ। একটা শেষ হয়েছে, আরেকটা শুরু।'

'ঠিক আছে। আধঘন্টা পর পর যোগাযোগ করবো।'

চুপচাপ বসে থাকার পালা। আঁধার নামছে ধীরে। একটা দুটো করে তারা ফুটলো আকাশে। দিগন্তে উঁকি দিলো চাঁদ। রাস্তায় স্ট্রীট ল্যাম্প নেই, ফলে আলোও নেই। ইকনের প্রতিবেশী নেই, একটা বাড়িও দেখা যাচ্ছে না ধারেকাছে। ভিক্টোরিয়ান বাড়িটার পরে একটা গিরিখাত, গভীর অন্ধকার। কোনোরকম নড়াচড়া নেই বাড়ির ভেতর।

'গাড়ি আসছে!' ওয়াকি-টকিতে শোনা গেল রবিনের মৃদু কণ্ঠ।

সতর্ক হয়ে গেল অন্য দুই গোয়েন্দা।

নিঃসঙ্গ বাড়িটার পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়িটা। পথের শেষ মাথায় গিয়ে থামলো। এরপরে আর পথ নেই, খাত। কেউ বেরোলো কিনা দেখা গেল না। মোড় নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলো গাড়িটা।

'ভুল করেছে,' রবিন বললো। 'ভুল পথে চলে এসেছিলো বোধহয়। নতুন লোক।'

গাড়িটা চলে গেছে।

আবার বসে থাকার পালা। সময় কাটছে।

ডজ জানালো, খেলা শেষ। হ্যাগার্ড বেরোচ্ছে না।

দু'দিকের পাহারাই বিফল হয় বুঝি।

'খা-খা-খাইছে!' শোনা গেল মুসার কণ্ঠ। 'শ-শয়তান!...মাথা দেখতে পাচ্ছি...'

নীরবতা!

'মুসা!' ওয়াকি-টকিতে ডাকলো কিশোর। 'আমি আসছি।'

ছুটে গেল সে।

'সেকেণ্ড!' শোনা গেল রবিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

'মুসা, তুমি ঠিক আছো?' ডজ জিজ্ঞেস করলো।

'চলে গেছে!' আবার শোনা গেল মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ। 'জানালা দিয়ে উঁকি দিলো, তারপর চলে গেল খাতের দিকে। শয়তানটা কি জানে তার মূর্তি আছে ও-বাড়িতে?'

'যেখানে রয়েছো, থাকো,' নির্দেশ দিলো কিশোর। 'আমি আসছি।'

পনেরো

'চলে গেছে…চলে গেছে…!' মাথা নাড়ছে মুসা, অভিভূত হয়ে পড়েছে যেন।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে তার কাছে চলে এসেছে কিশোর আর রবিন।

'চুপ!' হুঁশিয়ার করলো কিশোর। 'যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে শয়তানটা।'

ঘোলাটে চাঁদের আলোয়, জংলা জায়গায় পুরানো আমলের বাড়িটাকে কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। অস্বস্তি লাগছে তিনজনেরই।

'কোথায় শেষ দেখেছো, সেকেণ্ড?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ওখানে,' বাড়ির একপাশ দেখালো মুসা। 'তারপর চলে গেল খাতের দিকে।'

'কোত্থেকে এসেছিলো?' জানতে চাইলো রবিন।

'জানি না। বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দেখলাম বাড়ির পাশে, জানালার ধারে… যেন…যেন…'

'দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো?' বললো রবিন। 'প্রেতাত্মার মতো!'

'আল্লাহ্‌রে, আমি বলিনি! রবিন বলেছে!' ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালো মুসা, যেন এখুনি তার ঘাড় চেপে ধরতে আসবে প্রেতটা।

নীরব, প্রায়ান্ধকার বাড়িটার দিকে তাকালো আবার রবিন। 'কিশোর, ইকন ব্যাটাই খেপা শয়তান সাজে না তো?'

'কথাটা আমারও মনে হয়েছে, নথি।'

'সে কেন সাজতে যাবে?' মুসার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'একটা কারণ হতে পারে,' জবাব দিলো কিশোর। 'তার কাছেই আছে মূর্তিটা। শয়তানের ভয় দেখিয়ে তাই সবাইকে দূরে রাখতে চায়, যাতে মূর্তি খোঁজার জন্যে তার কাছাকাছি কেউ না আসে।'

অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। কিন্তু শয়তান আর দেখা দিলো না।

শেষে, উঠে বাড়িটার চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এলো ওরা। বাইরে-ভেতরে, কোথাও কিছু নড়তে দেখলো না।

অনেকক্ষণ পর এলো ডজ। দূরে রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে হেঁটে এলো বাড়ির কাছে। নিচু গলায় ডাকলো, 'কিশোর? রবিন? মুসা?'

'এই যে, এখানে,' পথের কিনারে একটা ঝোপ থেকে সাড়া দিলো কিশোর।

ডজও ঢুকলো ঝোপের ভেতর।

ইকনই শয়তানের ছদ্মবেশ ধরে, এই সন্দেহের কথা জানানো হলো তাকে। শুনে ডজ বললো, 'কিশোর, সে-ই যদি শয়তান হয়, তাহলে তো বেরিয়ে গেছে। খাতের ধার দিয়ে নিশ্চয় নেমে চলে গেছে। তারমানে বাড়িটা এখন খালি।'

'ঠিক বলেছেন। বাড়িতে ঢুকে খুঁজে দেখার এই-ই সুযোগ।'

'কিশোর,' রবিন পরামর্শ দিলো। 'আগে মিস্টার ফ্লেচারকে জানালে কেমন হয়?'

'দেরি হয়ে যাবে,' বললো ডজ। 'তাছাড়া আমরা শিওর না, মূর্তিটা এই বাড়িতেই আছে কিনা।'

'মুসা, তুমি এখানেই থাকো,' কিশোর বললো। 'আমরা গিয়ে দেখি।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'একা? আবার যদি আসে শয়তানটা?'

'গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে। আমরা ছুটে আসবো।'

'আমার ভয় লাগে…'

'আরে দূর, ভয়ের কি আছে? মনে করে দেখো, এ-পর্যন্ত কয়েকবার দেখা দিয়েছে শয়তানটা, খালি ভয়ই দেখায়, কোনো ক্ষতি করে না…'

'তা-ও বটে। আচ্ছা, ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো মুসা। 'তবে আবার যদি দেখা দেয়, এমন জোরে চিল্লাবো, নিউ ইয়র্ক থেকে শোনা যাবে বলে দিলাম।'

অন্ধকার বাড়িটার দিকে এগোলো তিনজনে।

একটা খোলা জানালা খুঁজে বের করলো ডজ। চৌকাঠ ডিঙিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে গেল ভেতরে। কিশোর আর রবিনও ঢুকলো। ঘরটায় আলো নেই; তবে অন্য ঘর থেকে আলো এসে পড়ছে খোলা দরজা দিয়ে। আবছা অন্ধকারে ওরা দেখলো, ঘরটা একটা কালেকশন রুম, ডজের বাবার রুমটার মতোই অনেকটা। কাচের বাক্স, আলমারি, তাক, এলোমেলো করে ছড়িয়ে রাখা জিনিসপত্র!

'কিশোর!' হঠাৎ ভীত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো রবিন, 'ওই দেখো!'

কুৎসিত একটা মুখ। সিংহের মুখের মতো, দাঁত বের করে রেখেছে। ধড়টা মানুষের। চেয়ে রয়েছে ওদের দিকেই। পালানোর জন্যে ঘুরতে গেল দুই গোয়েন্দা, থামালো ওদেরকে ডজ। 'আরে ওটা মূর্তি। তিব্বতের মন্দির-প্রহরী। আমার মনে হয় ওটা নকল।'

শান্ত হলো দুই গোয়েন্দা। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করলো।

দ্বিতীয় মূর্তিটার ওপর আলো ফেললো কিশোর। 'ওটা কি?'

'শিব। হিন্দুদের দেবতা।'

'বাহ্, ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্পর্কে আপনিও তো দেখি অনেক জানেন।'

'বাবার জিনিস দেখতে দেখতে শিখে গেছি আরকি। এমন কিছু না।'

'ডজ,' এক কোণ থেকে ডাকলো রবিন। 'দেখে যান। এটাও কি নকল?'

এগিয়ে গেল কিশোর আর ডজ।

সবুজ একটা মূর্তি তুলে নিয়েছে রবিন। দুটো শিং ওটার।

'আরে, এই তো খেপা শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠলো ডজ।

'শ্ শ্ শ্, আস্তে!' হুঁশিয়ার করলো কিশোর।

চুপ হয়ে গেল ডজ। কান পাতলো তিনজনেই। কোনো সাড়াশব্দ নেই, কিছুই নড়ছে না। না, নেই কেউ। ডজের চিৎকারও শোনেনি। সন্তুষ্ট হয়ে আবার মূর্তিটার ওপর আলো ফেললো।

নিচু কণ্ঠে বললো রবিন, 'হুবহু বড় শয়তানটার মতো। যেটাকে নামতে দেখেছি।'

বেশি পুরানো হলে সবুজ হয়ে যায় ব্রোঞ্জ, মূর্তিটার বেলায়ও তাই হয়েছে। দক্ষ শিল্পীর তৈরি। শরীরের প্রতিটি রেখা নিখুঁত। চোখা শিং। বুকে ঝোলানো নেকড়ের খুলি। গোল স্ট্যাণ্ডের ওপর এক পা, আরেক পা তুলে রেখেছে নাচের ভঙ্গিতে। কোমরে বেল্ট, তাতে খুদে খুদে নানারকম টুকিটাকি জিনিস, ঘন্টা, ঝুমঝুমি, ভুট্টার শিষ, মানুষের হাড়ের কল। শুধু হাড়ই নয়, মূর্তিটার শরীরের সমস্ত জিনিসই ব্রোঞ্জে তৈরি, শুধু গায়ে জড়ানো ছালটা ছাড়া, ওটা নেকড়ের।

'যাক, পেলাম শেষ পর্যন্ত,' খুশি খুশি গলায় বললো ডজ।

'এটা আসলটা, আপনি শিওর?' কিশোর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। 'এতো পুরানো জিনিস, কিন্তু খুব পরিষ্কার। ধুলোময়লা নেই!' কি যেন একটা জরুরী ব্যাপার মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না।

'শিওর মানে? একবার দেখেছি নাকি? দুনিয়ায় এরকম মূর্তি একটাই আছে, এবং এটাই সেটা। চলো। আর এখানে থাকার দরকার নেই।'

যেটার জন্যে এতো খোঁজাখুঁজি···যাক, পাওয়া গেল অবশেষে। যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে ঘুরলো কিশোর আর রবিন।

ডজ স্থির। কে যেন আসছে!

'মুসা! চলে এসেছো,' বলে উঠলো রবিন।

ভেতরে ঢুকলো সহকারী গোয়েন্দা, কোনো কথা বললো না।

'মূর্তিটা পাওয়া গেছে,' হেসে বললো রবিন।

মুসার পেছন থেকে বলে উঠলো কেউ, 'তাই?'

'সরি,' সহকর্মীদের দিকে চেয়ে বললো মুসা। 'টেরই পাইনি। পেছন থেকে এলো। কোনো শব্দ করেনি।'

খুট্ করে সুইচ টেপার শব্দ হলো। আলো জ্বলে উঠলো ঘরে। সুইচবোর্ডটা দরজার কাছে। মুসার পেছনে ইকনকে দেখা গেল। হাতে পিস্তল। 'দাও, মূর্তিটা দাও আমার হাতে!' বরফ-শীতল কণ্ঠ।

কিছু করার নেই। দিয়ে দিলো রবিন। হাতে নিয়ে একটা বাক্সের ওপর ওটা নামিয়ে রাখলো ইকন। পকেট থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করে দেখালো, মুসারটা। বললো, 'এটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম। তোমাদের কাছে আরও আছে। বের করো।'

যন্ত্রগুলো বের করে মেঝেতে ফেলে দিলো তিনজনে। হাতের টর্চ পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো কিশোর আর রবিন। দেখলো না ইকন, কিংবা দেখলেও গুরুত্ব দিলো না।

'আগে বাড়ো,' আদেশ দিলো সে।

ওদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে এলো ইকন। সামনে একটা ভারি দরজা। 'খোলো ওটা।'

মুসা খুললো। একটা কাঠের সিঁড়ি দেখা গেল। নিচে ঘন অন্ধকার।

'মাস্টার রিকটার,' ইকন বললো। 'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। ইনশিওরেন্স। তোমার কোটিপতি বাবা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তখন তো বাঁচতে হবে আমাকে,' হাসলো সে। 'এই, তোমরা নামো।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা। অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো ডজ।

সিঁড়ির মাঝামাঝি এসেছে তিন কিশোর, এই সময় দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওপরের ভারী দরজা।

ষোল

'মূর্তিও গেল!' অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললো রবিন। 'ডজও আটকা পড়লো।'

'দোষটা আমার,' বিড়বিড় করলো মুসা। 'টের পাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এতো চুপে চুপে পেছন থেকে এলো, শুনলামই না কিছু। নিশ্চয় আমাদের ওপর চোখ রেখেছিলো। সব দেখেছিলো।'

'আর ওকে ঠেকানো গেল না,' আক্ষেপ করলো রবিন।

'এতো সহজে হাল ছাড়ছি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। 'এখন পয়লা কাজ,

এখান থেকে বেরোনো। রবিন, তোমার টর্চটা জ্বালোতো। দেখি, লাইটের সুইচ আছে কিনা।'

ওপরে, সরু সিঁড়ির পাশে আলো ফেলে দেখলো রবিন। সুইচ নেই।

'নিচে থাকতে পারে,' মুসা বললো।

মেঝেতে নেমে এলো ওরা। কাঁচা মেঝে। সিমেন্টে বাঁধানো নয়।

'একেবারে প্রাগৈতিহাসিক,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'খোঁজো, সুইচ খোঁজো,' সে নিজেও খুঁজতে শুরু করলো।

সুইচ পাওয়া গেল না। সিলিং কিংবা দেয়ালের কোথাও কোনো বাল্বও দেখা গেল না। সমস্ত কিছুতেই ধুলোর পুরু আস্তরণ।

ধপ করে ধুলোয় ঢাকা একটা বাক্সের ওপর বসে পড়লো মুসা। 'গেছি আমরা। আটকেছি ভালো মতোই।'

'আমরা যে এখানে আছি,' রবিন বললো। 'একথা জানে না কেউ।'

'আমাদেরকে ছেড়ে দেবে ইকন,' দুই সহকারীর মতো এতোটা নিরাশ হতে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। 'তবে আগে মূর্তির একটা ব্যবস্থা করবে। তারপর। কখন ছাড়বে কে জানে! তার জন্যে বসে থাকলে চলবে না আমাদের। এখুনি বেরোতে হবে, ব্যাটাকে জিততে দেবো না।'

টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখলো মুসা। 'কি করে বেরোবো? কোন্ দিক দিয়ে?'

নোংরা মাটির মেঝে। সিলিঙে ভারি বীম। পাথরের দেয়াল। কোনো আসবাব নেই। কোনো যন্ত্রপাতি নেই। সিঁড়ির ওপরের দরজাটা ছাড়া একপাশের দেয়ালে ছোট আরেকটা দরজা আছে। আর আছে সিলিঙের প্রায় কাছাকাছি ছোট ছোট দুটো জানালা। কাপড় ভেজানোর ড্রাম আছে একটা, ডাস্টবিন আছে কয়েকটা, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে ছোট একটা পুরানো আমলের চুলা, মরচে পড়া।

'উপায় একটা নিশ্চয় আছে, সেকেণ্ড,' বললো কিশোর। 'আগেও এরকম বহুবার আটকা পড়েছি আমরা। বেরিয়েও এসেছি। ওই যে ছোট দরজাটা, ওটা হয়তো বাইরে বেরোনোর জন্যেই।'

দরজার ওপর আলো ধরে রাখলো মুসা আর রবিন। কিশোর পরীক্ষা করে দেখলো। শক্ত তক্তা আড়াআড়ি লাগিয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দরজার পাল্লা।

মাথা নাড়লো মুসা। 'হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে খুলতেও কষ্ট হবে। খালি হাতে তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'ঠিক,' একমত হলো রবিন।

'তাহলে জানালা দিয়ে চেষ্টা করা যাক,' বললো কিশোর।

জানালায় আলো ফেলা হলো। পাল্লা লাগানো, তবে সাধারণ হুড়কো দিয়ে।

কয়েকটা বাক্স টেনে এনে একটার ওপর আরেকটা বসিয়ে জানালার নাগাল পাওয়া গেল। তিনজনের মাঝে রোগা শরীর রবিনের, জানালা গলে বেরোনো তার জন্যেই সহজ। বাক্সের ওপরে উঠতে সাহায্য করা হলো তাকে।

হুড়কো খুললো রবিন। পাল্লা খুলেই স্থির হয়ে গেল। নিরাশ কণ্ঠে জানালো, মোটা লোহার শিক লাগানো। নেমে এলো বাক্সের ওপর থেকে।

ভারি নীরবতা যেন ঝুলে রইলো অন্ধকার ভাঁড়ারে। কারো মুখে কথা নেই। ভাবছে।

'কোনো ভাবে দরজার তক্তা খুলতে পারলে হতো,' একসময় বললো কিশোর।

বাক্সের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে আছে মুসা, বললো, 'তুমি চেষ্টা করো। খামোকা কষ্ট করতে রাজি না আমি।'

'আমিও তাই বলি, কিশোর,' রবিন বললো। 'অযথাই কষ্ট করবে।'

'কিন্তু এভাবে চুপচাপ বসে থাকবো?' এই অবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কিশোর।

'কি করবো তাহলে?'

'জানালা খোলা। চেঁচালে হয়তো শব্দ বাইরে যাবে। প্রতি পনেরো মিনিট পর পর একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবো। কারো কানে যেতেও পারে।'

'হুঁ, খামোকা এনার্জি নষ্ট করি,' মুসা রাজি হলো না। 'এমনিতেই ক'দিন খেতে পাবো না, কে জানে। চেঁচালে এই জঙ্গলে কে শুনবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিঁড়ির নিচের ধাপে বসে পড়লো কিশোর। গালে হাত রেখে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করলো। মেঝের দিকে চোখ পড়তে বললো, 'নরম মাটি। খুঁড়ে বেরোতে পারি।'

'তোমার হলো কি, কিশোর?' মুসা বললো। 'বোকার মতো যা খুশি তাই বলছো। কি দিয়ে খুঁড়বো? খালি হাতে?'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর।

চুলাটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে রবিন। টর্চের আলো ফেলে দেখছে। চুলার ওপরে মোটা একটা পাইপ। মুখটা ছড়ানো, চোঙার মতো। পাইপটা সাধারণ চিমনির মতো খাড়া না উঠে বাঁকা হয়ে গিয়ে ঢুকেছে দেয়ালে। কোনো বিশেষ কারণে তৈরি করা হয়েছে ওরকম করে। 'কি করতো এটা দিয়ে?' নিজেকেই যেন করলো প্রশ্নটা।

'বোধহয় কাপড় সেদ্ধ করতো,' জবাব দিলো কিশোর। 'বাষ্প আর ধোঁয়া বের করে দেয়ার জন্যেই ওই পাইপের ব্যবস্থা,' তুড়ি বাজিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। 'পেয়েছি!'

'কী!'

'ওই পাইপ। টানলেই খুলে চলে আসবে। ফোকর গলে বেরিয়ে যেতে পারবো আমরা।'

'যদি ফোকরের ওধারে বন্ধ থাকে?' প্রশ্ন তুললো মুসা। 'দেয়াল-টেয়াল?'

'থাকবে না। তাহলে ধোঁয়া বেরোতে পারতো না। বড়জোর ড্রেন থাকতে পারে। মোট কথা, ফাঁক থাকবেই। আন্দাজে কথা না বলে দেখাই যাক না কি আছে।'

পাইপটা ধরে টানতে শুরু করলো ওরা। অনেক আগে লাগানো হয়েছিলো। পাথরের দেয়ালে শক্ত হয়ে আটকে গেছে ময়লা আর মরচের জন্যে।

পাইপ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে 'হেঁইও হেঁইও' করে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগলো ওরা।

বেশিক্ষণ আর আটকে থাকতে পারলো না, খুলে চলে এলো পাইপ। একটা ফোকর বেরিয়ে পড়লো। রবিন সহজেই ঢুকে যেতে পারবে। মোড়ামুড়ি করে কিশোরও ঢুকতে পারবে। সমস্যা হলো মুসাকে নিয়ে। তার ব্যায়াম করা চওড়া কাঁধ ঢুকবে না।

'না ঢুকুক, দু'জন তো বেরোতে পারবে। ওরা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে মুসারও মুক্তির ব্যবস্থা হবে।'

ফোকরের ওপাশে ড্রেন।

গা শিরশির করে উঠলো রবিনের। ঘিনঘিন করতে লাগলো। তবে ড্রেনটা শুকনো। এগিয়ে চললো হামাগুড়ি দিয়ে।

তার পেছনে কিশোর।

এগিয়েই চলেছে ওরা। পথ আর শেষ হয় না। ভয় লাগছে এখন ওদের, দুরুদুরু করছে বুক। ড্রেনটা যেরকম, এর মধ্যে শরীর ঘোরাতে পারবে না। বেরোনোর মুখটা যদি শিক দিয়ে আটকানো থাকে—থাকে তো অনেক ড্রেনের—ফিরবে কি করে?

মনে হলো, প্রায় এক যুগ পরে মুখে লাগলো তাজা বাতাস।

আর সামান্য এগোতেই আবছা আলো দেখা গেল সামনে।

'নাহ্, বাঁচা গেল, ড্রেনের মুখে শিক নেই। তবে ঘাস আর ঝোপ জন্মে মুখ প্রায় বুজিয়ে দিয়েছে। হাত দিয়ে ঠেলতেই সরে গেল।

মাথা বের করলো রবিন।

ঠিক তার চোখের সামনেই এক জোড়া পা! ধপাস করে উঠলো বুক। আস্তে করে চোখ তুলে তাকালো। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে লোকটা।

সতেরো

বেঁটে, গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ। গায়ে উঁচু কলারওয়ালা জ্যাকেট। শার্ট-টাই নেই,

থাকলেও জ্যাকেটের নিচে ঢাকা পড়েছে, দেখা যায় না। পেছনে আরও দু'জন লোক।

চাঁদের আলোয় একজনকে চিনতে পারলো রবিন। হেনরি মল।

'তো?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বেঁটে লোকটা, 'খেপা শয়তান কোথায়?'

বেরিয়ে এলো রবিন। কিশোরও বেরোলো। দু'জনেই ধুলো ঝাড়ছে কাপড় থেকে।

'জানি না,' জবাব দিলো রবিন। 'ইকন নিয়ে গেছে...'

এগিয়ে এলো তৃতীয় লোকটা। বেঁটে লোকটাকে সরিয়ে ছেলেদের মুখোমুখি হলো। 'ইকন? ক্যাভেলিয়ার ইকনের কথা বলছো?' ভারী কণ্ঠস্বর। বিশালদেহী লোক, চওড়া কাঁধ, চাঁদের আলোয় চুলের রঙ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে ধূসরই হবে।

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর। 'মূর্তিটা কিনেছে ড্যাম হ্যাগার্ডের কাছ থেকে। হ্যাগার্ড কিনেছে চীফের...'

'কি বকবক করছো? জানো আমি কে?'

'আন্দাজ করতে পারছি,' রবিন বললো। 'মিস্টার কারম্যান রিকটার, কোটিপতি।'

হাসলেন রিকটার। 'ঠিকই অনুমান করেছো।' বেঁটে লোকটাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি চিং ব্যাং। চীন সরকারের প্রতিনিধি। মূর্তিটা নিতে এসেছেন। আর হেনরিকে তো চেনোই।'

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো। 'আমি কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড। আমাদের আরেক বন্ধু মুসা আমান, সেলারে আটকে রয়েছে...'

'আটকে রয়েছে? চলো, তাকে বের করি।'

পুরনো বাড়িটায় দল বেঁধে ঢুকলো সবাই।

রান্নাঘরে এসে ভাঁড়ারের দরজা খুলে দিয়ে ডাকতেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো মুসা। নবাগতদের দিকে চোখ মিটমিট করে তাকালো।

'তুমিই তাহলে মুসা আমান,' গমগম করে উঠলো কোটিপতির কণ্ঠ। কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'এবার সব খুলে বলো তো আমাকে।'

সংক্ষেপে সব জানালো কিশোর। ডজের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরের ঘটনা।

গম্ভীর হলেন রিকটার। 'ডজকে তাহলে নিয়ে গেছে। কোথায়, আন্দাজ করতে পারো?'

মাথা নাড়লো তিন গোয়েন্দা।

মলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি না বললে, ডজ এ-বাড়িতে এই ছেলেগুলোর সঙ্গেই রয়েছে? তোমাকে জানিয়েছে?'

'ফোন করেছিলো?' কিশোরও জিজ্ঞেস করলো মলকে। 'ও, এজন্যেই জেনেছেন,

আমরা এখানে আছি।'

'এক ঘন্টা আগে জানিয়েছিলো,' বললো মল। 'তখন মিস্টার রিকটার আর ব্যাঙেরও আসার সময় হয়েছে। ভাবলাম, আগে এয়ারপোর্টে যাই। দু'জনকে নিয়ে সোজা চলে আসবো এখানে। তাই করেছি।'

'ড্রেনের মুখে দাঁড়ালেন কেন?'

'বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। ওখানে ড্রেনের মুখ, জানতাম না। খসখস শব্দ শুনে দাঁড়ালাম। দেখি তোমরা বেরোচ্ছো।'

'ওসব কথা থাক, কাজের কথা বলো,' হাত নেড়ে বাধা দিলেন রিকটার। 'ডজ তোমাকে ঠিক কি কি বলেছে?'

'এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। উইলি ডেকে বললো, মাস্টার ডজম্যানের ফোন। গিয়ে ধরলাম। খুব উত্তেজিত মনে হলে তাকে। বললো, একটা বাড়িতে আটকে আছে সে, আর তিনজন কিশোর। বাড়ির ঠিকানা দিলো। আরও বললো, খেপা শয়তানকে পেয়েও আবার হারিয়েছে। কে ওদেরকে আটকেছে বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ডেড হয়ে গেল টেলিফোন।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'নিশ্চয় কোনোভাবে কয়েক মিনিটের জন্যে ছাড়া পেয়েছিলো ইকনের হাত থেকে, তখনই ফোন করেছে।'

'কিংবা এমনও হতে পারে,' রবিন বললো। 'এই বাড়িরই কোনো ঘরে আটকে রেখেছে, যেখানে ফোন আছে।'

'হুঁ,' অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করলেন রিকটার।

পরিষ্কার ইংরেজিতে বললো চীনা লোকটা, 'কি করা যায় এখন?'

'সেটাই ভাবছি,' পায়চারি থামালেন না রিকটার। 'ডজের ক্ষতি করবে না, আটকে রেখেছে শুধু। মূর্তিটার জন্যে মোটা টাকা চাইবে এখন। ডজকে জিম্মি করতে পেরে সুবিধে হয়েছে ইকনের।'

'স্যার,' কিশোর বললো। 'আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। নিশ্চয় ওই মূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে,' জীবন্ত খেপা শয়তানের কথা খুলে বললো সে।

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন রিকটার।

ভুরুর ওপরের ঘাম মুছলো চীনা প্রতিনিধি। 'মঙ্গোল কুসংস্কার। ভূত-টুত সব বাজে কথা।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বললো কিশোর। 'কেউ ভূত সেজে আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছে।'

'ওসব আলোচনা পরেও করা যাবে,' বললেন রিকটার। 'আগে ডজকে খুঁজে বের করা দরকার। তারপর মূর্তিটা। আমি বাড়ির ভেতরে খুঁজবো। তুমি···আর তুমি থাকো আমার সাথে,' রবিন আর মুসাকে বললেন। 'মিস্টার ব্যাং, আপনি হেনরির সাথে যান।

কিশোর, তুমিও যাও। তোমরা বাইরে খোঁজো।'

মাঝরাতের দিকে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন রিকটার। মুসা আর রবিনকে নিয়ে বাইরে বেরোলেন। বাইরে যে তিনজন খুঁজছিলো, তারাও সফল হয়নি।

'খুঁজে লাভ হবে না,' বললেন রিকটার। 'বাড়ি চলে যাই। সময় হলে ইকনই যোগাযোগ করবে।'

'স্যার,' গাল চুলকালো কিশোর। 'ইকনের গাড়িটা গ্যারেজেই রয়েছে। ডজের স্টেশন ওয়াগনটাও রাস্তার ধারে। তারমানে, হেঁটে গেছে ওরা। বেশি দূরে যেতে পারবে না। কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে। আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজলে কেমন হয়?'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন রিকটার।

রাস্তার দুই মাথা আর কিনারের ঝোপঝাড়ে খুঁজতে গেল রবিন আর মল। বাড়ির পেছনের জংলা জায়গায় গেল ব্যাং আর কিশোর। মুসা আর রিকটার গেলেন অন্ধকার গিরিখাতের দিকে।

'কিশোর!' হঠাৎ শোনা গেল মুসার চিৎকার। 'রবিন!'

দুড়দাড় করে তার কাছে ছুটে গেল সরাই। বাড়ি থেকে শ'খানেক গজ দূরে খাতের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা। টর্চের আলো একটা বড় পাথরের ওপর ফেলে দেখালো। তারপর আলো ফেললো ভাঙা বেড়ার একটা তক্তার ওপর।

'চকের চিহ্ন!' রবিনও চেঁচিয়ে উঠলো।

আশ্চর্যবোধক নয়, তীর–চিহ্ন এঁকে বুঝিয়েছে ডজ, কোন্ দিকে গেছে।

আঠারো

বিশ গজ দূরে একটা গাছের গায়ে পাওয়া গেল আরেকটা চিহ্ন।

'আর কোনো সন্দেহ নেই,' কিশোর বললো। 'এই খাতের মধ্যেই ডজকে নিয়ে লুকিয়েছে ইকন।'

'শিওর হলে কি করে?' প্রশ্ন করলেন রিকটার।

'ডজকে চক দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, দরকারের সময় ওরকম চিহ্ন রেখে যেতে।'

দলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ট্র্যাকার মুসা। সে চললো আগে আগে। সবার পেছনে মল আর ব্যাং।

চার নম্বর, তারপর পাঁচ নম্বর চিহ্নটা পাওয়া গেল। গিরিখাতের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে ওরা। গাছপালা কম এদিকে, পাথর বেশি। আর আছে এক জাতের কাঁটা ঝোপ। কাপড় ছিঁড়ছে, হাত–পায়ের চামড়া ছড়ছে। চাঁদ ডুবে গেছে। পেন্সিল টর্চের ক্ষীণ আলোই

এখন ভরসা। দু'ধারে উঁচু হয়ে আসছে পাহাড়ের দেয়াল, ফলে খাদের তলায় অন্ধকার বেশি।

অনেকক্ষণ ধরে আর চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।

'কোথায় গেল?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো রিকটার।

'ছড়াও, ছড়িয়ে পড়ো,' সহকারীদের নির্দেশ দিলো কিশোর। 'আপনারাও ছড়িয়ে পড়ুন। ডাক দিলে যাতে শোনা যায়, এতোখানি দূরত্বের মধ্যে থাকবেন।'

বিশ মিনিট পর আরেকটা চিহ্ন খুঁজে পেলো ব্যাং। যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তার একশো গজ সামনে, কিছুটা ডানে। ডাক দিলো সবাইকে।

'দ্বিধায় ফেলার জন্যে এরকম করেছে,' মুসা বললো। 'একবার এদিকে গেছে, একবার ওদিকে। আমার মনে হয় পরের চিহ্নটা বাঁদিকে পাওয়া যাবে।'

ঠিকই অনুমান করেছে সে। পাওয়া গেল চিহ্ন।

এগিয়ে চললো দলটা। দুর্গম হচ্ছে পথ। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি। সবাই সতর্ক, পিছলে পড়ে পা ভাঙতে চায় না। তাছাড়া কাঁটা ঝোপও ঘন হয়ে আসছে। স্বভাবতঃই চলার গতি ধীর হয়ে গেল ওদের।

হঠাৎ বাঁয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিলো গিরিখাত। সরু হতে হতে আবার চওড়া হয়ে গেল। চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ থেকে।

'ছড়িয়ে পড়তে হবে,' বললো মুসা। 'তখনকার মতো।'

সামনে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'কে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রিকটার। 'ডজ?'

থমকে দাঁড়ালো মূর্তিটা।

'ডজ, তুমি?' আবার ডাকলেন রিকটার।

ডানে ঘুরে চলতে শুরু করলো মূর্তিটা।

ছুটে গিয়ে তার গায়ে আলো ফেললো গোয়েন্দারা। ফ্যাকাসে চেহারা, কালো চুল, পরনে কালো পোশাক। কাঁধে একটা ছোট বস্তা ঝুলিয়ে ধরে রেখেছে। আলো গায়ে পড়তেই ছুটতে লাগলো লোকটা।

'ক্যাভেলিয়ার ইকন!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'ধরো! ধরো!' রিকটারও চেঁচিয়ে উঠলেন।

খাতের একদিকের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল ইকন। হারিয়ে গেল ওধারে।

অন্ধকারে পিছু নিলো পাঁচজনে। পাথর আর কাঁটার পরোয়াই করলো না, হুড়মুড় করে উঠে এলো ওপরে। ওই যে, নেমে যাচ্ছে ইকন!

নেমে একটা ফাটলের ভেতর ঢুকে গেল সে। ভুলটা করলো ওখানেই। ওটা একটা বক্স ক্যানিয়ন। ঢোকার পথ আছে, বেরোনোর নেই। বেরোতে চাইলে, যেখান দিয়ে

ঢুকেছে সেখান দিয়েই বেরোতে হবে।

ফিরে চাইলো ইকন। দেয়ালে পিঠ। টর্চের আলোয় তার চোখ জ্বলছে কোণঠাসা জানোয়ারের মতো।

'আমার ছেলে কোথায়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন রিকটার।

দ্রুত ডানে–বাঁয়ে তাকালো জীবন্ত ভ্যাম্পায়ার। পালানোর পথ খুঁজছে। উপায় নেই। অর্ধচন্দ্রাকারে তার দিকে এগোচ্ছে ছয়জন।

'সরো! সরে যাও!' ধমক দিলো ইকন। 'নইলে কোনোদিনই জানবে না!'

'আমার ছেলে কোথায়?' গর্জে উঠলেন রিকটার।

'যদি না বলি?'

'জেলে যাবে।'

হেসে উঠলো ইকন। 'পুলিশের কাছে গেলে তুমিই ঠকবে, রিকটার। এই ছেলে তিনটা আর তোমার ছেলে চুরি করতে ঢুকেছিলো আমার বাড়িতে। হাতেনাতে ধরেছি। পুলিশ–টুলিশের ভাবনা বাদ দাও। তার চেয়ে এসো, একটা চুক্তি করি।'

'কিডন্যাপারের সঙ্গে কোনো চুক্তি হবে না আমার।'

'স্যার,' মুসা বলে উঠলো। 'ওর ওই বস্তার মধ্যেই মূর্তিটা আছে। খুলে দেখা দরকার।'

'আমার জিনিস চুরি করেছো!' কঠিন কণ্ঠে ইকনকে বললেন রিকটার।

'না, কিনে নিয়েছি। ন্যায্য দাম দিলে আমি আবার তোমার কাছে বিক্রি করতে পারি।'

বস্তাটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাং। 'ওটাতে আছে মূর্তিটা, না? তাহলে...'

ঝিক্ করে জ্বলে উঠলো উজ্জ্বল আলো। আলোকিত হয়ে গেল পুরো বক্স ক্যানিয়নটা। চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

আপনাআপনি চোখের সামনে হাত উঠে গেল সকলের।

ইকনের মাথার ওপরে পাহাড়ে দেখা গেল শাদা ধোঁয়ার স্তম্ভ। সেই সঙ্গে একটা বিকট চিৎকার।

দেখা দিলো জীবন্ত খেপা শয়তান। ছড়ানো শিং। লাল চোখ। বেজে উঠলো ঘন্টা, হাড়ের সঙ্গে হাড় বাড়ি লাগার খটাখট।

গুমগুম করে উঠলো ফাঁপা ভারী কণ্ঠ, 'প্রেতকে যারা বিরক্ত করে, মরবে!'

কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে বস্তাটা ছেড়ে দিলো ইকন। সরে এলো। আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে শয়তানের দিকে।

'কে তুমি?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন রিকটার।

'চুপ!' ধমক দিলো শয়তান। 'প্রেতের কাজে বাধা দিলে শেষ হয়ে যাবে!…মুক্তি চায় ওই মূর্তির প্রেতাত্মা!' মাটিতে পড়ে থাকা বস্তার দিকে হাত তুললো সে।

ঝিক্ করে উঠলো আলো, বুম করে একটা শব্দ হলো। এক ঝলক ধোঁয়া, তারপর আগুন ধরে গেল বস্তাটায়।

'মহান খানের কাছে ফিরে যাবে ওর আত্মা!' বললো শয়তান।

পাহাড়ের ওপরে আবার উজ্জ্বল আলো জ্বললো। শাদা ধোঁয়া গ্রাস করলো শয়তানকে। অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

উনিশ

'শয়তানী!' বলে উঠলেন রিকটার। 'স্রেফ ভাঁওতাবাজি!'

ব্যাং চেয়ে রয়েছে ওপরের দিকে, ধোঁয়া এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। বিড়বিড় করে কি বললো সে, বোঝা গেল না।

'সব শয়তানী!' আবার বললেন রিকটার। 'লাউড স্পীকার…ফ্লেয়ার আর স্মোক বম্ব…ধোঁকাবাজি…নিশ্চয় ইকনের শয়তানী। কাউকে ছদ্মবেশ পরিয়ে ওই অভিনয় করার নির্দেশ দিয়ে এসেছে।'

কুঁকড়ে রয়েছে ইকন।

'দেখো, ভালো চাও তো বলো এখনও,' কড়া গলায় বললেন রিকটার। 'আমার ছেলে কোথায়?'

চুপ করে রইলো ইকন।

'গেছে মূর্তিটা,' এই সময় বলে উঠলো মুসা। পা দিয়ে নেড়ে পোড়া বস্তার ভেতর থেকে একটা ভারি জিনিস বের করেছে।

বিকৃত জিনিসটার দিকে তাকালো সবাই।

'হ্যাঁ, মূর্তিটাই!' বললো রবিন।

'গেল!' বললেন রিকটার।

'গেছে, গেছে!' কেঁদে ফেলবে যেন ব্যাং। 'শেষ!'

ঝুঁকে বস্তা-পোড়া টুকরোগুলো সরালো কিশোর। বিকৃত ধাতব বস্তুটা ছুঁয়ে দেখলো। 'ভীষণ গরম!' আনমনে বললো। 'কিন্তু বস্তা পোড়া আগুন তো এতো গরম হয় না যে ব্রোঞ্জ গলিয়ে দেবে!'

'তাহলে কিসে গলালো?' প্রশ্ন করলো মুসা।

নীরবতা। কেউ জবাব দিতে পারলো না।

'কিশোর, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এটাই সেই মূর্তি?' জিজ্ঞেস করলেন রিকটার।

'কি জানি!' অনিশ্চিত শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। 'একটা শিং তো দেখা যাচ্ছে, গোল স্ট্যাণ্ডটাও আছে। বেল্টটা...' হঠাৎ আবার ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো পোড়া বস্তুটা। রহস্যময় লাগছে তার ভাবভঙ্গি।

'দেখে আর কি হবে? গেছে!' গোঁ গোঁ করে উঠলো ইকন। 'মোটা টাকা বেরিয়ে চলে গেল আমার হাত থেকে?'

'তোমার টাকা গেছে আমার কি?' হাত নাড়লেন রিকটার। 'আমি আমার ছেলে চাই। কোথায় রেখেছো?'

'আছে, ভালোই আছে। আর আটকে রেখে কি হবে? চলো, নিয়ে যাচ্ছি।'

বক্স ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। গিরিখাত ধরে এগিয়ে চললো পর্বতের আরো গভীরে।

আগে আগে চলেছে ইকন। টর্চের আলোয় একটু পর পরই চকের চিহ্ন দেখতে পেলো ছেলেরা। ইকনও দেখলো। 'ও, এভাবেই আমার পিছু নিয়েছিলে?' ভীষণ তিক্ত কণ্ঠ। 'বিচ্ছু একেকটা।'

'তোমার চেয়ে যে চালাক ওরা, তাতে সন্দেহ নেই,' বললেন রিকটার। 'তবে তোমার মতো শয়তান নয়।'

আরেকটা মোড় ঘুরলো ওরা। সামনে খানিকটা খোলা জায়গায় একটা পুরানো কাঠের কুঁড়ে দেখা গেল।

'ওখানে,' বললো ইকন। 'ওর গায়ে হাত দিইনি আমি। শুধু আটকে রেখেছি।'

আড়াআড়ি তক্তা ফেলে, আর ছিটকিনি লাগিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে দরজা। খোলা হলো। রবিন আর মুসা টর্চের আলো ফেললো ভেতরে।

কুঁড়ের দুটো কামরা। একটা ঘরের কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ডজ। ইকনকে দেখেই জ্বলে উঠলো চোখ। 'হারামজাদা...শয়তান...'

'ডজ! ভালো আছিস, খোকা?' তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন রিকটার।

'সরো, বাবা,' ঘুসি পাকিয়ে এগোলো ডজ। 'শয়তানটার নাক ভেঙে নিই আগে...'

জোর করে তাকে ধরে রাখলেন রিকটার।

ডজ বললো, 'নিশ্চয় চকের চিহ্ন দেখে এসেছো। হারামীটা আমাকে এখানে আটকে রেখে মূর্তিটা বস্তায় ভরে নিয়ে চলে গেল ...পেয়েছো ওটা?'

মাথা নাড়লেন রিকটার, 'না, ডজ, ওটা গেছে...'

'নষ্ট করে দিয়েছে,' বললো রবিন। 'গলিয়ে দিয়েছে।'

'ফিরে গিয়ে এখন কি জবাব দিই বসদেরকে!' ব্যাঙের কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা।

'কে নষ্ট করলো?' জানতে চাইলো ডজ।

'বড় শয়তানটা,' জবাব দিলো মুসা।

'তোমরা বেরোলে কিভাবে?... কিশোর কোথায়?'

ঘুরে তাকালো মুসা। তাই তো। কিশোর তো নেই। গেল কোথায়?

'ওটা কি, ওটা!' চেঁচিয়ে উঠলো লিসটার।

পেছনের জানালায় আলো ফেললো রবিন আর মুসা।

ভয়ংকর একটা মুখ। দুটো শিং।

'আবার এসেছে!' আস্তে বললেন রিকটার।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল শয়তানের চেহারা, তার জায়গায় দেখা দিলো কিশোর পাশার মুখ। হাসছে। 'না, আর আসেনি। আমিই এসেছি।' দু'হাতে মাথার ওপর ধরে রেখেছে মুখোশটা।

জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কিশোরের মুখ। পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ঘুরে এসে ঢুকলো সে। এক হাতে শয়তানের মুখোশ, আরেক হাতে বেল্ট—তাতে ঘন্টা আর হাড়গুলো বাঁধা। নাড়া দিতেই বিচিত্র শব্দ করে উঠলো।

'এসব পরেই শয়তান সেজেছিলো,' বললো সে।

বিশ

'ওই মুখোশ তুমি কোথায় পেলে, কিশোর!' অবাক হয়েছেন রিকটার। 'ওটা তো আমার আলমারিতে ছিলো।'

'তা ছিলো,' মাথা কাত করলো কিশোর। 'বের করে আনা হয়েছে। আমি পেয়েছি এই কুঁড়ের পেছনে। খেপা শয়তানের চামড়া, লেজ, সব আছে ওখানে। শয়তানের জ্বলন্ত চোখ বানানোর জন্যে ছোট লাল বাল্ব আছে, ব্যাটারি আছে। কিছু কেমিক্যাল আছে, ফ্লেয়ার বম্ব, ধোঁক বম্ব, ছোট টেপ রেকর্ডার, শক্তিশালী লাউড স্পীকার সবই আছে। শয়তান যে সেজেছে, ইলেকট্রনিক্স আর কেমিস্ট্রিতে ভালো জ্ঞান আছে তার।'

'সে কে? বুঝতে পেরেছো?'

মাথা ঝোকালো কিশোর। 'পরে বলছি সেকথা। গোড়া থেকেই শুরু করি। ভূত-প্রেত বিশ্বাস করি না আমি। শয়তানটাকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছি, ভাঁওতাবাজি। আরও বুঝলাম, কোনো কারণে আমাদেরকে ভয় দেখাতে এসেছে। ভাবলাম, কোনো

মঙ্গোল না তো? অনেক পরে বুঝলাম, মঙ্গোল নয়। কারণ তাদের প্রতিনিধিই আসছেন সরকারীভাবে, জিনিসটা আপনার কাছ থেকে নিতে।'

'কিন্তু তিনি আর নিতে পারছেন না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন রিকটার। 'মূর্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'না, হয়নি,' বললো কিশোর।

'হয়নি!'

'না। যেটা হয়েছে, সেটা নকল...'

'কি বলছো তুমি, কিশোর!' বাধা দিয়ে বললো ডজ। 'আসল না নকল কি করে জানলে? মূর্তি চেনো তুমি?'

'চিনি না,' স্বীকার করলো কিশোর। 'তবে ওই একটা চিনতে পেরেছি।'

'তুমি শিওর, কিশোর?' রিকটার বললেন।

'শিওর। নকলটা যে বানিয়েছে, মূর্তি বানানোয় হাত তার অসাধারণ। তবে লোকটা সৎ নয়। লোকের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকতেও তার বাধে না...'

'কার কথা বলছো!' বাধা দিয়ে বললো মুসা। 'হাতাকাটা কালো কোট গায়ে দেয় যে লোকটা?'

'হ্যাঁ। একজনের আদেশে মূর্তিটা বানিয়ে রকি বীচে এনেছিলো। কোনো কারণে একটা দুর্ঘটনা ঘটালো, ঢুকে পড়লো এক মহিলার বাগানে। গোলমাল হয়ে গেল সব। গাড়ির দরজা খুলে কেসসহ পড়ে গেল মূর্তিটা। সেটা তখন খেয়াল করেনি লোকটা। পরে যখন করলো, আবার ফেরত আনতে গেল। ততোক্ষণে মূর্তি গায়েব।'

'এতো কিছু তুমি জানলে কিভাবে?' ডজের কণ্ঠে বিস্ময়, কিছুটা অস্বস্তিও।

'কিছু জেনেছি তদন্ত করে, আর কিছু অনুমানে। যা বলছিলাম, লোকটার হাত ভালো। ফটোগ্রাফ দেখে বানিয়েছে মূর্তিটা, হয়েছিলো ভালোই, তবে নিখুঁত কি আর হয়? ফটোগ্রাফে সব কিছু ঠিকমতো আসে না। আর তা দেখে মূর্তি বানাতে গেলে ভুল হবেই। ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলেছিলো লোকটা।'

'কি ভুল?' জিজ্ঞেস করলেন রিকটার।

সে-কথার জবাব না দিয়ে রবিনের দিকে ফিরলো কিশোর। 'নথি, প্রফেসর লিয়াঙের কাছ থেকে যে বইটা এনেছিলাম, তাতে মূর্তিটার বর্ণনা আছে। ভালোমতোই পড়েছো। বলো তো, বেল্টে কি কি জিনিস আছে?'

এক মুহূর্ত ভাবলো রবিন। তারপর বললো, 'ঘন্টা, ঝুমঝুমি, হাড়, গমের শিষ...'

'ইয়েস, গমের শিষ!'

'গমের শিষ!' প্রতিধ্বনি করলো যেন ব্যাং।

'কিন্তু কিশোর,' রিকটার বললেন। 'পোড়া মূর্তিটার বেল্টে দেখেছি ভুট্টা...'

'আর্টিস্টের ভুলটাই তো সেটা। গমের শিষের জায়গায় ভুট্টার শিষ বানিয়ে দিয়েছে। ইকনের ঘরে মূর্তিটা দেখেই খুঁতখুঁত করছিলো মন, ধরতে পারছিলাম না ব্যাপারটা। কিছুতেই মনে পড়ছিলো না…'

'কী?'

'বাটু খানের মূর্তির বেল্টে ভুট্টা থাকতেই পারে না। ওটা যখন তৈরি হয়, ভুট্টা চিনতোই না মঙ্গোলরা। চিনেছে আরও কয়েকশো বছর পরে। সেই তফাতটা জানা ছিলো না আমাদের আর্টিস্টের। কিন্তু খেপা শয়তান যে সাজতে গেছে, আসল মূর্তিটা সে দেখেছে, তাই তার কোমরে গমের শীষই ঝুলিয়েছে। সে-ভুল করেনি। আর তাতেই সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছে আমার।'

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো সবাই।

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করলেন রিকটার। 'নকলটা কেন বানালো? আর শয়তানই বা সাজতে গেল কেন?'

হেনরি মলের দিকে ফিরলো কিশোর। 'মিস্টার সেক্রেটারি, দয়া করে বলবেন?'

'আমি…আমি…না না, বলতে পারবো না…'

'নকল!' গম্ভীর কণ্ঠে বললো ব্যাং। 'আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছিলো! আমার দেশকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলো! নকলটা দিয়ে!'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললো কিশোর। 'তাই করতে চেয়েছিলো। আসল খেপা শয়তান যাতে চীনে না যায়। আপনি মূর্তি বিশেষজ্ঞ নন, সহজেই আপনাকে বোকা বানাতে পারতো। কিন্তু দেশে নিয়ে গেলে আপনাদের এক্সপার্টরা ঠিকই চিনে ফেলতো। আর সে-কারণেই নষ্ট করা হয়েছে নকল মূর্তিটা, অনেক সাক্ষীর সামনে। চেয়েছিলো, এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।'

'হেনরি!' গর্জে উঠলেন রিকটার। 'তোমাকে…তোমাকে আমি…'

'না না, স্যার,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'সবটা দোষ আপনার সেক্রেটারির নয়। তাই না, ডজ?'

'আমি?' চেঁচিয়ে উঠলো ডজ। 'পাগল!…তোমার মাথা খারাপ!'

'ডজ! মানে আমার ছেলে…'

'হ্যাঁ, স্যার,' বললো কিশোর। 'আপনার ছেলেই জ্যান্ত শয়তানের অভিনয় করেছে। নকলটা সে-ই বানানোর অর্ডার দিয়েছে। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার, যখন আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হলো। মূর্তিটা না দেখে চমকে উঠেছিলো হয়তো, এর সামান্য আগেই বাক্সে দেখেছিলো, খানিক পরে না দেখলে তো অবাক হবেই। আমরা মূর্তির খোঁজে গিয়েছি শুনেই আসল মূর্তিটা লুকিয়ে ফেলেছিলো

ডজ, নইলে আমরা জেনে যাবো একই রকম দুটো আছে।'

'ফালতু বকছো তুমি!' মেজাজ দেখিয়ে বললো ডজ। 'ধরলাম তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু নকল মূর্তিটা কি করে নষ্ট করলাম? আমি তো এখানে বন্দি ছিলাম।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'অন্য ঘরটার পেছনে গেলে সবাই দেখতে পাবে। বেড়ার একটা বোর্ড ফাঁক, খোলা। আর এই জিনিসটাও পেয়েছি আমি,' বলে বেল্টে ঝোলানো ছোটো একটা চামড়ার থলে দেখালো কিশোর। থলের মুখ খুলে উপুড় করতেই পড়লো এক টুকরো চক। 'এটা আমরা দিয়েছিলাম আপনাকে। চিহ্ন এঁকে এঁকে ক্ষয় করে ফেলেছেন। থলে থেকে ফেলতে ভুলে গিয়েই ভুলটা করেছেন। কি আর করা, বলুন? উত্তেজনার মধ্যে কতো আর মাথা ঠিক রাখা যায়? অপরাধীরা ধরা পড়ে এজন্যেই।'

'কেন করেছো এই কাজ?' কৈফিয়ত চাইলেন রিকটার।

'তোমার জন্যে, বাবা। মূর্তিটা তুমি কতো ভালোবাসো, জানি তো। চীনারা নিয়ে গেলে দুঃখ পাবে। তাই ওদেরকে ঠকিয়ে তোমার জন্যেই রাখতে চেয়েছিলাম।'

'আর সেটাই মস্ত অন্যায় করেছো,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন রিকটার। 'যার জিনিস তার কাছেই থাকা উচিত।'

একুশ

কয়েক দিন পর। বিখ্যাত পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে তাঁর বিশাল ডেস্কের ধারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

খেপা শয়তানের 'ফাইল' পড়ছেন পরিচালক।

পড়া শেষ করে মুখ তুললেন। 'ক্যাভেলিয়ার ইকনই তাহলে পথ দেখালো তোমাদেরকে। যদিও না জেনে।'

'প্রথমে নয়, স্যার,' বুঝিয়ে বললো কিশোর। 'ডজের ইচ্ছে ছিলো নকলটা দিয়ে দেবে মিস্টার ব্যাংকে। আবার কোনোভাবে চুরি করবে। তারপর ওটা নষ্ট করবে ব্যাঙের সামনে। ইকন আর আমরা জড়িয়ে যাওয়াতে আরও সুবিধে হলো তার। আমাদের সকলের সামনেই নষ্ট করলো।'

'আর করলো তো করলো, একেবারে কিশোর পাশার সামনে,' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'বেচারার দুর্ভাগ্য।'

'আসলে ভুল সিদ্ধান্তই তার দুর্ভাগ্যের কারণ।'

'মানে?'

'শুরু থেকেই বলি। সেরাতে মুসাদের গ্যারেজে আর্টিস্ট যখন মূর্তি খুঁজতে যায়,

তার সঙ্গে যায় ডজ। সাহায্য করতে। শয়তান সাজার জিনিসপত্র তার গাড়িতেই ছিলো, তেমন পারিস্থিতি দেখা দিলে যাতে ব্যবহার করতে পারে। দরকার পড়েছিলো, তাই আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলো। আর্টিস্টকে নিরাপদে মূর্তি খোঁজার সুযোগ করে দিলো। কিন্তু লাভ হলো না, পেলো না। পরদিন রকি বীচের ছেলেদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলো, গোয়েন্দা হিসেবে আমাদের ভালোই সুনাম। তখন আমাদের ওপর চোখ রাখলো। কালো কেস খুঁজতে খুঁজতে গুহায় গেলাম আমরা। সে-ও আমাদের পিছে গেল। আমরা মূর্তিটা পেয়েছি ভেবে, শয়তান সেজে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিলো আমাদেরকে। ওখানেও পেলো না মূর্তি। খোঁজখবর করে আমরা তার বাড়ি গেলাম। তাতে মস্ত সুবিধে হলো তার, অনুসরণের আর দরকার হলো না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে পারলো। চীফ জানালো, মূর্তিটা হ্যাগার্ডের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের সামনে ওটা নিতে চাইলো না ডজ—বাড়তি সতর্কতা, তাই কায়দা করে আমাদের বোটে আটকে রাখার ব্যবস্থা করলো।'

'কেবিন ক্রুজারটা ওর বাবার,' রবিন জানালো।

'তাই নাকি?' ভুরু তুললেন পরিচালক। 'তা কি করে তোমাদের ম্যানেজ করলো?'

বলে গেল কিশোর, 'ভবঘুরেদের ক্যাম্পে, গাড়ি আনার ছুতো করে আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে। স্টেশন ওয়াগনে টেলিফোন আছে। ফোনে আর্টিস্টের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের জন্যে একটা ফাঁদ পাতলো। সেই ফাঁদে ধরা দিলাম আমরা। আর্টিস্টের পিছু নিয়ে গিয়ে বোটে আটকা পড়লাম বোকার মতো। ইতিমধ্যে হ্যাগার্ডের দোকানে গিয়ে ডজ দেখলো, মূর্তি বিক্রি হয়ে গেছে। বোট থেকে তখন বের করে নিলো আমাদের, যাতে আরেকবার মূর্তি খোঁজায় সাহায্য করতে পারি তাকে। হ্যাগার্ডের পিছু নিয়ে ইকনের বাড়ি পৌঁছলাম। ইকনকে চেনে ডজ। আমাদের অজান্তে তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে জানলো, মূর্তিটা তার বাড়িতে আছে, তার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললো। আরেকবার আটকালো আমাদেরকে, ইকনের বাড়ির সেলারে। মলের কাছে ফোন করে জানলো, তার বাবা সেদিনই ফিরে আসছে। ব্যাস, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ডজ। চমৎকার এক খেলা খেললো গিরিখাতের মধ্যে। চীনা প্রতিনিধিসহ অনেক সাক্ষীর চোখের সামনে পুড়িয়ে দিলো নকল মূর্তিটা।'

'কাজ প্রায় হয়ে গিয়েছিলো,' কিশোর থামলে বললো রবিন। 'ভুট্টার শিষটা না গলেই বাধালো যতো গণ্ডগোল।'

'কিভাবে পোড়ালো এতো দূর থেকে?'

'ছোট একটা বোমা ভরে রেখেছিলো বস্তার মধ্যে। রিমোট কমাণ্ডারের সাহায্যে ফাটিয়েছে। কম শক্তির বোমা ছিলো, যাতে মূর্তিটা পুরোপুরি নষ্ট না হয়। কিছু কিছু

চেনা যায়।'

'বুদ্ধিটা ভালোই করেছিলো। কিন্তু অল্পের জন্য সব গোলমাল…যাই হোক, চীফের গুহায় আগুন জ্বেলেছিলো কিভাবে?'

'ব্লো টর্চের সাহায্যে,' জবাব দিলো মুসা। 'রোমশ পোশাকের থাবায় কায়দা করে লুকিয়ে রেখেছিলো খুদে একটা টর্চ।'

'বুঝলাম,' কিশোরের দিকে তাকালেন পরিচালক। 'হুঁ, তারপর?'

'যেই বুঝলাম, মূর্তিটা নকল,' আবার বলে গেল কিশোর। 'দু'জনের ওপর সন্দেহ হলো। এক, মিস্টার রিকটার। দুই, তাঁর ছেলে ডজ। অনেক ভাবলাম। বুঝলাম, ডজই সব শয়তানীর মূলে, তার বাবা নির্দোষ। মিস্টার রিকটারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর দেখা পেলাম না। পেলাম ডজের দেখা। মূর্তি চুরির কথা তাকে বললাম। আমাদেরকে কালেকশন রুমে নিয়ে গেল। প্রথমেই তো তার তাকানোর কথা সেই বাক্সটার দিকে, যেটাতে আসলটা ছিলো। সত্যি চুরি গেছে কিনা দেখার জন্যে। তা না করে তাকালো অনেক পরে। যে কারোই খটকা লাগবে এতে।

'তারপর, ভবঘুরেদের আস্তানায় চীফের সঙ্গে আমাদেরকে কথা বলতে বলে সে গাড়ি আনতে গেল। ছুতো দেখালো, তাড়াহুড়ো করতে হবে। ওটা কোনো ছুতোই হয়নি। গাড়ি আনার কোনো দরকার ছিলো না। সবাই আমরা দৌড়ে যেতে পারতাম গাড়ির কাছে। আসলে সে গিয়েইছিলো আর্টিস্টকে ফোন করতে। তাকে নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে রাখার জন্যে।

'দ্বিতীয়বার আমাদের কাছ থেকে সরলো বন্দরে গিয়ে, গাড়ি পার্কিং করে আসার ছুতো দেখিয়ে। ও সরে থাকার সময় আর্টিস্ট আমাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে বোটে বন্দি করলো।'

'হুঁ, বড় কোনো ভুল করেনি ডজ,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'ছোটখাটো ভুল। কিন্তু তোমাদেরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তবে পণ্ড করেছে সব ওই ভুট্টার শিষ। আর্টিস্ট ইতিহাস জানে না বলেই ওই ভুলটা করলো। তো, তাকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে?'

'হয়েছে,' জানালো মুসা। 'ডেকে আনিয়েছেন মিস্টার রিকটার। ধমক দিতেই সব কথা গড়গড় করে বলে দিয়েছে আর্টিস্ট, নকল মূর্তি বানানোর কথা স্বীকার করেছে, মিস্টার ব্যাঙের সামনে। ডজের আদেশে বানিয়েছে, একথাও বলেছে।'

'আচ্ছা, একটা ব্যাপার,' হাত তুললেন পরিচালক। 'এতোগুলো কালো কেস চুরি করতে গেল কেন সে? তারটা কি চিনতো না? শুধু তারটা খুঁজলেই পারতো। চুরির ঝামেলায় গেল কেন?'

'কেসটা তার নয়,' জবাব দিলো কিশোর। 'এক বন্ধুর কাছ থেকে দু'দিনের জন্যে চেয়ে এনেছিলো। মূর্তিটা ভরে রাখার জন্যে। ভালোমতো দেখেওনি কেসটা। চিনে রাখেনি। ফলে হারানোর পর বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো বেচারা। মুসাদের ব্লকে যে

বাড়িতে যতো কালো কেস দেখেছে, সব চুরি করেছে, কোন্‌টাতে মূর্তি আছে দেখার জন্যে।'

'অনেক আর্টিস্টই ওরকম খেয়াল হয়,' মন্তব্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'যাকগে ওসব কথা। তো, কার কি শাস্তি হলো? ব্যাং কি পুলিশকে জানিয়েছে?'

'আসল মূর্তিটা ফেরত পেয়েছে, জানানোর কোনো কারণ নেই। মূর্তি নিয়ে দেশে চলে গেছে,' বললো রবিন। 'তবে ভীষণ রেগেছেন মিস্টার রিকটার। অল্পের জন্যে দুর্নামের হাত থেকে বেঁচেছেন। খবরের কাগজওয়ালারা শুনলে কি কাণ্ডটাই না হতো!'

'হ্যাঁ,' একমত হলেন পরিচালক। 'ভয়ানক দুর্নাম হয়ে যেতো তাঁর। করেছে তাঁর ছেলে আর সেক্রেটারি, দোষ হতো তাঁর। কে বিশ্বাস করতো? সবাই ভাবতো, সব কিছুর পেছনেই রিকটারের হাত রয়েছে।...আচ্ছা, ডজ না হয় বাপকে খুশি করার জন্যে ওকাজ করেছে। মল করলো কেন?'

'মনিবকে খুশি করার জন্যে। খুশি তো হনইনি মিস্টার রিকটার, বিদায় করে দিয়েছেন তাকে। তাঁর কথাঃ পারলে কাজ দেখিয়ে খুশি করো, তোষামোদ কেন?'

'ঠিকই করেছেন,' বললেন পরিচালক। 'তো, ডজের কি করলেন?'

'হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছেন, কেমিস্ট্রি আর ইলেক-ট্রনিকসেই যখন এতো শখ, দুটোতেই ডক্টরেট পেতে হবে। নইলে সম্পত্তির এক কানাকড়ি দেবেন না তাকে।'

'হ্যাঁ,' হেসে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'এইটা হয়েছে গিয়ে উচিত সাজা। গুড, ভেরি গুড। মেধা আছে ছেলেটার। ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে,' হাত তুললেন তিনি। 'আর একটা প্রশ্ন। লিলিয়ানের পুতুলের বাক্স উড়লো কিভাবে? ডজেরই কোনো কারসাজি?'

'না,' জবাব দিলো রবিন। 'ওড়েনি। বাক্সটা নিয়ে ডাল বেয়ে উঠে গেছে আর্টিস্ট। বাক্স কালো, লোকটার কোটও কালো। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি লিলিয়ান, ভেবেছে বাক্সটাই বুঝি উড়ে চলে যাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন পরিচালক। বললেন, 'ভাবছি, এই কাহিনী নিয়ে একটা ছবি বানাবো। চমৎকার হবে। খেপা শয়তানের অভিনয় কাকে দিয়ে করাই? ডজ রাজি হবে?'

'আমার তো ধারণা, খুশি হয়েই হবে,' বলে উঠলো মুসা।

'তবে,' কিশোর বললো। 'ওর বাবা রাজি হবেন কিনা সন্দেহ।'

'হুঁম!' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'দেখা যাক, কি করা যায়?'

—ঃ শেষ ঃ—
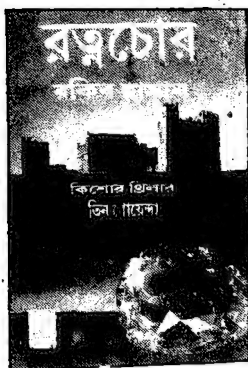
রত্নচোর

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল গোবেল বীচ-এর ওপর দিয়ে।

ক্ষতি হলো খুব। অন্যান্য অনেক বাড়ির মতো জিনাদের বাড়িটাও নষ্ট হয়েছে। ঝড়ের পরদিন সকালে 'গোবেল ভিলা'-কে আর চেনা যায় না। ছাতের বেশির ভাগ উড়ে গেছে, চিমনি ধসে পড়েছে, অক্ষত রয়েছে একটিমাত্র ঘর, যেটাতে জিনার বাবা-মা থাকেন।

বাড়ি মেরামতের জন্যে মিস্ত্রিদের খবর দেয়া হলো। যন্ত্রপাতি নিয়ে এলো ওরা। শুরু হলো কাজ। বিকট শব্দে কান ঝালাপালা। রান্না করার অসুবিধে, ফলে খাওয়ারও অসুবিধে। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো রাতে শোয়ার। শুধু দু'জন–মিস্টার আর মিসেস পারকারের জন্যে অসুবিধে নেই, কিন্তু বাকি চারজন? তারা কোথায় থাকবে?

গরমের ছুটি। স্কুল বন্ধ। জিনার সঙ্গে তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। যেদিন বিকেলে এসেছে, সেদিন রাতেই ঝড়।

'কি করা যায়, বল তো?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর পাশা।

চুপ করে রইলো জিনা। কি জবাব দেবে?

মুসা আর রবিন পরামর্শ দিলো, আবার রকি বীচে ফিরে যাওয়া যাক। একটা ছুটি নাহয় নষ্টই হলো। দুর্ঘটনার ওপর তো কারো হাত নেই।

'এতো ভাবছো কেন?' পেছন থেকে বলে উঠলেন জিনার মা। কখন বাগানে বেরিয়ে এসেছেন, টের পায়নি ছেলেমেয়েরা। 'এই জিনা, এক কাজ করলেই তো পারিস। এখন গরম। তোর দ্বীপে চলে যা। খাবার আর তাঁবু-টাবু নিয়ে যা, এখানকার চেয়ে ভালো থাকবি। কয়েকটা দিন রবিনসন ক্রুসো হয়ে কাটা গিয়ে। ঘর মেরামত হয়ে গেলে নাহয় আবার চলে আসবি।'

মুখের মেঘ কেটে গেল সকলের। আনন্দে হুল্লোড় করে উঠলো ওরা।

তিড়িং করে দুই লাফ দিলো রাফিয়ান।

সেদিন দুপুরের পরই রওনা হলো ওরা।

জিনার ছোট নৌকাটায় বোঝাই করে নেয়া হয়েছে জিনিসপত্র।

কিশোর আর মুসা দাঁড় বাইতে লাগলো। হাল ধরলো জিনা। নৌকার মাঝখানে

বসে আছে রবিন—কিছুক্ষণ পরপর দাঁড় বাওয়ায় রিলিফ দেবে কিশোরকে। মুসা বেয়ে যেতে পারবে একটানা, অনেকক্ষণ। রাফিয়ান বসে রয়েছে গলুইয়ের কাছে, এমন একটা ভাব, যেন মালপত্র পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। কোনো একটা মাছ মাথা তুললেই জোরে ধমক মারছে ওটাকে।

দিনটা চমৎকার। আগের রাতের ঝড়ের কোনো লক্ষণই নেই আবহাওয়ায়। সাগরের পানি ঘন নীল! উজ্জ্বল রোদ। মাথার ওপর উড়ছে সী গাল। মাঝে মাঝে ডাইভ দিয়ে নেমে আসছে, ঠোঁটে মাছ চেপে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আবার।

গোবেল দ্বীপের সৈকতে নৌকা ভিড়লো।

তিন গোয়েন্দা অনেক দিন পর এসেছে এখানে। দেখলো, ঠিক আগের মতোই রয়েছে দ্বীপটা। কোনো পরিবর্তন হয়নি। তেমনি সুন্দর। ঘাসের ফাঁকে ছোটাছুটি করছে খরগোশ। দ্বীপের মাঝের ভাঙা, নির্জন দুর্গটায় অগণিত দাঁড়কাকের বাসা।

'সত্যি জিনা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। 'তুমি ভাগ্যবতী! এমন একটা দ্বীপের মালিক হওয়া…'

'কেন লজ্জা দিচ্ছো?' বাধা দিয়ে বললো জিনা। 'সেবার তোমরা সাহায্য না করলে কি এটার মালিক হতে পারতাম? বাবা তো প্রায় বেচেই দিয়েছিলো। দেখো, আর কক্ষণো বলবে না গোবেল দ্বীপ শুধু "আমার"। এটা আমাদের, আমাদের চারজনের …না না, পাঁচ…দেখো দেখো রাফি মন খারাপ করে ফেলছে…'

হেসে উঠলো সবাই।

পুরনো দুর্গের বিশাল পাথুরে চত্বরে এসে উঠলো ওরা। এখানে ওখানে জমে রয়েছে পাথরের ভাঙা স্তূপ। ঘরগুলো বেশিরভাগই ভাঙা।

আগের বার যে বড় ঘরটায় রাত কাটিয়েছিলো, সেটাতে ঢুকলো।

'ঝড়বাদল শুরু হলে এখানেই থাকতে পারবো,' বললো জিনা।

'আমি বাপু বাইরে তাঁবুতেই থাকতে চাই,' হাত নাড়লো মুসা। 'আরও পুরনো হয়েছে এটার দেয়াল। কখন ভেঙে পড়ে ঠিক নেই। মরতে যাবে কে?'

'কপালে যদি ওভাবেই মরণ লেখা থাকে, কি আর করবে?' হেসে বললো রবিন। 'আমার কিন্তু ভেতরে থাকতেই ভালো লাগে। মনে হয়, সেই পুরনো যুগে ফিরে গেছি…ভালো কথা, চলো না ডানজনে নামি? দেখি, কেমন আছে ঘরগুলো?'

'কেন, আবার সোনা পাবে ভাবছো নাকি?' বললো জিনা। 'আর নেই। সাফ করে ফেলা হয়েছে। তবে নামবো। আজ নয়, আরেকদিন।'

'এই,' ডাকলো কিশোর। 'বকবক করার সময় অনেক পাওয়া যাবে। এসো, কাজকর্মগুলো সেরে ফেলি। তাঁবু খাটাতে সময় লাগবে।'

কাজে লাগলো সবাই। তাঁবু খাটানো হলো। মালপত্র রাখলো দুর্গের অক্ষত বড়

ঘরটার এক কোণে। আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা হলো চত্বরে।

তাঁবুটা খাটিয়েছে একটা ভাঙা দেয়াল ঘেঁষে। ফলে সাগরের দিক থেকে আসা ঝড়ো বাতাসের দাপট যাবে দেয়ালের ওপর দিয়ে, তাঁবুর ক্ষতি হবে না।

এসব করতে করতেই সন্ধে হয়ে গেল।

খেয়েদেয়ে গল্পগুজব করে ঘুম দিলো ওরা। চমৎকার কাটলো রাত। ঘুমের ঘোরে রোমাঞ্চকর অভিযানের স্বপ্ন দেখলো। আর রাফিয়ান বোধহয় দেখলো খরগোশ। এমন খরগোশ, যেটাকে তাড়া করলেও পালায় না, ধরা দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরদিন সকালে বালতি নিয়ে খাবার পানি আনতে গেল মুসা।

রবিন আর জিনা রান্না করতে বসলো। কিশোর পায়চারি করতে লাগলো খোলা চত্বরে।

রুটি, মাংস আর ডিম ভাজা দিয়ে নাস্তা শেষ করে দ্বীপ ঘুরতে বেরোলো ওরা।

আবহাওয়া ভালো। এক রত্তি মেঘ নেই আকাশে। ঘন নীল সাগর হাতছানি দিয়ে যেন ডাকলো ওদের। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করেই গিয়ে পানিতে নামলো মুসা। তার দেখাদেখি জিনা। অন্যেরাও পারে বসে রইলো না। ফুরুৎ করে উড়ে চলে গেল যেন দিনটা।

পরদিন বিকেলে গোবেল বীচে গেল ওরা, জিনাদের বাড়িটা কতোখানি মেরামত হয়েছে দেখার জন্যে। আরও উদ্দেশ্য আছে। তাজা খাবার আর কিছু ফলমূল কিনে নেবে বাজার থেকে।

বাড়ি মেরামত শেষ হতে আরও সময় লাগবে।

আবার দ্বীপে ফিরে এলো ওরা। বেলা তখনও অনেক বাকি। কি করে সময় কাটানো যায়?

জিনা পরামর্শ দিলো, 'এসো, লুকোচুরি খেলি।'

কিশোর বললো, 'দূর। এখন কি আর সে-বয়েস আছে?'

'বয়েস? বয়েস দিয়ে কি হয়? মন থাকলেই হলো। এসো, খেলি। প্রথমে আমি লুকোবো। তোমরা খুঁজে বের করবে। রেডি।...দাঁড়াও দাঁড়াও, রাফিকে আগে বেঁধে নিই। নইলে গন্ধ শুঁকে চোখের পলকে বের করে ফেলবে। ওকে ছাড়া খুঁজবে তোমরা।...হ্যাঁ, এবার পেছনে ঘোরো। চোখ বন্ধ করে পঞ্চাশ গোনো। তারপর খুঁজতে শুরু করবে আমাকে।'

লুকানোর ভালো একটা জায়গা চেনা আছে জিনার। তার বিশ্বাস, ওখানে লুকালে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। ছেলেরা পেছন ফিরতেই এক দৌড়ে দুর্গের পেছনের পাহাড় চূড়ায় উঠে পড়লো। নামতে শুরু করলো ওধারে। ঢাল বেশ খাড়া। অনেক উঁচু। পা ফসকালে...থাকগে, ওসব ভাবার দরকার নেই।

অর্ধেক পথ নামার পর একটা খোড়ল পাওয়া গেল। মানুষের তৈরি নয়। বড়সড়

কোনো পাথর ছিলো হয়তো ওখানে, কোনো কারণে খসে পড়ে গেছে। গর্তটায় ঢুকে কেউ বসে থাকলে, পাহাড়ের ওপর থেকেও তাকে দেখা যাবে না, নিচের সৈকত থেকেও না।

লুকিয়ে পড়লো জিনা।

খানিক পরেই কিশোরের কণ্ঠ কানে এলো, 'এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে।'

'মনে হয় না,' মুসার জবাব। 'দেখছো না সব সমান। ঝোপ নেই, খানাখন্দ নেই, কোথায় লুকাবে? খরগোশের গর্তে ঢুকলে পারে...'

রবিন বললো, 'না, এদিকে নেই।'

চলে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। অন্যদিকে খুঁজতে।

মনে মনে হাসলো জিনা। সাগরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। শান্ত নিথর সাগর যেন এক বিশাল আয়না। হঠাৎ কালো একটা বিন্দু চোখে পড়লো। বড় হতে লাগলো বিন্দুটা।

'নৌকা!' আনমনে বিড়বিড় করলো জিনা। 'কে আসছে?'

আরও কাছে এলো নৌকাটা। তাতে দু'জন লোক। দাঁড় বাইছে যে লোকটা, তার পেছনটা দেখতে পাচ্ছে জিনা। ছিপছিপে শরীর, লাল চুল। অন্য লোকটা এদিকে মুখ করে রয়েছে। সঙ্গীর ঠিক উল্টো। গাঁট্টাগোট্টা শরীর, প্রায় চারকোনা বিরাট মাথাটা দেহের তুলনায় বড়।

নৌকা বাইতে জানে বটে লালচুলো লোকটা। এই দ্বীপ চেনে, আরও এসেছে—তার দাঁড় বাওয়ার ঢং দেখেই সেটা আন্দাজ করা গেল। কোথায় কোন্ চোখা ডুবো-চূড়া রয়েছে, জানে। সেগুলোর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে স্বচ্ছন্দে বেয়ে নিয়ে আসছে নৌকাটা।

ঘ্যাচ করে এসে তীরের বালিতে ঠেকলো নৌকার তলা, শুনতে পেলো জিনা। ভাবছে, ব্যাটারা এখানে কি করছে? আমার দ্বীপে? এখানকার সবাই জানে এই দ্বীপটা গোবেলদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অনুমতি না নিয়ে ঢোকা নিষেধ!

যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে লোকগুলোকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না জিনা। তবে বুঝতে পারছে, নৌকা থেকে নামছে ওরা।

ওদের কথা কানে এলো। একজনের কথায় বিদেশী টান, বোধহয় টুরিস্ট। কোনদেশী বোঝা গেল না। বলছে, 'বাহ্, দারুণ জায়গা তো!'

'বলেছিলাম না ভালো লাগবে,' বললো অন্য লোকটা।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলে, কিউট। খুব পছন্দ হয়েছে আমার। দু'দণ্ড শান্তিতে বসে কথা বলার মতো জায়গা।'

'একেবারে নির্জন,' বললো অন্য লোকটা, মানে কিউট। 'কেউ আসে না। মালিকেরাও না।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো জিনা, কিন্তু লোকটার পরের কথা শুনে চুপ হয়ে গেল।

সতর্ক হলো। কান খাড়া।

লোকটা বলছে, 'ভাবছি, কাজ সেরে পালিয়ে এসে এখানেই প্রথমে উঠবো কিনা। এখানে খুঁজতে আসবে না শেরিফের লোক।'

'নাহ্, আমার মনে হয় সেটা উচিত হবে না,' বললো বিদেশী লোকটা। 'সাড়া পড়ে যাবে। কোনো জায়গা বাদ দেবে না ওরা। সবখানে খুঁজবে।'

'আপনি যা-ই বলুন, মিস্টার উহল, এই দ্বীপে আসবে না।'

'কিছুই বলা যায় না। অযথা ঝুঁকি নিতে যাবো কেন? মালটা হ তিয়ে নিয়েই কেটে পড়তে হবে, দূরে কোথাও। সেটাই ভালো...'

'দূরে কোথায় যাবো?'

'সেটা ভেবেচিন্তে ঠিক করবো। সময় তো এখনও অনেক আছে...'

'তা আছে। তিরিশে জুলাই। অনেক সময়।'

নিঃশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে জিনা। বুঝতে পারছে, কোনো একটা অপরাধ করার ফন্দি আঁটছে লোকগুলো, চুরি-ডাকাতি কিছু।

এলোমেলো বাতাস, এখন লোকগুলোর দিক থেকে বয়ে আসছে জিনার দিকে। এভাবে বইতে থাকলে, আর ওরা দূরে সরে না গেলে ওদের সব কথাই শুনতে পাবে সে। জানা যাবে, কোথায় কি করতে চলেছে!

'তা ঠিকমতো খোঁজখবর নিয়েছো তো?' উহলের কণ্ঠ। 'ঝুঁকি নেই?'

'নিয়েছি। ঝুঁকি নেই, ঝামেলা আছে। আস্ত এক দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। ঢোকাই মুশকিল। তবে নিরালা জায়গায় বাড়ি, লোকালয় থেকে অনেক দূরে, চিল্লাচিল্লি করলেও কেউ শুনতে পাবে না। আর এমন জায়গা, টুরিস্টও খুব একটা যায় না ওদিকে। দেখার কিচ্ছু নেই।'

'আরও আগেই সেরে ফেলতে পারলে ভালো হতো,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো উহল। 'সেই কবে তিরিশ তারিখ আসবে...বেনকে ছাড়া হবে না, না?'

'না। অনেক ভেবে দেখেছি, ঢোকার আর কোনো উপায় নেই। ওর সাহায্য লাগবেই।'

'তাহলে আর কি করা? অপেক্ষা করতেই হবে।'

ওই সময় দ্বীপের আরেক প্রান্তে জিনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

'আশ্চর্য!' বললো মুসা। 'কোথাও তো বাদ রাখলাম না। বিশ মিনিট হয়ে গেল।'

'আমার মনে হয়,' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'ডানজনে গিয়ে লুকিয়েছে।'

'ডানজন?' মাথা নাড়লো কিশোর। 'বোধহয় না। দুর্গের অন্য পাশে লুকিয়েছে, তখনই বলেছিলাম। ওর পায়ের আওয়াজ ওদিকেই গেছে শুনেছি আমি।'

'ওদিকে যাওয়ার জায়গা কোথায়?' প্রতিবাদ করলো মুসা। 'খাড়া পাহাড়।

এদিকেই এসেছে। রবিন, চলো তো ওই জায়গাটা দেখি।'

'চলো।'

'আর দশ মিনিট দেখবো,' ঘোষণা করলো কিশোর। 'এর মধ্যে পাওয়া গেলে তো গেল, নইলে আমি আবার দুর্গের দিকেই ফিরে যাবো।'

খুঁজতে থাকলো ওরা।

রাফিয়ানকে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁবুর কাছে, একটা গাছের সঙ্গে। অস্থির হয়ে উঠেছে সে-ও। বার বার নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। বুঝতে পারছে, তার মনিব কোথায় রয়েছে। ছাড়া পেলেই দৌড়ে গিয়ে ঢাল বেয়ে নামার চেষ্টা করবে।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলো সে। কুঁচকে গেল কালো ভেজা ভেজা নাক।

বেশ বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে জিনা। লুকিয়ে লুকিয়ে লোকগুলোর কথা শুনে ফেলেছে। এখন যদি ওকে ওরা দেখে ফেলে, আর বোঝে ওদের কথা শুনেছে মেয়েটা, তাহলে জিনার কপালে দুঃখ আছে। তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে ওরা। কিভাবে করবে, সেটা ওরা জানে; তবে তা জিনার জন্যে ভালো হবে না মোটেও।

'আহ্, এতো ভাবছি কেন!' মনে মনে নিজেকে ধমক দিলো জিনা। 'আমাকে এখনও দেখেনি ওরা। না নড়লে দেখবেও না।'

কিন্তু নড়তে হবে। অনেকক্ষণ ছোট জায়গায় একভাবে কুঁকড়ে বসে থেকে ঝিঁঝি ধরে যাচ্ছে হাতে-পায়ে। ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করা হয়তো যায়, কিন্তু যদি নাড়া লেগে পাথর গড়িয়ে পড়ে? কিংবা শব্দ...

বসে থেকেই টান টান হয়ে ওঠা পেশীগুলোকে সহজ করার চেষ্টা করলো জিনা।

হঠাৎ বদলে গেল বাতাসের গতি। আগের মতো আর স্পষ্ট শোনা গেল না লোকগুলোর কথা।

কি যেন বলছে কিউট। 'ম্যানর হাউসের মহিলা' এই তিনটে শব্দ শুধু বুঝতে পারলো জিনা। তার পর আরও কয়েকটা শব্দ, 'একা থাকে তো...সহজ হবে...'

'পাগল নাকি মহিলাটা!' উহলের জবাব। কয়েকটা কথা বোঝা গেল না। তারপর, '...এতো দামী জিনিস বাড়িতে রাখে...'

'...অলংকার বটে...পান্নার...'

'কারও কাছ থেকে উপহার...'

'...স্পেনের রানী তার এক...'

'বাড়িতে ওসব জিনিস রাখা...মহিলা বোধহয় নিরাপদই ভাবে...'

বাতাসের গতির আরও পরিবর্তন হলো। আর একটা শব্দও কানে এলো না জিনার। তবে আপাতত আর কিছু শোনারও দরকার নেই তার। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে গেছে। কোনো এক ধনী মহিলার দামী অলংকার কিংবা রত্ন চুরি করার পরিকল্পনা

করেছে।

আর বসে থাকতে পারছে না জিনা। অসহ্য লাগছে। কষ্ট হচ্ছে খুব। এখুনি হাত-পা ঝাড়া দিতে না পারলে···সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে মুখ বের করলো সে। বকের মতো গলা বাড়িয়ে নিচে তাকালো। দেখা গেল ওদেরকে। নৌকা ঠেলে পানিতে নামাচ্ছে।

একেবারে ঠিক সময়ে বাতাসের গতি বদল হলো আবার।

'সোজা চলে যাবে,' শোনা গেল গাঁট্টাগোট্টা লোকটার খসখসে কণ্ঠ।

'আচ্ছা,' জবাব দিলো লালচুল।

জিনাকে বলে দিতে হলো না, লালচুল লোকটার নাম কিউট, আর অন্য লোকটা 'মিস্টার উহল'। নৌকাটা আসার সময়ই উহলের চেহারা দেখেছিলো সে, কিউট পেছন ফিরে ছিলো বলে তার চেহারা দেখতে পায়নি। এখন দেখলো, তবে অস্পষ্ট। গোধূলি শেষ, আবছা অন্ধকার, দূর থেকে ঠিকমতো বোঝা গেল না লোকটার চেহারা। আবার দেখলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।

সরে যাচ্ছে নৌকা।

চুপ করেই রইলো জিনা। বেরোনোর সাহস পাচ্ছে না, এমনকি হাত-পা ছড়ানোরও না। নিচে থেকে ওপরের জিনিস আবছা অন্ধকারেও দেখতে পাবে লোকগুলো। নড়াচড়া যদি দেখে ফেলে?.

দুরুদুরু করছে জিনার বুক। আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ায় ভয় আরও বাড়লো। অনেকক্ষণ ধরে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না তিন গোয়েন্দা। ডাকাডাকি না শুরু করে আবার! লোকগুলো তাহলে শুনে ফেলবে। আর শুনলেই ফিরে আসবে দেখার জন্যে। তখন কি ঘটবে কে জানে! তবে ভালো কিছু যে ঘটবে না, সেটা বোঝাই যায়। ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো তার। বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। তাতে ঝুঁকি কিছুটা কম। ওপরের দিকে না তাকালে তাকে দেখতে পাবে না লোকগুলো। কিন্তু তিন গোয়েন্দার ডাক কানে যাবেই।

দুই

খোড়ল থেকে বেরোলো জিনা। নামার চেয়ে ওঠা কঠিন। মাথা ঘুরে যাওয়ার ভয়ে নিচে তাকালো না। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। চূড়ায় উঠেই দিলো দৌড়। বন্ধুদের খুঁজে বের করতে হবে, ওরা ডাকাডাকি শুরু করার আগেই।

একটা ঝোপ ঘুরতেই কিশোরের গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো জিনা।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর, 'এই যে···'

'আস্তে! জোরে কথা বলো না!' কণ্ঠ কাঁপছে জিনার, হাঁপাচ্ছে। চেহারা ফ্যাকাসে, আবছা অন্ধকারেও বোঝা যায়।

'কি হয়েছে? শরীর খারাপ?'

'না। ওরা কোথায়?'

'আছে ওদিকে। তোমাকে খুঁজছে।'

'চলো, জলদি। সবার সামনেই বলবো।'

'এমন করছো কেন, সেটা তো বলবে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'শুনলে চমকে যাবে, আমার মতোই···কোথায় ওরা?'

খানিক দূর এগোতেই দেখা গেল রবিন আর মুসা আসছে।

'পেলে তাহলে,' কিশোরের দিকে চেয়ে বললো মুসা। 'কোথায় লুকিয়েছিলো?'

'পায়নি,' জবাব দিলো জিনা। 'নিজেই বেরিয়েছি। সাংঘাতিক এক কাণ্ড···,' ঘাসের ওপরই বসে পড়লো সে।

একে অন্যের মুখের দিকে তাকালো গোয়েন্দারা। কিছুই বুঝতে পারছে না।

'হয়েছেটা কি?' জানতে চাইলো রবিন।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো জিনা, 'ষড়যন্ত্র!'

'ষড়যন্ত্র!' যেন প্রতিধ্বনি করলো কিশোর। 'মানে?'

'লুকিয়ে ছিলাম। দুই চোরের কথা শুনে ফেলেছি। ওরা···এহ্হে, ওটার ঘেউ ঘেউয়ের জ্বালায় তো···এই রাফি, চুপ কর। আসছি।'

উঠে গিয়ে কুকুরটার বাঁধন খুলে মাথায় আলতো চাপড় দিলো জিনা।

এতোক্ষণ বাঁধা থেকে, আর জিনাকে না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে রাফিয়ান। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো গায়ের ওপর। আরেকটু হলেই ফেলে দিয়েছিলো জিনাকে।

'আরে রাখ, রাখ,' হেসে বললো জিনা। 'চুপ কর।'

'ইস্, কি ঠাণ্ডা বাতাস!' বললো কিশোর। 'গরমের দিনে ই অবস্থা, শীতের দিনে কেমন?'

এ-কথার জবাব দিলো না কেউ। মুসা বললো, 'জিনা, তোমার চোরের গপ্পো···'

'দাঁড়াও,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'আগে আগুন জ্বেলে নিই। আগুনের পাশে বসে শুনবো।'

শুকনো কাঠ-কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালানো হলো চত্বরে। গোল হয়ে বসলো সবাই আগুনের ধারে।

'হ্যাঁ, শুরু করো এবার,' জিনার দিকে চেয়ে বললো কিশোর।

রাফিয়ানের গায়ে হেলান দিয়ে, এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করলো জিনা।

চুপচাপ শুনলো সবাই।

জিনার কথা শেষ হলে কিশোর বললো, 'তোমাকে দেখেনি, বেঁচে গেছো। আবার আসতে পারে এই দ্বীপে। সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।'

'শেরিফকে জানানো দরকার,' পরামর্শ দিলো রবিন। 'পারলে এখুনি।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'তাতে কি হবে? কি বলবো গিয়ে ওদের? শুধু ডাকনাম দুটো জানি। কোত্থেকে এসেছে ওরা, কোথায় গেছে, কার বাড়িতে চুরি করবে, কিছুই জানি না। শেরিফ বিশ্বাস করবে না। ভাববে, গপ্পো বানিয়ে গিয়ে বলেছি।'

'তাহলে কি?' মুসা বললো। 'হ্যারি আংকেলকে বলবো?'

'তাতেও কোনো লাভ হবে না,' জিনা বললো। 'বাবার এক কান দিয়ে ঢুকবে, আরেক কান দিয়ে বেরোবে। পাত্তাই দেবে না। চোর তো আর বিজ্ঞান নয়।'

ঘড়ি দেখলো মুসা। 'মরুকগে। ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন এসো, পেটপূজাটা সেরে ফেলি।'

আগুনের ধারে বসেই খাওয়া শেষ করলো ওরা।

আবার শুরু হলো চোরের আলোচনা।

'পুরো ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক,' মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা, কিংবা ঘুরিয়ে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। 'কি কি জানি আমরা? দু'জন লোক, কিউট আর উহল নাম, জুলাইয়ের তিরিশ তারিখে কোনো এক মহিলার বাড়িতে চুরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদেরকে সাহায্য করবে তৃতীয় আরেকজন, ওর নাম বেন। মূল ব্যাপারটা তো এই, জিনা?'

'হ্যাঁ। অলংকার কিংবা রত্ন চুরি করবে ওরা। কোনো একটা ম্যানর হাউসে।'

'এসব আমরা আলোচনা করছি কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'ওই চুরি ঠেকাতে যাচ্ছি নাকি?'

'নিশ্চয়ই। একটা অপরাধ ঘটতে যাচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকবো?'

চোরেরা কোথায় বসে কথা বলেছে দেখতে চললো ওরা, অবশ্যই কিশোরের পরামর্শে। নেমে এলো সৈকতে, যেখানে নৌকা ভেড়ানো হয়েছিলো। টর্চের আলোয় সূত্র খুঁজলো গোয়েন্দারা। কিছু পেলো না।

মাটিতে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে রাফিয়ান। কড়া গন্ধ লেগে আছে মাটিতে, পাথরে। এই গন্ধই পেয়েছিলো তখন।

'ভালোই হয়েছে,' জিনা বললো। 'ব্যাটাদের গন্ধ চিনে রাখছে রাফি। পরে কাজে লাগবে।'

ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা। আবার আগুনের ধারে বসলো।

'প্রথমে,' কিশোর বললো। 'রহস্যময় ওই ম্যানরের মহিলাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন তুললো জিনা। 'এদিকে ম্যানরের অভাব নেই। আশপাশের গাঁয়ে অনেক পুরনো বাড়ি আছে, যেগুলো ম্যানর নয়, কিন্তু ম্যানর বলে ডাকা হয়।'

'হ্যা,' জিনার কথার পিঠে বললো রবিন। 'শুধু বাড়িই না। বড় বড় ফার্মহাউস-কেও ম্যানর বলে অনেক অঞ্চলের লোকে। কাজেই, ওই "ম্যানর" খুঁজে বের করা কঠিন কাজ।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'এক কাজ করতে পারি। ছোট আর মাঝারি বাড়ি, এমনকি সাগর পাড়ের কটেজগুলোকেও তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। তাহলে কাজ কিছুটা সহজ হয়ে আসবে।'

'ঠিক বলেছো,' একমত হলো রবিন। 'আমরা শুধু খুঁজবো বড় বাড়িগুলোতে। এমন বাড়ি, যাতে শুধু একজন বৃদ্ধা মহিলা বাস করেন। তাঁর কাছে গিয়ে খোঁজ নেবো, পারিবারিক সূত্রে কোনো মূল্যবান জিনিস পেয়েছেন কিনা…'

'আর যদি বলেন পেয়েছেন,' রবিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো মুসা। 'তাহলে জিজ্ঞেস করবো, সেটা পান্না বসানো গহনা কিনা। যদি বুঝি, ওই মহিলাই কিউট আর উহলের শিকার, তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেবো। তিনি তখন শেরিফকে জানাবেন।'

'আর শেরিফের লোক গিয়ে ওত পেতে বসে থাকবে,' জিনা বললো। 'চোরেরা যেই আসবে, হাতেনাতে পাকড়াও করবে।'

একটা ঘাসের ডগা দাঁত দিয়ে কাটছে কিশোর, সঙ্গীদের কথায় কান আছে কিনা বোঝা গেল না। অবশেষে জোরে এক নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ভাবছি, তৃতীয় লোকটা কে? যার নাম বেন? এই রহস্যের আরেকটা রহস্য সে। জুলাইয়ের তিরিশ তারিখে দুই চোরকে কিভাবে সাহায্য করবে?…থাক। পরে ভাবা যাবে, সময় আছে,' হাই তুললো সে। 'চলো, ঘুমোতে যাই।'

তিন

পরদিন বেলা করে ঘুম ভাঙলো ওদের।

ঝর্না থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে নাস্তা খেতে বসলো।

'আর কিছু ভেবেছো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'কী?…ও, চোর। নিশ্চয়। খেয়েই বেরিয়ে পড়বো। উপকূলে গিয়ে খুঁজতে শুরু করবো। নির্জন, নিরালা জায়গাগুলোর দিকেই নজর দেবো আমরা। কারণ ওরা বলেছে, নিরালা জায়গায় থাকেন মহিলা।'

চুপ করে আছে সবাই। গোয়েন্দাপ্রধানের কথা শেষ হয়নি।

'সময় খুব বেশি নেই আমাদের হাতে,' আবার বললো কিশোর। 'দুই হপ্তা। এর মাঝে খুঁজে বের করতে হবে ম্যানরটা।'

খাওয়া শেষ করে, কাপ–প্লেটগুলো ধুয়ে গুছিয়ে রেখে রওনা হলো ওরা। সরু পথ বেয়ে নেমে চললো ছোট্ট বন্দরের দিকে, যেখানে নৌকা রাখে জিনা। ছোট একটা খাঁড়ি, তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা, ওপরে ছাত। ঝড়ো বাতাস ঢোকে না ওখানে, ঢেউও ঢুকতে পারে না, ফলে নিরাপদে থাকে নৌকা। চমৎকার বন্দর।

'ভাগ্যিস ব্যাটারা এদিকে আসেনি,' বললো জিনা। 'ওধারে নেমেছে। নইলে জেনে যেতো, দ্বীপটা নির্জন নয়।'

নৌকা বের করলো জিনা। চড়ে বসলো সবাই। গোবেল বীচের দিকে চললো।

গোবেল ভিলার কাছে ঘাটে নৌকা বেঁধে তীরে উঠলো সবাই। গ্যারেজে রয়েছে জিনার সাইকেল, সেটা বের করে আনলো। একটা সাইকেলের দোকান থেকে আরও তিনটে সাইকেল ভাড়া করলো।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে ওই এলাকার বড় একটা ম্যাপ কিনলো কিশোর।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় বসে ম্যাপটা বিছালো। 'দেখো,' এক জায়গায় আঙুল রাখলো। 'আমরা রয়েছি এখানে। এই হলোগে উপকূলরেখা। এটা গোবেল বীচ গ্রাম, এগুলো বাড়িঘর, এগুলো হলিডে কটেজ। তারমানে এসব জায়গায় দেখবো না আমরা। আরও দক্ষিণে, এই যে এখানে আছে কতগুলো সী–সাইড রিসোর্ট। এগুলোও বাদ। উপকূল বরাবর নিরালা এলাকা এই যে একটাই দেখা যাচ্ছে, ডেভিলস পয়েন্ট। বাহ্, নামও রেখেছে একখান, শয়তানের এলাকা! ওখানে থাকলে থাকতে পারে।'

সবাই ঝুঁকেছে ম্যাপের ওপর, বেশি ঝুঁকলো রবিন। 'উত্তর দিকটাতেই আশা করা যাচ্ছে। এই দেখো, বাড়িঘর বিশেষ নেই।'

'হ্যাঁ,' তীর বরাবর আঙুল চালালো কিশোর। 'তারপর থেকে বসতি পাতলা, মাঠ আর বনই বেশি। চলে গেছে একেবারে স্টর্ম পয়েন্ট পর্যন্ত,' আনমনে বিড়বিড় করলো। 'স্টর্ম পয়েন্ট, অর্থাৎ ঝড়ের এলাকা। শয়তান, ঝড়, কেমন যেন অপরাধ অপরাধ গন্ধ। তবে ঝড়ের এলাকা এখান থেকে অনেক দূর। ওদিকে হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

কেঁপে উঠলো জিনা। 'ওরকম একটা জায়গায় একা একজন মহিলা থাকেন কি করে? শিকার ভালোই বেছেছে ব্যাটারা।'

'ঠিকই বলেছো,' মুসা মাথা দোলালো। 'আমার তো ম্যাপে দেখেই গা ছমছম করছে।'

'তোমার তো শুধু শুধুই ছমছম করে,' ম্যাপটা গোটাতে গোটাতে বললো কিশোর। 'তা কোন জায়গা থেকে শুরু করছি আমরা?'

'ডেভিলস পয়েন্ট?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো রবিন।

'ঠিক আছে।'

'খাবার–দাবার সব রেডি আছে তো?' মুসা বললো। 'জিনা, ওদিকে বোধহয় একটা ফার্ম পড়বে, ম্যাপে দেখলাম। কিছু ডিম কিনে নেয়া যাবে, না–কি বলো?'

সাইকেল চালিয়ে চললো চারজনে। পাশে পাশে দৌড়ে চললো রাফিয়ান। এরকম চলার অভ্যাস আছে তার, কোনো অসুবিধে হলো না। মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে ডানে–বাঁয়ে সরে কোনো নিঃসঙ্গ মুরগীকে তাড়া করে, কিংবা খরগোশ ধরতে যায়। মুরগীর সঙ্গেও পারে না, খরগোশের সঙ্গে তো নয়ই। তার চেয়ে অনেক চালাক ওগুলো। দৌড়ে পালায়।

পথেই পড়লো গোবেল বীচ বাজার। সকালে সোনালি রোদে চমৎকার লাগছে গাঁয়ের বাজারটা। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। ফার্ম পর্যন্ত আর যেতে হলো না মুসাকে। বাজারেই ডিম পাওয়া গেল।

মাংস কাটছে এক কসাই। জিনা আর রাফিয়ানকে ভালো মতোই চেনে। দেখে হাত নাড়লো।

জিনাও হাত নেড়ে তার জবাব দিলো।

ডেভিলস পয়েন্টে চলে এলো ওরা। ছড়ানো মাঠ, মাঝে মাঝে জলাভূমি, বন আর ঝোপঝাড় তেমন একটা নেই। কেমন যেন বিষণ্ণ পরিবেশ।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'শয়তানের ভয়ে গাছও জন্মায় না নাকি? বিচ্ছিরি জায়গা।'

'হ্যাঁ,' বললো জিনা। 'এই দিনের বেলায়ই এমন লাগে। রাতে তো…উপযুক্ত নামই হয়েছে।'

আরও কিছু দূর এগোলো ওরা।

একটা পুরনো বাড়ি দেখা গেল। দুর্গমতো।

'নিশ্চয় ওটা বারমোডেল ম্যানর,' জিনা বললো। 'নাম শুনেছি।'

'কি বললে?' ফিরে তাকালো কিশোর। 'ম্যানর!'

'হ্যাঁ। আর ওটাতে থাকেও এক মহিলা, একলা। না না, অতো আশা করো না। ওই মহিলা খুব গরিব, টাকাপয়সা নেই। একা থাকে। সন্ন্যাসী। ওর পেছনে লাগতে যাবে না চোরেরা।'

'তবু এসেছি যখন, কাছ থেকে একবার দেখা দরকার,' সাইকেল ঘোরালো কিশোর।

ছড়ানো প্রান্তরের মাঝে ছোট একটা টিলামতো জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। বিশাল, বর্গাকার, কালচে রঙ।

'অনেক আগে নাকি ওখানে একটা গ্রাম ছিলো,' জানালো জিনা। 'বারমোডেল

ম্যানর ছিলো গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে। কি জানি কি কারণে, আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করলো ওখানকার লোকে, হয়তো কাজকর্মের অভাবে। একে একে চলে গেল সবাই, বাড়িগুলো সব নষ্ট হয়ে মিশে গেল মাটির সাথে, টিকে রইলো শুধু ম্যানরটা। এসব অবশ্য শোনা কথা।'

'তোমার জানামতে আর কোনো বাড়ি আছে এখানে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'ওরকম?'

'জানি না।'

সারাটা 'শয়তানের এলাকা' চষে ফেললো ওরা। কিন্তু আর কোনো বাড়িই দেখলো না, ওই ম্যানরটা ছাড়া।

'চলো, গোবেল বীচে ফিরে যাই,' জিনা বললো। 'ফগকে মনে আছে তোমাদের? সেই যে, জেলের ছেলে, যার কাছে রাফিয়ানকে রাখতাম…'

মনে আছে, জানালো তিন গোয়েন্দা।

'চলো, তার কাছে যাই। সে এদিকের অনেক খবর রাখে। হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে গোবেল বীচে ফিরে এলো ওরা। গোবেল বে-তে চললো। ফগকে ওখানেই পাওয়া গেল। নৌকায় রঙ লাগাতে ব্যস্ত, শিস দিচ্ছে আপনমনে।

ছেলেদের দেখে চোখ কপালে তুললো ফগ। 'আরি, তিন গোয়েন্দা না! অনেকদিন পর। তা ভাই, কেমন আছেন?' হাত বাড়িয়ে দিলো সে। জিনাকে বললো, 'আপনিও অনেকদিন পর বাড়ি এলেন।'

মুসা বললো, 'দেখো ফগ, আমাদেরকে আপনি আপনি করার দরকার নেই। তুমি করে বলবে, আর নাম ধরে ডাকবে। ঠিক আছে?'

হেসে মাথা কাত করলো ফগ। 'তারপর কি মনে করে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

এমনি এসেছে, বেড়াতে, এরকম একটা ভাব দেখিয়ে কয়েক মিনিট সাধারণ কথাবার্তা বললো কিশোর, তারপর কায়দা করে তুললো ম্যানরের প্রসঙ্গ। কয়েকটা প্রশ্ন করলো।

'বারমোডেলের ব্যাপারে কৌতূহল!' ভুরু কোঁচকালো ফগ। 'বেচারি! কি আর বলবো ওর সম্পর্কে, বলার আছেই বা কি? সব হারিয়েছে মহিলা—স্বামী, ছেলেমেয়ে, ধনদৌলত—এখন একা পড়ে থাকে ওই ম্যানরে। লোকে বলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এখানে খুব কম আসে, মাঝেসাঝে, বাজার করতে। কি করে যে চালিয়ে নিচ্ছে, বুঝতে পারি না। বাসে করে আসে, কারো দিকে চায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না। যা যা দরকার কিনে নিয়ে চলে যায়। লোকে তার জন্যে দুঃখ করে, সাহায্য করতে চায়, কিন্তু মহিলা এড়িয়ে চলে বলে কেউ কিছু করতে পারে না।'

'দেখা করাই মুশকিল হবে তাহলে!' বিড়বিড় করলো কিশোর।

'কি বললে?'

'না, কিছু না…হ্যাঁ, ফগ, তোমার মাছ ধরা কেমন চলছে?' আবার অন্য আলাপ শুরু করলো কিশোর।

কিছুক্ষণ পর ফগের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো গোবেল ভিলায়। মেরামত শেষ হয়নি। তবে রান্নাঘরটা ঠিক হয়ে গেছে। পেট ভরে খাওয়ালেন ওদেরকে জিনার মা। তারপর নিজের কাজে গেলেন।

ছেলেরাও বেরিয়ে পড়লো আবার। এবার চললো উত্তরে।

'একদিনে পুরো এলাকা দেখা সম্ভব না,' প্যাডাল ঘোরাতে ঘোরাতে বললো কিশোর। 'আর এলোমেলো ভাবে খুঁজলে হবে না। ধৈর্য হারানোও চলবে না।'

দক্ষিণের উপকূলের গ্রামগুলোর মতো নয় উত্তরাঞ্চল, অন্য রকম। জলাভূমির চেয়ে পাথুরে জায়গাই বেশি। মাঝে মাঝে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়, একই রকম ভাবে নেমেছে ওপাশে সাগরের পানিতে। সৈকত নেই, নৌকা রাখার জায়গা নেই, লোকে স্নান করতে আসে না। দেখারও তেমন কিছু নেই। ফলে লোকজন এই এলাকায়ও কম। মাত্র কয়েকটা ঘরবাড়ি চোখে পড়লো।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল ওরা। রবিন আর কিশোর গেল একদিকে খুঁজতে, জিনা, মুসা, রাফিয়ান আরেক দিকে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলো। অযথা। কোনো লাভ হলো না। পাওয়া গেল ছোট ছোট কয়েকটা ফার্মহাউস, আর জেলেদের কুঁড়ে।

শেষ বিকেলে আবার একসাথে হলো পাঁচজনে। ক্লান্ত। জিনা বললো, 'যথেষ্ট হয়েছে! আজ আর পারবো না। চলো, দ্বীপে।'

তা-ই করা হলো।

'কাল,' সেরাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বললো কিশোর। 'আগামীকাল আবার খুঁজতে যাবো। দেখি, ম্যানরটা পাওয়া যায় কিনা।'

চার

পরদিন সকালে মূল ভূখণ্ডে এসে আবার উত্তরে রওনা হলো ছেলেরা। আগের দিন যেখানে দু'ভাগ হয়েছিলো, সেখান থেকে আরও খানিকটা ডানে সরে দু'ভাগ হলো। খুঁজতে চললো দুই দিকে।

দুপুরে একটা বিশেষ জায়গায় লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে মিলিত হলো।* বেশ খোশমেজাজেই আছে সবাই।

প্রথমে জিনা জানালো তাদের খবর, 'পেয়েছি! মুসা আর আমি জেনে গেছি, কিউট আর উহলের শিকার কে।'

'এতো শিওর হয়ে বলতে পারবো না,' কিশোর বললো। 'তবে আমরাও একটা খোঁজ পেয়েছি। একজন মহিলা একা থাকেন। হয়তো তিনিই সেই মহিলা, যাঁকে আমরা খুঁজছি।'

যা যা জেনেছে, একদল আরেক দলকে জানালো ওরা।

জিনা আর মুসা বড় একটা বাড়ি দেখতে পেয়েছে, গাছপালায় ঘেরা।

'একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম,' মুসা বললো। 'ওই বাড়িতে এক মহিলা থাকেন। তাঁর নাম মিসেস কুইল। বাড়িটার নাম ম্যানারস হাউস। জিনা আর আমার ধারণা, ম্যানারসকেই ম্যানর হাউস বলেছে চোরেরা। উচ্চারণের কারণে ম্যানর শোনা গেছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো জিনা। 'দূর থেকে শুনেছি। আর বাতাসও উল্টোপাল্টা বইছিলো।'

জিনা থামতেই মুসা বললো, 'আর, ওই মিসেস কুইল নাকি ধনী। দামী গহনা কিংবা পাথর-টাতর তাঁর কাছে থাকতেই পারে।'

এরপর কিশোরের বলার পালা। 'আমরা কোনো বড় বাড়ি-টাড়ি পাইনি, পেয়েছি একটা ফার্মহাউস। নাম ম্যানর ফার্ম। বেশ বড় ফার্ম। গাঁয়ের পোস্টম্যানের সঙ্গে লাকিলি দেখা হয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ফার্মটার মালিক এক মহিলা। নাম মিসেস জিনজার। মহিলা এমনিতে ভালো, তবে মাথায় নাকি কিছুটা ছিট আছে। ফার্মে কাজ করার জন্যে লোক লাগেই। অনেক থাকার জায়গা আছে ফার্মটাতে, রেখে দিলেই পারে। তা না করে অফিসের মতো নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। নিয়মিত যার যার বাড়ি থেকে আসে মজুরেরা, সকালে, কাজ শেষে বিকেলে আবার চলে যায়। এতোবড় ফার্মের মালিক যখন, তাঁর কাছেও যথেষ্ট সোনাদানা অলংকার থাকতে পারে।'

'মজুর রাখার ওই নিয়মটা আমার কাছে বেশ অবাকই লেগেছে,' রবিন বললো।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটলো কিশোর। তিন আঙুল তুললো, 'তারমানে, তিনজনকে পাওয়া গেল, যাঁরা একা নির্জন বাড়িতে বাস করেন। মাত্র তদন্ত শুরু করেছি আমরা, এর মাঝেই তিনজনকে পেয়ে গেলাম। প্রথমে যা ভেবেছিলাম, তা নয়। কাজটা এখন বেশ জটিলই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে সঙ্গে করে আনা খাবার নীরবে খেয়ে চললো ওরা। তারপর উঠে দু'ভাগ হয়ে আবার রওনা হলো। আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজবে।

পর পর আরও তিনদিন খুঁজলো ওরা। পুরো এলাকা চষে ফেললো। দূরে যেতে

যেতে একেবারে স্টর্ম পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়ে খুঁজে এলো। কিন্তু আর কোনো 'ম্যানর' পেলো না, যেখানে একজন মহিলা একা বাস করেন। শুধু সেই তিনটেই, প্রথম যেগুলো পেয়েছিলো।

সেদিন বিকেলে, দ্বীপে, আগুনের ধারে বসে ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনা চালালো ওরা।

'খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজছি আমরা,' বললো কিশোর। 'তবে আশাটা এখন জোরালো হয়েছে। মাত্র তিনটে বাড়িতে সীমিত হয়েছে সন্দেহ। বারমোড্রেল ম্যানরের মিসেস বারমোডেল, ম্যানারস হাউসের মিসেস কুইল, আর ম্যানর ফার্মের মিসেস জিনজার।'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লো রবিন। 'এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, ওই তিনজনের মাঝে কোন্ জন। কার কাছে পান্নার অলংকার রয়েছে, আর কার ওপর চোখ পড়েছে চোরের।'

'মিসেস বারমোডেলকে বাদ দিয়ে দেয়া যায়, তাই না?' মুসা বললো। 'বেচারি যে-রকম গরিব, এতো দামী রত্ন পাবে কোথায়?'

'বলা যায় না,' হাত নাড়লো কিশোর। 'অনেক বড়লোক আছে, গরিবের ভান করে থাকে। থাকলেও বলে কিছু নেই, কিছু নেই। এই মিছে কথাটা কেন বলে, ওরাই জানে। হয়তো চোর-ডাকাতের ভয়। টাকা আছে শুনলে যদি এসে হামলা চালায়।'

'ঠিক,' একমত হলো জিনা। 'মিসেস বারমোডেলকে আমাদের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

সুতরাং পরদিন আবার ডেভিলস পয়েন্টে রওনা হলো ওরা।

যাওয়ার পথে এক জায়গায় একটা সুন্দর কটেজের সামনে এক ফুল বিক্রেতাকে দেখে থেমে গেল রবিন। অনেকেই ভিড় করে ফুল কিনছে। 'এই,' বললো সে। 'একটু দাঁড়াও। কয়েকটা গোলাপ কিনে নিয়ে আসি। কেরি আন্টি অনেক আদর করেন আমাদের, তাঁকে কিছু একটা উপহার দিতে ইচ্ছে করে আমার। একতোড়া ফুলই দেবো আজ। দ্বীপে ফেরার পথে দিয়ে যাবো।'

সাইকেল, আর অন্যদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে এগোলো রবিন। রাস্তা পেরোতে গিয়েই থমকে গেল। দুর্বল এক বৃদ্ধা হতচকিত হয়ে গেছেন রাস্তায়। তীব্র গতিতে একটা মোটর সাইকেল ছুটে আসছে। সামনে যাবেন না পেছনে যাবেন, ঠিক করতে পারছেন না মহিলা। মোটর সাইকেলটা তাঁর গায়ের ওপর এসে পড়লো বলে। লাফ দিয়ে এগোলো রবিন। মহিলার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাঁকে সরিয়ে নিলো পথ থেকে। ঠিক ওই মুহূর্তে শাঁ করে ছুটে চলে গেল মোটর সাইকেলটা।

থরথর করে কাঁপছেন মহিলা। কোনোমতে কাঁপা কণ্ঠে রবিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঢুকে গেলেন ভিড়ের ভেতরে।

ফুল কিনে ফিরে এলো রবিন।

আবার এগিয়ে চললো ওরা। গাঁয়ের পথে যানবাহনের ভিড় প্রায় নেইই। একটা বাস ওদের পাশ কাটালো, পেছনে উড়িয়ে রেখে গেল ধুলোর মেঘ।

'উহ্, শয়তানের বাচ্চা!' নাক কুঁচকালো জিনা। এই বাসগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। 'মরে না কেন হারামজাদারা!'

হেসে উঠলো কিশোর। 'তোমার নিজের বাহন আছে বলে গালমন্দ করছো। কিন্তু যাদের নেই? ওই বাস না থাকলে তাদের অবস্থাটা কি হতো ভাবো একবার।'

আরও মিনিট পনেরো পরে, বারমোডেল ম্যানরের সামনে সাইকেল থেকে নামলো ওরা। আগে আগে গিয়ে মস্ত দরজার সামনে দাঁড়ালো। পুরনো আমলের ঘন্টা বাজানোর মরচে ধরা শেকলটা ধরে টান দিলো। ভেতরে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো ঘন্টার আওয়াজ। সাড়া নেই।

'কি ব্যাপার, নেই নাকি কেউ?' দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে মুসা। 'ভূতটুত…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজার পাল্লায় লাগানো ছোট একটা ফোকরের ঢাকনা সরে গেল। শোনা গেল এক বৃদ্ধার কণ্ঠ, 'কি চাই?'

'মিসেস বারমোডেলের সঙ্গে কথা বলতে চাই, ম্যাডাম,' কোমল গলায় বললো কিশোর। 'জরুরী কথা আছে।'

'আমি কারও সাথে দেখা করি না,' জবাব এলো।

'প্লীজ, ম্যাডাম! আপনার ভালোর জন্যেই…'

'চলে যাও।'

বন্ধ হয়ে গেল ফোকরের ঢাকনা। নীরবে একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেমেয়েরা।

'চলে যাও!' বৃদ্ধার কণ্ঠ নকল করে মুখ ভেঙচালো মুসা। 'মানুষের উপকার করতে আসার এটাই পুরস্কার।'

হঠাৎ আবার খুলে গেল ঢাকনা। 'এই ছেলে,' ডাকলেন মহিলা। 'এই তোমাকে বলছি, সব চেয়ে ছোট ছেলেটি। তুমিই, না? …এতোই চমকে গিয়েছিলাম, ঠিকমতো ধন্যবাদও জানাতে পারিনি। এসো এসো, ভেতরে এসো।'

মহিলার কণ্ঠের এই হঠাৎ পরিবর্তনে এতোই অবাক হয়েছে গোয়েন্দারা, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস বারমোডেল।

চিনতে এতটুকু অসুবিধে হলো না রবিনের। এই মহিলাকেই তখন বাঁচিয়েছিলো মোটর সাইকেলওয়ালার কবল থেকে। মনে মনে 'ফুলকে' ধন্যবাদ দিলো সে। ফুল কেনার কথা মনে হওয়াতেই না ওই কাকতালীয় ব্যাপারটা ঘটে গেল, আর তাইতেই এখন বারমোডেল ম্যানরে ঢোকার সুযোগ পেলো। নাহলে দোরগোড়া থেকেই বিদেয়

হতে হতো।

বিশাল এক বসার ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। কেমন যেন বিষণ্ন পরিবেশ, তবে অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করছে এখন জিনিসপত্রগুলো।

আসার কারণ জানতে চাইলেন মহিলা।

কোনো রকম ভূমিকা না করে সব বলে গেল কিশোর।

চুপ করে শুনলেন মিসেস বারমোডেল। তারপর ওদেরকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, দামী জিনিস আছে আমার কাছে। পারিবারিক সূত্রে পেয়েছি। তা তোমরা বলছো, চোরেরা চুরি করতে চায়? চাইবেই তো। ওহ্, কি বোকা আমি! এমন জিনিস এরকম নিরালা বাড়িতে রেখেছি। এখন বুঝতে পারছি, সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'এতো তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে, ম্যাডাম,' বললো কিশোর। 'এ-মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে। তার আগে চেষ্টা করবে না চোরেরা। পুলিশকে জানানোর সময় পাবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। বুড়ো হয়েছি তো, মাথায় আর সহজে ঢোকে না কিছু এখন। জীবনে অনেক কিছুই তো হারালাম, এখন শুধু স্মৃতি নিয়েই পড়ে আছি…এই যা, শুরু করলাম বকবক। তোমার পরামর্শ মতোই কাজ করবো আমি, বাবা। তো, এখন কি জিনিসটা দেখতে চাও?'

এতো সহজে চোরদের 'শিকারকে' পেয়ে গিয়ে এমনিতেই খুব খুশি ছেলেরা, তার ওপর এই আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

বড় বড় অনেকগুলো ঘর ওদেরকে পার করিয়ে আনলেন মিসেস বারমোডেল। তারপর শুরু হলো করিডর, যেন সীমাহীন। শেষ হলো অবশেষে। একটা ঘরে ঢুকলো। দেয়ালে কোনোরকম অলংকরণ নেই, আসবাবও নেই। অবাক হয়ে দেখছে ওরা। কোথায় রাখা হয়েছে রত্নগুলো?

ছেলেদের হাবভাব দেখে হাসলেন মহিলা। 'বুঝেছি, অবাক হয়েছো। তবে একেবারে খোলা জায়গায় তো আর রাখতে পারি না এরকম দামী জিনিস। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

পুরনো ধরনের একটা ম্যানটলপীস, তাতে ফুল আর লতাপাতা খোদাই করা। ফুলের একটা কুঁড়িতে চাপ দিলেন মিসেস বারমোডেল। ম্যানটলপীসের একটা অংশ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো একটা গুপ্তদরজা। 'এসো, আমার গুপ্তধন দেখে যাও।'

মহিলার পেছনে একে একে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। রাফিয়ানকে বাইরে বসে থাকতে বলে সব শেষে ঢুকলো জিনা।

একটা পুরনো হ্যারিকেন ধরালেন মহিলা। আলো তুলে দেখালেন একটা হাতে আঁকা ছবি, তাঁর এক পূর্বপুরুষের।

গর্ব করে বললেন মহিলা, 'এই যে আমার ঐশ্বর্য। স্যার ওয়েসলি থারগুড

বারমোডেল। এই পেইন্টিংটা আমার অমূল্য সম্পদ। আমার কাছে এর চেয়ে দামী আর কিছুই নেই পৃথিবীতে।'

ছবিটা দেখার মতোই, তবে দমে গেল ছেলেরা। ভুল বুঝেছেন মহিলা। তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনায় খুলে বলেনি কিশোর, চোরেরা রত্নের পেছনে লেগেছে—পান্না, কিংবা পান্নাখচিত অলংকার, ছবি নয়। মহিলাও বলেছেন 'দামী জিনিস' এবং 'পারিবারিক সূত্রে পেয়েছেন'। দুই পক্ষেরই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

প্রচণ্ড হাসি পেলো মুসার, জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে থামালো।

রবিন বোকা হয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলো ছবিটার দিকে।

জিনার মুখ কালো হয়ে গেল।

শুধু কিশোরের চেহারায় পরিবর্তন নেই। গোয়েন্দাগিরিতে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে, নিরাশ হতে পারে বার বার, কিন্তু ধৈর্য হারানো চলবে না। শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে বললো মহিলাকে, ছবির কথা বলেনি চোরেরা। কিসের কথা বলেছে, সেটা ভেঙে বললো এবার।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস বারমোডেল। বার বার বললেন, ওদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বলে দিলেন, সময় পেলে আবার যেন এসে দেখা করে ওরা, তিনি খুব খুশি হবেন।

'খামোকা সময় নষ্ট,' বাইরে বেরিয়েই বলে উঠলো মুসা। 'কোনো লাভ হলো না।'

'হয়েছে,' বললো কিশোর। 'শিওর হয়ে গেলাম, মিসেস বারমোডেল চোরদের শিকার নন। এখন বাকি দু'জায়গায় খোঁজ নিতে হবে।'

পাঁচ

এরপর ম্যানারস হাউসে মিসেস কুইলের সঙ্গে দেখা করতে গেল ওরা।

বিরাট বাড়ি, বিশাল তার সিংহ দরজা। লোহার মোটা শিকের পাল্লা। সাইকেল থেকে নেমে গেটের পাশের বেলপুশ টিপলো কিশোর।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বাড়ির সদর দরজা। লম্বা এক মহিলা দেখা দিলেন, স্বাস্থ্য দেখে মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম করেন। এগিয়ে এলেন ছেলেদের দিকে।

'কি চাও?' ওই এক কথায়ই বোঝা গেল, মহিলা বদমেজাজী।

'গুড আফটারনুন,' খুব বিনয়ের সঙ্গে বললো কিশোর। 'মিসেস কুইল আছেন?'

'আমিই মিসেস কুইল।'

'ও। আপনার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরী। ভেতরে আসতে

পারি?'

সন্দেহ দেখা দিলো মহিলার চোখে। 'অপরিচিত কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিই না আমি। ছেলেমানুষ হলেও না।'

দ্রুত নিজের আর তিন সঙ্গীর নাম বললো কিশোর। 'সাবধান থাকা ভালো, মিসেস কুইল,' মোলায়েম হাসি হাসলো সে। 'মানে একা থাকেন তো···'

'একা থাকি কিভাবে জানলে?'

'খোঁজ নিয়ে জেনেছি,' বলেই বুঝলো মুসা, বোকামি করে ফেলেছে।

'ও, খোঁজ-খবরও নাও তাহলে! খোঁজ নিয়ে জেনেছো, আমি একা থাকি, তারপর এসেছো ভেতরে ঢুকতে? সাহস তো কম নয়। তারপর সাথে নিয়ে এসেছো বাঘের মতো এক কুত্তা। ঢুকেই যে ওটা আমাকে কামড়াবে না, কি বিশ্বাস আছে?'

'রাফিয়ান খুবই ভদ্র, ম্যাডাম,' কুকুরটার মাথায় হাত রাখলো জিনা। 'ওকে খালি একটু আদর করবেন, আপনার জন্যে জান দিয়ে দেবে।'

'জান দিয়ে দেবে, না নিয়ে নেবে!'

'ওভাবে কথা বলছেন কেন আপনি?' নিমেষে কালো হয়ে গেল জিনার হাসি মুখটা। 'এমন ভাব দেখাচ্ছেন···'

জিনাকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো রবিন, 'আসলে আপনাকে হুঁশিয়ার করতে এসেছি, ম্যাডাম। একদল চোর···'

'চোরের দলে তোমরাও যে নেই, কি করে জানছি? নাকি ইয়ার্কি মারতে এসেছো আমার সঙ্গে? যাও, ভাগো!'

গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর, 'মিসেস কুইল, ভুল করছেন আপনি। আমরা চোরও নই, ইয়ার্কি মারতেও আসিনি। আপনার ভালোর জন্যেই এসেছি। ঢুকতে না দেন, তো বেশ, বাইরে থেকেই বলি···'

'তোমাদের কথা শোনারই ইচ্ছে নেই আমার। এতো সময় নেই। যেতে পারো।'

আরও কিছুক্ষণ নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো ওরা, শুনতেই চাইলেন না মিসেস কুইল। ছেলেদের মনে হলো, মহিলার নয়, তাদের নিজেদের সময়ই অযথা নষ্ট করছে।

'এই মুহূর্তে যদি এখান থেকে না যাও,' ভীষণ চটে গিয়ে বললেন মিসেস কুইল। 'কুত্তা লেলিয়ে দেবো! তোমাদেরটার চেয়ে কম বড় না ওটা। আর আমি একা নই আজ, বুঝেছো, আমার বোনপো এসেছে। ওরই কুকুর।'

এই সময় সিঁড়ির মাথায় দেখা দিলো এক তরুণ। গায়ে গেঞ্জি। মস্ত এক অ্যালসেশিয়ানের গলার চেন ধরে রেখেছে। 'কি হয়েছে, খালা?'

'না, কিছু না,' জবাব দিলেন খালা। 'ক'টা বজ্জাত ছেলেমেয়ে ঢুকতে এসেছে।

কে জানে চোরের দলের কিনা! কোথায় কি আছে সব জেনেশুনে গিয়ে বড় চোরদেরকে জানাবে হয়তো।'

কড়া প্রতিবাদ জানালো ছেলেমেয়েরা, এমনকি রাফিয়ানও।

'হউ! হউ!' করে রাফিকে ধমক দিলো অ্যালসেশিয়ানটা।

রাফিয়ানও গেল রেগে। সে কি কম যায়? দ্বিগুণ জোরে পাল্টা ধমক দিলো, 'হুফ! হুফ!' অর্থাৎ, বেরিয়ে আয় না ব্যাটা, দেখি কে কাকে কতো কামড়াতে পারে? মিসেস কুইলের পাশে এসে দাঁড়ালো অ্যালসেশিয়ান আর তার মনিব।

'গেট খুলে দাও, খালা,' কর্কশ কণ্ঠে বললো তরুণ। 'মজা দেখাচ্ছি ব্যাটাদের। হিপোর এক কামড় খেলেই পালানোর পথ পাবে না।'

দ্বিধা করছেন মহিলা। 'ওদেরটাও কিন্তু কম বড় না। তোর হিপোপটেমাস সত্যি পারবে তো, বব?'

'হিপোপটেমাস! কুত্তার নাম!' হো হো করে হেসে উঠলো মুসা। 'যেমন মনিব তার তেমনি কুত্তা। তা মিয়া, তোমার কি নাম? ছাগল? চেহারা-সুরতে ওরকমই তো লাগে।'

খালার অপেক্ষা আর করলো না বব। খুলে দিলো গেট। একটানে তার হাত থেকে শিকল ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো অ্যালসেশিয়ানটা। রাফিয়ানের দিকে না গিয়ে গেল জিনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

আর কি হুকুমের অপেক্ষা করে রাফিয়ান? রুখে দাঁড়ালো।

শুরু হয়ে গেল মরণপণ লড়াই। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। হিপোপটেমাসের হিপোর মতোই শরীর, বেশি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। আর জিনার সঙ্গে থেকে থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করে, অ্যাডভেঞ্চার করে রাফিয়ানের পেশীগুলো হয়ে উঠেছে ইস্পাত-কঠিন। অসাধারণ ক্ষিপ্র।

গায়ের জোরে অ্যালসেশিয়ানটার সঙ্গে পারবে না সে, যদি জেতে, ক্ষিপ্রতার কারণে জিতবে।

এতোক্ষণ কুকুর লেলিয়ে দেয়ার ভয় দেখালেও এখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন মিসেস কুইল। রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে যায়। চেঁচিয়ে ভাইপোকে আদেশ দিলেন, হিপোকে সরিয়ে আনার জন্যে।

ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে, বব চেঁচাচ্ছে, মিসেস কুইল আর কুকুরের চিৎকার, সব মিলে সে-এক এলাহি কাণ্ড!

বেশ কয়েকটা কামড় খেয়ে ঘাবড়ে গেল জলহস্তীর মতো মোটা অ্যালসেশিয়ান। গলার জোর কমে আসছে। পুরোপুরি পরাজিত হওয়ার আগেই ওটার গলার শিকল ধরে টেনে সরিয়ে নিলো বব। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললো, 'যাও, আজকের মতো ছেড়ে দিলাম। আর কোনো দিন…'

'ছাগলাটা বলে কি?' মুসা হেসে উঠলো। 'মার খেলো ওর···এই মিয়া, তোমার জলহস্তির তো আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে। এবার তোমার কিছু দরকার?'

মুসার ব্যায়ামপুষ্ট বাহু আর চওড়া কাঁধের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করলো বব, তারপর কুকুরটার শিকল ধরে টেনে নিয়ে ঢুকে গেল গেটের ভেতরে।

মিসেস কুইল গেট আটকে দিতে দিতে বললেন, 'তাহলে এবার বুঝলে তো? আজ আর বেশি কিছু বললাম না। আরেকদিন জ্বালাতে এলে বুঝবে মজা।'

আর কিছু বলা বৃথা। ইশারায় সঙ্গীদেরকে আসতে বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো কিশোর। সবাই পিছু নিলো তার। 'হুফ! হুফ!' করে হিপোকে গোটা দুই ধমক দিয়ে রাফিয়ানও খুশি মনে রওনা হলো।

বাড়িটা থেকে দূরে সরে এসে একটা পাথরের ওপর বসলো কিশোর। সবাই বসলো তার আশেপাশে। জিনা দেখতে লাগলো, রাফিয়ানের গায়ে কোনো জখম হয়েছে কিনা। কয়েকটা আঁচড় লেগেছে শুধু, গুরুতর কোনো জখম নেই।

রাগে কালো মুখ আরো কালো করে মুসা বললো, 'ওই মিসেস কুইলটা গাধার চেয়েও গাধা! বলে কিনা আমরা চোর! অথচ ওকেই সাবধান করতে গিয়েছিলাম!'

'এক কাজ করা যায়,' শান্তকণ্ঠে বললো রবিন। 'চিঠি লিখে তাঁকে সব জানাতে পারি। তখন নিশ্চয় হুঁশিয়ার হবেন।'

'এতো কি ঠেকা পড়েছে আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'আমাদের কি? চোর এসে সাফ করে দিয়ে যাক না ওর বাড়ি। তখন শিক্ষা হবে।'

'এতো বজ্জাত মেয়েলোক খুব কমই দেখেছি,' মুসার সুরে সুর মেলালো জিনা। 'আমার কি মনে হয় জানো, চোরগুলোকে মিসেস কুইলই জায়গা দিয়ে রেখেছে। চোরদের সর্দারনী। আমরা ঢুকলে দেখে ফেলবো তাই···'

'আরে না,' হেসে বললো কিশোর। 'ওসব তোমার অতিকল্পনা। রাগের মাথায় বলছো।'

'তাহলে অন্যকিছু আছে। বেআইনী।'

'আমার মনে হয় না।'

'তোমার কথাবার্তায় তো মনে হচ্ছে তদন্ত চালিয়ে যেতে চাও তুমি!' গোঁ গোঁ করে উঠলো মুসা। 'এতো কিছুর পরেও মহিলাকে সাহায্য করার ইচ্ছে?'

তার কথার জবাব না দিয়ে রবিনের দিকে ফিরলো কিশোর। 'চিঠি দেয়া যাবে না, বুঝেছো। লাভ হবে না। চিঠির জবাব দেবেন না মিসেস কুইল। তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হলো, জানতে পারবো না। হয় তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে হবে, নইলে অন্য উপায় বের করতে হবে।'

রাগ করে মুখ ফিরিয়ে রইলো মুসা।

জিনাও কিছু বললো না।

রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'উপায়টা কি?'

'সেটা ভেবেচিন্তে বের করা যাবে'খন।'

'তোমার মাথায় দোষ আছে,' রেগে গেল জিনা। 'ওই মিসেস কুইলটাই যতো শয়তানীর মূল, আমি শিওর। নিশ্চয় ওর বাড়িতে কিছু আছে। কেউ দেখে ফেললে অসুবিধে হবে। তাই এই কড়াকড়ি। কাউকে ঢুকতে দিতে চায় না,' চুপ করে রইলো এক মুহূর্ত। 'এই, এক কাজ করলে কেমন হয়? চুরি করে ওবাড়িতে ঢুকলে?'

'কুত্তা আছে। ঘেউ ঘেউ করে জাগিয়ে দেবে সবাইকে।'

মিসেস কুইল বললো, 'তার বোনপো আজ এসেছে। হয়তো সন্ধ্যায় চলে যাবে। কুত্তাটাকেও নিয়ে যাবে। তখন ঢুকতে পারি?'

'ওসব বাজে ভাবনা দূর করো তো মাথা থেকে,' হাত নাড়লো কিশোর। 'কোনো লাভ নেই। কিছুই লুকিয়ে রাখেননি মিসেস কুইল। চলো, উঠি।'

ফেরার পথে মিসেস পারকারকে ফুলের তোড়াটা উপহার দিলো রবিন। বিনিময়ে ছেলেদেরকে তিনি দিলেন মস্ত এক চকোলেট কেক।

দ্বীপে ফিরলো ওরা। সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছে, অনেক উত্তেজনা গেছে। খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লো সবাই।

ছয়

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছে তিন গোয়েন্দা, কিন্তু জিনার চোখে ঘুম নেই। উঠে বসলো। রাফিয়ানের গায়ে হাত রেখে তাকে আসার ইশারা করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে।

বুদ্ধিমান কুকুরটা বুঝলো, কোনো একটা অভিযানে যাচ্ছে ওরা। উত্তেজনায় চাপা গররর করে উঠলো।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে হুঁশিয়ার করলো জিনা। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো, 'কোনো শব্দ করবি না। একেবারে চুপ। আয়।'

নীরবে সঙ্গে চললো রাফিয়ান। সরু পথ ধরে নেমে এলো গোপন বন্দরে। অন্ধকারেই নৌকা বের করলো জিনা। কুকুরটাকে নিয়ে চড়ে বসলো তাতে।

একটুও শব্দ না করে পানিতে দাঁড় ফেললো জিনা। দক্ষ হাতে বেয়ে চললো। সাগর শান্ত। বাতাসও বেশ গরম। তরতর করে ছুটলো নৌকা। গলুইয়ের কাছে বসে জিভ বের করে পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাফিয়ান, রাতের এই অভিযান খুব ভালো লাগছে তার।

গোবেল ভিলার কাছে ঘাটে নৌকা বাঁধলো জিনা। চুপি চুপি গ্যারেজে ঢুকে তার

সাইকেলটা বের করলো। তারপর ছুটলো উত্তরমুখো। প্যাডাল ঘুরিয়ে চললো যতো জোরে সম্ভব। পাশে ছুটছে রাফিয়ান।

গোবেল বীচ গির্জার সময় সংকেত শোনা গেল ঢং ঢং করে, এগারোটা বেজেছে। নীরব রাতে সেই শব্দ বড় বেশি করে কানে বাজলো।

'গুড!' ভাবলো জিনা। 'বব নিশ্চয় এতোক্ষণে তার নিজের বাড়িতে ঘুমোচ্ছে। কুত্তাটাও নেই। আমার ঢোকা ঠেকায় কে?'

ম্যানারস হাউসের গেটের খানিক দূরে সাইকেল থেকে নামলো সে। সাইকেলটা ঝোপের আড়ালে রেখে রাফিয়ানকে বললো লুকিয়ে থাকতে। ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল কুকুরটা।

বিশাল গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো জিনা। বাড়ির কোনো ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে না। কাঠবেরালীর মতো তরতরিয়ে শিক বেয়ে উঠে বসলো পাল্লার ওপর। নামবে কি? দ্বিধা করছে এখন। ধমক দিলো নিজেকে, এতো কষ্ট করে তাহলে আসার কি দরকারটা ছিলো?

আবার বেয়ে নেমে পড়লো অন্যপাশে। ভেতর থেকে তালা লাগানো গেটে। পা বাড়ালো জিনা। দু'পা এগোতে না এগোতেই ঘটে গেল অঘটন। ঘাসের মধ্যে লুকানো একটা তারে পা দিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে বেজে উঠলো অ্যালার্ম বেল। খানখান করে দিলো নীরবতা, কাঁপিয়ে দিতে লাগলো যেন সমস্ত বাড়িটাকে।

লাফিয়ে সরে এলো জিনা। হতভম্ব হয়ে গেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

জ্বলে উঠলো আলো। উজ্জ্বল আলোর বন্যায় যেন ভেসে গেল পুরো বাগান আর বাড়ির সামনের চত্বর। সদর দরজা খুলে গেল। সিঁড়ির মাথায় উদয় হলেন মিসেস কুইল। পরনে পাজামা আর ড্রেসিং গাউন। হাতে একটা বেত, আগায় ধাতুর টুপি বসানো। 'কে?'

নিশিতে পেয়েছে যেন জিনাকে। ধীরে ধীরে আগে বাড়লো। 'আ–আমি, মিসেস কুইল···বিকেলে দেখা করতে এসেছিলাম···তখন তো ঢুকতে দেননি, ভাবলাম, ঢুকি। কোনোভাবে কথা বলি···'

'চুপ করো, মেয়ে! তখনই বুঝেছি, তোমরা খারাপ। এখন শিওর হলাম।'

'সত্যি বলছি, মিসেস কুইল,' মিনমিন করে বললো জিনা। 'আপনি ভুল করছেন। আপনার ভালো চাইছি আমরা। চোর নই···'

'রাতে চুরি করে লোকের বাড়িতে ঢোকো, চোর নও তো কি?'

'আমাকে বুঝিয়ে বলার সুযোগ দিন, প্লীজ,' অনুনয় করলো জিনা। 'বিশ্বাস করুন, আপনার ভালো চাইছি আমরা। তখন যদি শুনতেন···'

'কিচ্ছু শোনার দরকার নেই!' গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জিনার হাত

চেপে ধরলেন মিসেস কুইল। জিনার মনে হলো, হাত তো নয়, যেন লোহার সাঁড়াশি। জোরাজুরি করে লাভ হবে না, ছাড়াতে পারবে না। 'এসো, মেয়ে, পেটের কথা সব আদায় করবো। কোন্ দলে কাজ করো, সেটাও জানবো। এখানে কোথায় কি আছে জানতে এসেছিলে, না? তোমাদের মতো শয়তানদের জন্যেই ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। সারা বাগানে বিছিয়ে আছে গোপন তার। ওগুলো এড়িয়ে কারও ঢোকার জো নেই।'

'আমি এখনও বলছি আপনি ভুল করছেন, ম্যাডাম!' মরিয়া হয়ে বললো জিনা, রীতিমতো ভয় পেয়েছে এখন। 'বিকেলে যে এসেছিলো, ওরা আমার বন্ধু, তিন গোয়েন্দা। আমরা চোর নই। চোরের কথাই বলতে এসেছিলাম আপনাকে। একদল চোর আপনার রত্ন চুরি করার তালে আছে।'

'রত্ন? নতুন আরেক গপ্পো বানাচ্ছো, না? ভেবেছো, কোনোমতে আমাকে নরম করতে পারলেই ছেড়ে দেবো? সেটি হচ্ছে না।'

'না, বানিয়ে বলছি না!' গেল জিনার মেজাজ খারাপ হয়ে, চলে গেল ভয়ডর। 'আরেকটা কথা জেনে রাখতে পারেন, মিথ্যে কথা বলি না আমি।'

'তাই নাকি? তাহলে এতোক্ষণ কি কথা বলছো? রাতে চুরি করে অন্যের বাড়িতে ঢুকেছো, বেআইনী কাজ করেছো, এখন আবার তেজ দেখাচ্ছো। কাল সকালেই বুঝবে মজা, যখন শেরিফ এসে ধরে নিয়ে যাবে। এখন আর কিছু বলবো না তোমাকে। তবে ছাড়বোও না। আটকে রাখবো। সারারাত ধরে বসে বসে ভাবো, সকালে শেরিফকে কি বলবে।'

কিছুতেই কিছু হবে না, বোঝানো যাবে না মিসেস কুইলকে। চুপ হয়ে গেল জিনা।

টানতে টানতে তাকে গ্যারেজের কাছে নিয়ে এলেন মিসেস কুইল। 'সেলারে আটকালেই ভালো হতো। কিন্তু জানি তো, সারারাত চেঁচাবে। চেঁচিয়ে আমার ঘুম নষ্ট করবে। তাই এখানে ঢোকাচ্ছি। যতো খুশি চেঁচাও, কেউ শুনতে আসবে না। আমার কানেও পৌছবে না।'

'আপনার মতো মানুষ জীবনে দেখিনি আমি, মিসেস কুইল!' আর পরোয়া করলো না জিনা। 'যা ইচ্ছে করুন। শেরিফ খুব ভালো করেই চেনে আমাকে। কিছুই করবে না,' বুড়ো আঙুল নাড়লো সে।

'আরিব্বাবা, কি বিচ্ছু মেয়েরে!' সত্যি সত্যি অবাক হলেন মিসেস কুইল। 'এখনও এতো তেজ!'

'তো কি করবো? আপনার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদবো নাকি? একদিন বুঝবেন মজা, কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকবে না, শুধু কপাল চাপড়াবেন আর হায় হায় করবেন।'

একহাতে জিনাকে ধরে রেখে আরেক হাতে গ্যারেজের দরজা খুললেন মিসেস কুইল। ধাক্কা দিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার লাগিয়ে দিলেন দরজা। তালা লাগাতে লাগাতে বললেন, 'সকালে শেরিফ এসে যা করার করবে।'

'হ্যাঁ, করবে কচু!' ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিলো জিনা।

মিসেস কুইলের পদশব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

'ভালো গোলমালেই পড়লাম!' বসে বসে ভাবতে লাগলো জিনা। 'কিন্তু না, এভাবে চুপ করে থাকার কোনো মানে হয় না। বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে,' উঠলো সে। হাতড়ে হাতড়ে দেখলো তার জেলখানাটা। ভেন্টিলেশনের ছোট্ট কয়েকটা ফুটো ছাড়া আর কোনো ফাঁক নেই, জানালা নেই। কোনো পথ নেই বেরোনোর।

জিনার আদেশে চুপ করে ঝোপের ভেতরে বসে রয়েছে রাফিয়ান। ওখানে থেকেই কান পেতে শুনছে মনিবের প্রতিটি নড়াচড়া। বুঝলো, গেটের ওপরে উঠেছে জিনা, লাফিয়ে নেমেছে। পরক্ষণেই বেজে উঠলো ঘন্টা। বেরোলো না রাফিয়ান। শুনতে পেলো পরিচিত আরেকটা কণ্ঠ। ওই মানুষটাকে ঘৃণা করে সে। এইবার উদ্বিগ্ন হলো কুকুরটা। জিনার নরম কথা, রাগের কথা, চেঁচামেচি সবই শুনতে পেলো।

বুদ্ধিমান কুকুরটা বুঝতে পারলো, মনিবের আদেশ অমান্য করার সময় এসেছে এখন, তাকে বাঁচানোর জন্যেই। ঝোপের ভেতর থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এলো রাফিয়ান। জিনা কিংবা মহিলা কাউকে দেখতে পেলো না। গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো। অনেক উঁচু। লাফিয়ে পেরোতে পারবে না।

ঢোকার কি কোনো উপায় নেই?

ঘেউ ঘেউ করে অহেতুক সময় নষ্ট না করে শিকের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিলো রাফিয়ান। কিন্তু তার বিশাল শরীরটা ঢোকাতে পারলো না।

পিছিয়ে এসে দৌড়ে গিয়ে লাফ দিলো।

পাল্লার অর্ধেকের বেশি ওপরে উঠতে পারলো না। তবু আরও কয়েকবার চেষ্টা করে দেখলো।

নিরাশ হয়ে শেষে গেটের কাছে বসে গরগর করতে লাগলো।

কেউ সাড়া দিলো না।

আবার ঢোকার চেষ্টা শুরু করলো রাফিয়ান। ব্যর্থ হয়ে বিফল আক্রোশে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠলো কয়েকবার।

তার ডাক কানে গেল জিনার। ধক্ করে উঠলো বুক। আশার আলো দেখতে পেলো। 'রাফি!' চেঁচিয়ে ডাকলো সে। 'রাফি! আমি এখানে! রাফি!'

জবাবে আবার ঘেউ ঘেউ শুনতে পেলো।

চুপসে গেল আবার জিনা। রাফিয়ান তাকে কিভাবে মুক্ত করবে? গেটের ভেতরেই

ঢুকতে পারবে না বেচারা। বেরোনোর চেষ্টা আমাকেই করতে হবে! —মন শক্ত করলো সে। যেভাবেই হোক। সকালে শেরিফ এলে কিছু করবে না, ঠিক, ছেড়ে দেবে। কিন্তু তার বাবা? রেগে আগুন হবেন। হয়তো মাসখানেক ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দেবেন। শাস্তি। সবচেয়ে বড় কথা, কথাটা জানাজানি হবে, চোরেরাও শুনে ফেলবে। এখানে রত্ন চুরির চিন্তা বাদ দিয়ে চলে যাবে ওরা। আর কখনোই ধরা যাবে না ওদের।

জিনার ডাক শুনে রাফিয়ানও চুপ করে বসে নেই। গেট পেরোনোর চেষ্টা চালালো আবার। এবারেও পারলো না। সহজ একটা ভাবনা এলো তার কুকুর-মনে, তাকে দিয়ে হবে না। অন্যদের সাহায্য লাগবে। অন্য কারা?

গ্যারেজের দিকে তাকালো রাফিয়ান। ওখানেই বন্দি হয়ে আছে তার মনিব। শেষবারের মতো একবার ঘেউ ঘেউ করে ফিরলো। ছুটে চললো যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।

সাত

একটানা দৌড়ে চলেছে রাফিয়ান। কোনো বিরতি নেই। পথ থেকে সরছে না। পৌঁছে গেল গোবেল বীচে। গোবেল ভিলার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। এবার কি করবে? চেঁচিয়ে জিনার বাবা-মাকে জাগাবে? কিন্তু কেন যেন মনে হলো তার, ওদেরকে দিয়ে কিছু হবে না। ডেকে আনতে হবে জিনার তিন বন্ধুকে। মুসা, কিশোর আর রবিনকে।

কিন্তু তা করতে হলে তাকে দ্বীপে যেতে হবে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পানিতে নামলো প্রভুভক্ত কুকুরটা। সাঁতরে চললো। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে গোবেল দ্বীপ। এখানকার পানিতে বহুবার সাঁতরেছে সে, জন্মের পরে সেই ছোট্টবেলা থেকে। পরিচিত এলাকা। ভয় পাচ্ছে না তাই।

দ্বিমুখী স্রোত আছে এখানে, জানা আছে রাফিয়ানের। দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে যে স্রোত, তাতে এসে পড়লো। তারপর আর কোনো কাজ নেই, ভেসে রইলো শুধু। মাঝে মাঝে অবশ্য পা নাড়ছে, গতি বাড়ানোর জন্যে।

দ্বীপে পৌঁছে গেল রাফিয়ান। দুই ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলে দিলো দৌড়। ঢালু পার বেয়ে উঠে এসে তাঁবুতে ঢুকেই শুরু করলো চিৎকার।

'ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!'

চমকে জেগে গেল তিন কিশোর। উঠে বসলো বিছানায়।

'কিরে রাফি, কি হয়েছে?' অন্ধকারে জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'মাথা খারাপ হলো নাকি তোর? এমন চেঁচাচ্ছিস!'

কিশোর বুঝতে পারলো, কিছু একটা হয়েছে। ডাকলো, 'জিনা? এই জিনা!'

জবাব নেই।

টর্চ জ্বাললো রবিন। চেঁচিয়ে উঠলো, 'কিশোর, জিনা নেই!'

'গেল কই?' বিড়বিড় করলো মুসা। 'এতো রাতে?'

'চলো তো দেখি,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো তিনজনে। জিনার নাম ধরে ডাকলো বার বার।

অধৈর্য হয়ে উঠেছে রাফিয়ান। খালি ঘেউ ঘেউ করছে। শেষে কিশোরের জ্যাকেটের কোণ কামড়ে ধরে টানলো।

'কোথায় নিতে চাইছিস?' আনমনে বললো কিশোর।

সরু পথ ধরে ওকে টেনে নিয়ে চললো রাফিয়ান।

কিশোর চলতে শুরু করতেই জ্যাকেট ছেড়ে দিয়ে আগে আগে চললো।

গোপন বন্দরের কাছে এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। টর্চ জ্বেলে দেখলো, নৌকাটা নেই। বুঝে গেল, দ্বীপে নেই জিনা। গেল কোথায়? আর গেল তো, রাফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন? কুকুরটাকে ছাড়া কোথাও যায় না সে, আর এই রাতের বেলা যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

'কি হয়েছে রে, রাফি?' বলতে বলতে কুকুরটার গায়ে আলো ফেললো কিশোর। চমকে উঠলো। এই প্রথম খেয়াল করলো, রাফিয়ানের শরীর ভেজা।

'গিয়েছিলো!' চেঁচিয়ে বললো মুসা। 'সঙ্গে গিয়েছিলো! সাঁতরে ফিরেছে!'

শঙ্কিত হয়ে উঠলো ছেলেরা। বুঝলো, কোনো কারণে মূল ভূখণ্ডে গিয়েছিলো জিনা আর রাফিয়ান। জিনা কোনো বিপদে পড়েছে। সাঁতরে চলে এসেছে কুকুরটা, তাদেরকে খবর দিতে।

'বুঝেছি, কোথায় গেছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'নিশ্চয় ম্যানারস হাউসে। জিনার সন্দেহ, ভেতরে বেআইনী কিছু লুকিয়ে রেখেছেন মিসেস কুইল। জানিয়ে যেতে চাইলে, আমরা যেতে দিতাম না। তাই চুরি করেই গেছে। গিয়ে পড়েছে বিপদে। চলো, জলদি চলো।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন তুললো রবিন। 'নৌকা তো নিয়ে গেছে। ও আটকা পড়েছে ওখানে, আমরা এখানে।'

'তাই তো! কি করা যায়?' নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটতে লাগলো কিশোর।

'আমি যাচ্ছি,' ঘোষণা করলো মুসা। 'নৌকাটা নিয়ে আসি গিয়ে।'

'তুমি?' অবাক হয়ে বললো রবিন।

'হ্যাঁ। রাফি পারলে আমি পারবো না কেন? আমি কি ওর চেয়ে কম সাঁতরাতে পারি?'

'চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে,' বললো কিশোর।

'দরকার নেই। আমি একাই পারবো। তুমি এতোদূর সাঁতরাতে পারবে না, শেষে আরেক বিপদ বাধাবে।' বলতে বলতেই গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেললো মুসা, শুধু জাঙ্গিয়া বাদে। নেমে পড়লো পানিতে।

রাফিয়ান ভাবলো, মুসা একাই যাচ্ছে জিনাকে আনতে। সেও নামলো পানিতে। পেছন থেকে অনেক ডাকাডাকি করলো কিশোর, উঠে আসার জন্যে, কানই দিলো না কুকুরটা।

রাতটা গরম, ফলে পানিও গরম। যতোখানি ঠাণ্ডা হবে ভেবেছিলো মুসা, ততোটা নয়। সাঁতরে চললো ধীরে ধীরে। রাফিয়ানের মতো তারও জানা আছে, এখানে দুটো স্রোত বয়। তীরের দিকে যেটা চলে গেছে, সাঁতরে এসে সেটাতে পড়লো।

সাগর আর পানিকে মোটেও ভয় করে না মুসা, বরং ভালোবাসে। এখানে রাত-দিন তার কাছে সমান। শুধু পানিতে হাঙর না থাকলেই হলো। এদিকের পানিতে এখন পর্যন্ত একটা হাঙরও দেখতে পায়নি সে, কাজেই সে-ভয় করলো না। এখনকার মুসা আমানকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না, এ-সেই ছেলে, যে ভূতের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। রাতের বেলা একা এভাবে সাঁতরে সাগর পাড়ি দেয়ার কথা অনেক দুঃসাহসী সাঁতারুও ভাবতে পারে না।

সৈকতে পৌঁছলো ওরা। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় জিনার নৌকাটা ঘাটেই দেখতে পেলো মুসা। উঠে বসলো তাতে। রাফিয়ানও লাফ দিয়ে চড়লো।

দ্রুত দাঁড় বেয়ে দ্বীপে ফিরে এলো মুসা।

কিশোর আর রবিন তৈরিই আছে। নৌকায় উঠলো।

গোবেল ভিলার ঘাটে এসে ভিড়লো নৌকা। তাড়াতাড়ি নেমে ওটাকে বেঁধে রেখে, জিনাদের গ্যারেজ থেকে ভাড়া করা সাইকেল তিনটে বের করে আনলো ওরা। তারপর রওনা হলো ম্যানারস হাউসে। সঙ্গে দৌড়ে চললো রাফিয়ান।

কুকুরটার ক্ষমতা দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় কিশোর। দৌড়ে একবার ম্যানারস হাউসে গিয়েছে, আরেকবার ফিরেছে। দু'বার সাগর পাড়ি দিয়েছে সাঁতরে। তারপর আবার এখন দৌড়ে চলেছে। যেন কিছুই না ব্যাপারটা। একটুও ক্লান্তি নেই। এই মুহূর্তে ভাবলো সে, ইস্, তারও যদি এমন এনার্জি থাকতো! কিন্তু তা-তো থাকবে না, সে মানুষ। তার শরীরটাই গড়া হয়েছে অন্যভাবে।

ম্যানারস হাউসের কাছে পৌঁছলো ওরা। সাইকেলগুলো লুকিয়ে রাখলো ঝোপের আড়ালে।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'রাফি, কোথায়?'

পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে গ্যারেজের কাছে নিয়ে এলো রাফিয়ান। চাপা 'হুফ!' করে উঠলো।

জবাব এলো সঙ্গে সঙ্গেই, 'রাফি, এসেছিস?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তিন গোয়েন্দা।

'জিনা,' ডাকলো মুসা। 'তুমি কোথায়? গ্যারেজে?'

'হ্যাঁ। জলদি বের করো আমাকে।'

'চেষ্টা করছি,' বললো কিশোর। 'ওভাবে আর চেঁচিও না। মিসেস কুইল জেগে যাবেন। এতোক্ষণে গেছেন কিনা কে জানে!'

জিনার মনে পড়লো, মিসেস কুইলের কথাঃ যতো খুশি চেঁচাও, কেউ শুনতে আসবে না! আমার কানেও পৌছবে না!

গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা আর রাফিয়ান। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক সেকেণ্ড। কান খাড়া। কিন্তু বাড়ির ভেতরে নড়াচড়ার কোনো শব্দ কানে এলো না, কোনো ঘরের আলোও জ্বললো না।

'মনে হয় শোনেননি,' বললো কিশোর। 'জিনাকে বের করা দরকার।'

'কিভাবে?' বললো মুসা।

'দাঁড়াও, ভাবছি।'

'এক কাজ করি না,' পরামর্শ দিলো রবিন। 'আগে গেটটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। জিনা নিশ্চয় তাই করেছে...'

'তাতে লাভটা কি হয়েছে? বিপদে পড়েছে।'

'ধরা পড়লো কিভাবে?' আনমনে বললো মুসা। 'গেটের কাছে বার্গলার অ্যালার্ম নেই তো? কিংবা কোনো ধরনের ম্যান-ট্র্যাপ?'

'থাকতেও পারে,' বললো কিশোর। 'তবে গেটটা ইলেকট্রিফাইড নয়। তাহলে পেরোতে পারতো না জিনা। আমার মনে হয় অ্যালার্ম সিসটেমই আছে। মুসা, আমি আগে পেরোচ্ছি। আমি নিরাপদে নামতে পারলে তুমি আসবে।'

'আমি আগে যাই?'

'না। তুমি দাঁড়াও।' নিরাপদেই গেট পেরোলো কিশোর। মুসাকে আসতে বললো।

মুসাও পেরোলো।

রবিনকে বললো কিশোর, 'তুমি রাফিকে নিয়ে বাইরে থাকো। যদি আমরাও ধরা পড়ি, গিয়ে জিনার বাবাকে খবর দেবে। বুঝেছো?'

মাথা কাত করলো রবিন।

মাটিতে টর্চের আলো ফেলে দেখে দেখে খুব সাবধানে খোয়া বিছানো একটা পথে এসে উঠলো কিশোর, সঙ্গে মুসা। জিনাকে গ্যারেজে ঢোকানোর জন্যে নিশ্চয় এ-পথেই এসেছেন মিসেস কুইল, তারমানে এখানে তার-টার নেই।

গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। দরজায় টোকা দিয়ে কিশোর বললো,

'জিনা, আমরা এসেছি। বেরোনোর কি এটাই একমাত্র পথ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো জিনা। 'নিশ্চয় তালা লাগানো?'

'হ্যাঁ।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কিশোর, তালা ভাঙবে কিভাবে?'

ভেতর থেকে জিনা বললো, 'মিসেস কুইলের গাড়ির বুটে যন্ত্রপাতি ছিলো। বের করেছি। তালা খোলার চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

'ভেতরে থেকে আর পারবে কিভাবে?' মুসা বললো।

'বাইরে থেকেও পারা যাবে না,' বললো কিশোর। তাকালো টালির চালার দিকে। 'একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছি। বাড়ি মেরে তালা ভাঙতে গেলে শব্দ হবে। তাতে উঠে চলে আসবেন মিসেস কুইল। ওই টালি খোলা ছাড়া পথ নেই।'

'ঠিকই বলেছো,' একমত হলো মুসা।

গ্যারেজের দরজার ফাঁকে মুখ নিয়ে গিয়ে কিশোর বললো, 'জিনা, গাড়ির ওপরে উঠে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি দাও চালে। তাহলে বুঝতে পারবো কোথায় আছো। ওখানকার টালি সরাবো। বাড়ি দেয়ার কিছু আছে?'

'আছে,' জবাব দিলো জিনা।

'মুসা, সোজা হয়ে দাঁড়াও,' বললো কিশোর। 'এখানে এসে তোমার কাঁধে চড়ে চালে উঠবো।'

চালে উঠলো কিশোর।

নিচ থেকে বাড়ি দিলো জিনা, মৃদু ঠকঠক শব্দ হলো।

বড় বড় টালি, অনেক পুরনো। দুই পাশ ধরে বার কয়েক হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে চলে এলো একটা। কষ্ট প্রায় করতেই হলো না। পুরনো বলে হয় জোড়া ছুটে আলগা হয়ে রয়েছে, নয়তো গ্যারেজের চাল বলে তেমন যত্ন করে লাগানোই হয়নি। যা-ই হোক, আরও গোটা দুয়েক টালি খুলে ফেললো সে। উঁকি দিলো ভেতরে। আবছামতো দেখা গেল জিনার মুখ। 'হাত বাড়াও।'

'যদি টালি ভেঙে পড়ে?'

'পড়লে পড়বে। আর কোনো উপায় নেই।'

লম্বা হয়ে চালের ওপর শুয়ে পড়ে নিচে হাত বাড়ালো কিশোর। জিনার দুই কব্জি দু'হাতে চেপে ধরে টেনে তুলে আনতে লাগলো। কিছুটা তোলার পর টালির কিনার নাগাল পেলো জিনার আঙুল। সে নিজেই তখন টালির ধার খামচে ধরে শরীরটা টেনে তুলে আনতে লাগলো। সাহায্য করলো কিশোর। জোড়া নরম হলে হবে কি, টালিগুলো খুব শক্ত। ভাঙলো না।

চালে উঠেই হাসলো জিনা। 'সকালে মিসেস কুইলের মুখটা যদি দেখতে পারতাম। পাখি উড়ে গেছে দেখে কি অবস্থা হয়।'

'হয়েছে হয়েছে, জলদি চলো,' তাড়া দিলো কিশোর। 'এখনও বেরিয়ে যাইনি আমরা। চলো, কুইক!'

সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে গ্যারেজে চললেন মিসেস কুইল। ভাবছেন, সারারাত গ্যারেজে বন্দি হয়ে থেকে নিশ্চয় নরম হয়ে এসেছে মেয়েটা, বেশি চাপাচাপি করতে হবে না। দু'চারটা ধমক-ধামক দিলেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।

কিন্তু গ্যারেজের দরজা খুলেই থ হয়ে গেলেন। আর কোনো সন্দেহ রইলো না তাঁর, সাংঘাতিক এক চোরের দলের পাল্লায় পড়েছেন। ওভাবে ইনফর্মারকে বের করে নিয়ে যেতে পারে যারা...! প্রায় দৌড়ে ফিরে এলেন বসার ঘরে। শেরিফের অফিসে ফোন করলেন। শেরিফ নেই, আছে তাঁর ডেপুটি। সব শুনে বললো, 'হুঁ, চোরই মনে হচ্ছে। সাবধানে থাকবেন। আর, আবার ওদের কেউ বাড়িতে ঢুকলেই আটকে রেখে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন আমাকে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলেন মিসেস কুইল, রাগে। ভাবলেন, ফোনটা তো পরে করবো। এবার ধরতে পারলে আগে আচ্ছামতো ধোলাই দিয়ে নেবো না কিছুক্ষণ!

আট

পরদিন সকালে অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙলো ওদের। বাইরে রোদ চড়েছে। হাতমুখ ধুয়ে এসে পেট ভরে খাওয়ার পর গতরাতের অভিযানের কথা আলোচনা শুরু করলো। এখন এই দিনের আলোয় রাতের ব্যাপারটা কেমন যেন অবাস্তব মনে হলো ওদের কাছেই, যেন একটা স্বপ্ন। তবে, লম্বা ঘুম দিয়ে, আর খেয়েদেয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। আবার অভিযানে বেরোনোর উপযোগী হয়ে গেছে এখন।

'তাহলে বুঝতেই পারছো,' রবিন বললো। 'জিনা, কাল রাতে ওভাবে যাওয়াটা তোমার উচিত হয়নি। কোনো দরকার ছিলো না। ভাবছি, একটা চিঠিই দেবো মিসেস কুইলকে। আর, অন্য ভাবে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করতে হবে।'

'মানে?' প্রশ্ন করলো জিনা।

'উইলেরা কার রত্ন চুরি করতে চায়, জানতে চাই না আমরা?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাল রাতে তোমার অভিযান একেবারে বিফলে যায়নি। রত্নের কথা বলেছো মিসেস কুইলকে। মহিলা অবাক হয়নি। চমকেও ওঠেনি। বরং ভেবেছে, বানিয়ে তাকে একটা গল্পো বলছো। তার মানে কি? তার কাছে রত্ন নেই।'

'যদি থাকেও,' বললো মুসা। 'ওই বেটির কাছে আর যাচ্ছি না। মরুকগে। ওর কাছে থাকলে, আর চোরে চুরি করে নিয়ে গেলেই আমি খুশি হবো। ...এই কিশোর, তুমি কিছু বলছো না?' কনুই দিয়ে বন্ধুর পাঁজরে গুঁতো দিলো সে। 'আরি, দুনিয়ায় নেই নাকি?'

'আছি,' জবাব দিলো কিশোর। 'তোমাদের সব কথাই শুনছি। তবে মানতে পারছি না।'

'কেন?' অবাক হয়ে তাকালো রবিন।

'মিসেস কুইলের চমকে না ওঠাই প্রমাণ করে না যে তাঁর কাছে রত্ন নেই।'

'কিন্তু থাকলে আমাদের কথা শুনতে চাইতো, অন্তত জিনা যখন বলেছে, তখন চাইতোই। হুঁশিয়ার করেছে বলে তাকে ধন্যবাদ জানাতো, আটকে রাখতো না।'

'ভুলে যাচ্ছো, আমাদেরকে চোরের ইনফর্মার ভেবেছেন মহিলা। ভেবেছেন, কায়দা করে তাঁর কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছি। কাজেই, থাকলেও চেপে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক।'

কিশোরের এই যুক্তির জবাব দিতে পারলো না অন্য তিনজন।

'এক কাজ করা যেতে পারে,' আবার বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'মিসেস বারমোডেল বাদ। মিসেস কুইল তো কথাই শুনতে চান না। মিসেস জিনজারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারি আমরা।'

'রাইট!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জিনা। 'চলো, এখুনি।'

ম্যানর ফার্মের দিকে সাইকেল চালানোর সময় কথা খুব কমই হলো।

'অবাক কাণ্ড!' বললো রবিন। 'কেউই কথা বলতে চায় না। বললে অনেক সহজ হয়ে যেতো আমাদের কাজ। দেখা যাক, মিসেস জিনজার কি করেন!'

মিসেস জিনজার আরও বেশি অসহযোগিতা করলেন। মিসেস বারমোডেল সন্দেহপ্রবণ, মিসেস কুইল সন্দেহপ্রবণ এবং বদমেজাজী—দুটোই, আর মিসেস জিনজার যে কি সেটাই বোঝা গেল না। প্রায় কোনো কথাই বললেন না।

ফার্মে ঢুকেই দেখা হয়ে গেল একটা মেয়ের সঙ্গে, আঠারো-ঊনিশ হবে বয়েস। গরুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ছেলেরা দেখা করতে চায় শুনে বললো, 'হবে না। তিনি বাইরে যেতে তৈরি হচ্ছেন। ডিম আর দুধ-মাখন নিজেই ডেলিভারি দিয়ে আসেন। দেখা করতে চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিও। তবে তাতেও লাভ হবে বলে মনে হয় না।' হেসে যোগ করলো মেয়েটা, 'ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না মিসেস জিনজার।'

একটা ল্যাণ্ড রোভারের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। চত্বর ঘুরে বেরিয়ে এলো গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে এক মহিলা।

'ওই যে যাচ্ছেন,' দেখিয়ে বললো মেয়েটা।

'হাই, মিসেস জিনজার!' হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে গেল কিশোর। 'একটু দাঁড়ান, প্লীজ!'

পাশে এসে থামলো গাড়িটা। মুখ ফেরালেন মহিলা। 'কী?' নিরস কণ্ঠস্বর।

'কয়েকটা কথা বলতে চাই। জরুরী।'

'ব্যবসার ব্যাপারে?'

'না। ব্যক্তিগত। তবে খুব জরুরী।'

'সময় নেই।'

ব্যাস, কথা শেষ। ছেলেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুশ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, পেছনে উড়িয়ে রেখে গেল একরাশ ধুলোর মেঘ।

'যাও, করো আরও গোয়েন্দাগিরি,' হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। 'খুব দেখালো যা হোক!'

খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। 'আগেই বলেছিলাম। যাই, কাজ পড়ে আছে।'

মেয়েটা যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে, চত্বরের ওদিক থেকে বেরিয়ে এলো আরেকজন শ্রমিক। গোলগাল চেহারা, হাসিখুশি। কাছে এসে বললো, 'ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো জিনা। 'জরুরী কথা বলতে এসেছিলাম, আপনার ম্যাডামের নিজের ভালোর জন্যেই।'

হাসতে শুরু করলো লোকটা। 'ম্যাডামের নিজের ভালো, না? হাহ্ হাহ্! একমাত্র নিজের কথা ছাড়া আর কারো ভালো কথা শোনে না। টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলছে, তবু আরও চায় আরও চায়। ব্যাংকে কতো জমেছে, নিজেই জানে না। লোকে বলে, তার সেলারেও নাকি ধনরত্নের অভাব নেই। ম্যাডাম খালি নেই নেই করলে কি হবে, সবাই জানে একথা।'

'ধনরত্নের' ব্যাপারে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করা হলো ওকে। তবে আর কিছু বলতে পারলো না লোকটা। কি ধরনের ধনরত্ন, তা-ও জানতে পারলো না।

দুপুর নাগাদ হতাশ হয়ে দ্বীপে ফিরে এলো গোয়েন্দারা। আলোচনায় বসলো। সামনে খোলা সাগর রোদে আয়নার মতো চমকাচ্ছে।

'মনে হয় এবার ঠিক জায়গাতেই গিয়েছি,' বললো জিনা। 'মিসেস জিনজারের সেলারে ধনরত্ন আছে, জানা গেল।'

'ঠিক,' হাত তুললো রবিন।

'আসলে, তোমরা না, বেশি বেশি করছো,' বিরক্ত হয়ে বললো মুসা। 'মরুকগে না ওরা, আমাদের কি? কথা পর্যন্ত শুনতে চায় না। ঠেকাটা আমাদের, না ওদের?'

'এখন আমাদের,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।

'কি রকম?'

'আমাদেরকে অপমান করেছে। মাত্র একটা উপায়েই এর জবাব দেয়া যায়। চুরিটা ঠেকানো। এরপর আমাদের কাছে মাফ চেয়ে কুল পাবে না।'

'শেরিফকে গিয়ে বললেই পারি তাহলে। ওরা চুরি ঠেকাক। তাতেও প্রমাণ হবে যে, আমরা বেটিদের ভালো করতে চেয়েছি।'

'কি বলবো গিয়ে শেরিফকে? কিছুই তো জানি না। শুধু জানি, কয়েকটা চোর এখানকার কোনো একটা বাড়িতে চুরির প্ল্যান করেছে, ব্যাস। ঠিক কোন বাড়িতে, তা-ও জানি না।'

'তাহলে কি করতে বলছো?'

'এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। এই রহস্যের সমাধান আমরা করেই ছাড়বো। এখন দুটো বাড়ির ওপরই চোখ রাখতে হবে। কাজ অনেক বেড়ে গেল আরকি, জটিল হয়ে গেল।'

আর তর্ক করে লাভ নেই। কিশোর পাশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আর তাকে থামানো যাবে না। প্রতিবাদ করলো না কেউ। তাহলে তাদেরকে রেখে একাই সব কাজ করতে যাবে কিশোর।

পরের ক'টা দিন খুব অশান্তি আর অস্বস্তির মাঝে কাটলো ওদের। একই সাথে দুই জায়গায় দুটো বাড়ির ওপর কড়া নজর রাখা সহজ কাজ নয়। দু'ভাগে ভাগ হয়ে কাজটা করলো ওরা। ইতিমধ্যে আরেকবার মিসেস জিনজারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে, লাভ হয়নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার চেষ্টা করেছে। স্রেফ মানা করে দিয়েছেন মহিলা।

আস্তে আস্তে বিরক্ত হয়ে উঠলো সবাই, কিশোর ছাড়া। আর রাফিয়ানের মাথাও নেই ব্যথাও নেই, সে আনন্দেই আছে। রোজ এই ছোটাছুটি। খুব ভালো লাগছে তার।

'আর পারবো না,' মুসার মতোই বলে ফেলতে যাচ্ছিলো রবিন আর জিনা, ঠিক এই সময় ঘটতে শুরু করলো ঘটনা।

নয়

সেদিন সকালে রবিন জানালো, খাবার ফুরিয়ে গেছে। কোকো, মাখন, চিনি, বিস্কুট লাগবে। 'আলু, ম্যাচ, ডিম আর কিছু লেটুসও লাগবে,' বললো সে। 'ও হ্যাঁ, আর কিছু মাছ।'

'বাহ্, লম্বা লিস্ট,' কিশোর হাসলো। 'সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছি?'

'চলো, বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি,' পরামর্শ দিলো মুসা।

অতএব ঝুড়ি নিয়ে নৌকায় চড়ে বসলো ওরা।

গোবেল ভিলার ঘাটে নৌকা রেখে গ্যারেজ থেকে বের করলো সাইকেলগুলো। তারপর রওনা হলো বাজারে। কিশোর আর মুসা গিয়ে ঢুকলো একটা জেনারেল স্টোরে। রবিন গেল বেকারিতে, টাটকা কিছু রুটি বিস্কুট কিনে গেল সব্জীর দোকানে। আর রাফিয়ানকে নিয়ে জিনা গেল কসাইয়ের কাছে। ওখানে মাংস পাবে, ডিমও পাবে।

হেসে কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করলো কসাই, 'কিরে কেমন আছিস?'

'হুফ!' জবাব দিলো রাফিয়ান।

বড় দেখে একটা রসালো হাড় দিলো কুকুরটাকে কসাই।

মাংস আর ডিম নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে স্টোরের দিকে এগোলো জিনা। এই সময় ধাক্কা লাগলো একটা লোকের সঙ্গে। জিনার দোষ নেই, লোকটাই ধাক্কা লাগিয়েছে। আর এতো অভদ্র, 'সরি' বলার জন্যেও থামলো না।

একটা কড়া কথা বলার জন্যে ফিরে চেয়েই থমকে গেল জিনা। রোগাটে, লাল চুল, চেনা চেনা। দেখেছে আগে কোথাও। চট করে মনে পড়ে গেল, গোবেল দ্বীপে। কিউট, নিশ্চয় ও-কিউট ছাড়া আর কেউ না। উইলের সহকারী।

কড়া কথাটা আর বললো না জিনা। লোকটা তাকে লক্ষ্য করেনি। আপনমনে চলেছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা, এদিকেই আসছে। দ্রুত তাদের কাছে এগিয়ে গেল জিনা। 'ওই যে লালচুলো লোকটা,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত তুলে দেখালো সে। 'ও–ই কিউট, আমি শিওর।'

লাফিয়ে উঠলো তিন গোয়েন্দা।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'ঠিক চিনেছো?'

মাথা নাড়লো জিনা।

'চলো চলো, পিছু নিই,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর।

'যাচ্ছে কোথায় ব্যাটা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো রবিন।

'হয়তো উইলের কাছে,' জিনা বললো।

'হুঁ। কোথায় থাকে তা–ও হয়তো জানা যাবে।'

'যাবে, যদি গাড়িতে করে না এসে থাকে,' অন্যদের মতো আশাবাদী হতে পারছে না কিশোর। 'আর গাড়ি থাকলে তো গেল। সাইকেল নিয়ে অনুসরণ করতে পারবো না।'

'চলো, দেখা যাক কি হয়,' মুসা বললো।

এ–সময়ে বাজারে ভিড় কম। যারা এসেছিলো, কেনাকাটা সেরে বেশির ভাগই চলে গেছে।

সোজা বেকারির দিকে এগিয়ে চলেছে লালচুল লোকটা।

দিনটা গরম, উজ্জ্বল রোদ। বেকারির সামনের চত্বরে গোটা দুই টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার পেতে দিয়েছে দোকানির বৌ। যাতে লোকে বাইরে বসেই হালকা খাবার আর ড্রিংক খেতে পারে।

একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো কিউট। ওই টেবিলে আগে থেকেই আরেকজন বসে রয়েছে। গাঁট্টাগোঁট্টা, খাটো করে ছাঁটা চুল।

'উহল! ওই লোকটাই!' ফিসফিস করে বললো জিনা। 'দুটোকেই একসাথে পেলাম। আমাদের কপাল খুলতে আরম্ভ করেছে।'

'যদি না দেখা দিয়েই হারিয়ে যায়,' আবার নিরাশ করলো কিশোর।

'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো?' রবিন বললো।

'না। ওরা কি বলে শুনতে চাই। পাশের টেবিলটা খালি। চলো, ওখানে গিয়ে বসি। ওরা আমাদেরকে চেনে না, কিছুই সন্দেহ করবে না।'

পাশের টেবিলে গিয়ে বসলো ওরা। চোখ তুলে তাকালোও না দুই চোর। কয়েকটা ছেলেমেয়েকে আর কি কেয়ার করবে? আলোচনায় মগ্ন। এমনভাবে কথা বলছে, যেন সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু ছেলেরা বুঝতে পারলো, সাধারণ নয়।

'বেন তাহলে কালই আসছে?' বললো উহল। 'তুমি শিওর তো?'

'হ্যাঁ, মিস্টার উহল। এসেই তার কাজ শুরু করবে। আগেই চলে আসছে।'

'তাহলে আমরাও আগেই সেরে ফেলতে পারি?'

'না, সেটা উচিত হবে না। তিরিশ তারিখ ঠিক করেছি, তা-ই থাকবে। কাজ সেরে কিভাবে চলে যাবো, প্ল্যান করা আছে না? এখন নতুন করে কিছু করতে গেলে...'

'আস্তে বলো,' বাধা দিলো উহল।

আড়চোখে ছেলেদের দিকে একবার চেয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললো কিউট। এতো কাছে থেকেও তার কথা আর কিছু বুঝতে পারলো না ওরা। অনুমান করলো, নিশ্চয় বেনের কথা বলছে। কি বলছে? ইস্, যদি শুনতে পারা যেতো!

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালো উহল আর কিউট।

ছেলেদের খাওয়াও শেষ। দোকানির বৌ এলে তার হাতে টাকা গুঁজে দিলো কিশোর। ওরা উঠলো।

লোকগুলো কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের পিছু নিলো।

'বেন ব্যাটা নিশ্চয় মিসেস কুইলের ওখানে মালীর কাজ নিয়েছে,' মন্তব্য করলো মুসা।

'না-ও হতে পারে,' বললো জিনা। 'হয়তো ম্যানর হাউসে শ্রমিকের কাজ নিয়েছে।'

'জানবো কি করে সেটা?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওদেরকে চোখের আড়াল করা চলবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর।

চোরগুলোকে রাফিয়ানও চিনে ফেলেছে। গন্ধ পেয়েই। কড়া চোখে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। জিনার ইশারা পেলেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, টুঁটি কামড়ে ধরার জন্যে। শান্ত হতে বললো ওকে জিনা। 'এখন না, রাফি! চুপ!'

কিছুটা অবাকই হলো রাফিয়ান। তবে আদেশ মানলো।

দু'জনকে অনুসরণ করে চলেছে ওরা। লোকগুলোর কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ধীরে ধীরে হাঁটছে। ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য লোক।

আরও কিছু দূর গিয়ে থামলো দু'জনে। হাত মেলালো। তারপর 'গুডবাই' জানিয়ে উইল ঘুরে গিয়ে ঢুকলো একটা সিগারেটের দোকানে। কিউট এগিয়ে গেল পথ ধরে।

'কিউটের পিছে যাচ্ছি আমি আর রবিন,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'তোমরা চোখ রাখো উইলের ওপর। যে যেখানেই যাই, ঘাটে নৌকায় মিলিত হবো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করলো জিনা।

কিউটের পিছু নিলো কিশোর আর রবিন। পেছনে রয়ে গেল জিনা, মুসা আর রাফিয়ান।

দ্রুত হাঁটছে কিউট। তার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। মুসা হলে ঠিকমতো পারতো। শঙ্কিত হলো কিশোর। পেছন ফিরে তাকিয়ে ওদেরকে এভাবে হাঁটতে দেখলে সন্দেহ করে বসতে পারে লোকটা।

তবে একবারও ফিরে তাকালো না কিউট। কল্পনাও করেনি, তাদের কথা কেউ শুনে ফেলেছে, তাদেরকে সন্দেহ করে পিছু নিয়েছে। খুব চিন্তিত মনে রয়েছে।

বাজারের সীমানা ছাড়ালো। এগিয়েই চলেছে কিউট। থামার নামও নেই।

'যাচ্ছে কোথায়?' ফিসফিস করে বললো রবিন।

হাত নাড়লো শুধু কিশোর, অর্থাৎ, 'কি জানি!'

পথে লোক চলাচল কম। আরও এগোলে আরও কমে যাবে, হয়তো একআধজনও আর চোখে পড়বে না। তখন অনুসরণ করা মস্ত ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

হঠাৎ থেমে গেল কিউট।

ধড়াস করে উঠলো দুই গোয়েন্দার বুক। পেছনে ফিরে তাকাবে না তো? ওরাও থেমে গেল। ধাক্কা দিয়ে রবিনকে একটা পাতাবাহারের ঝাড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়লো কিশোর।

বড় একটা গাছের নিচে একটা মোটর সাইকেল রাখা। ওটার দিকে এগোলো কিউট।

মুখ কালো হয়ে গেল কিশোরের। এই আশঙ্কাই করছিলো।

'গেল!' বললো সে। 'আর অনুসরণ করা যাবে না।'

রবিনও বুঝতে পারছে সেকথা। 'তবু, নাম্বারটা নিয়ে রাখি।'

স্টার্ট নিয়ে চলে গেল মোটর সাইকেল।

জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে দোকানের ভেতরে চেয়ে আছে মুসা। দেখছে, উইল কি করে।

'সরে এসো,' জিনা ডাকলো। 'দেখে ফেলতে পারে। তাহলে সন্দেহ করবে।'

সরে এসে আরেকটা দোকানের সামনের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বেরিয়ে এলো উইল। পাইপ টানতে টানতে চলে গেল ছেলেদের পাশ দিয়ে, ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না। কি তামাক ভরেছে কে জানে! বাজে গন্ধ! নাক কুঁচকালো জিনা।

গররর করে উঠলো রাফিয়ান।

'চুপ!' নিচু কণ্ঠে ধমক দিলো জিনা।

কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে মেনরোডে উঠলো উইল।

তাকে অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধেই হলো না জিনা আর মুসার। লোকটার দিকে তাকাচ্ছে না। একেকটা দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, আর নানারকম মন্তব্য করছে ওরা। কথা কাটাকাটি করছে। দুটো কিশোর-কিশোরীর জন্যে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কেউ সন্দেহ করবে না।

উইলও করলো না। আচমকা মোড় নিয়ে এগিয়ে গেল পুরানো একটা গোলাবাড়ির দিকে। সংস্কার করে ওটাকে এখন বোর্ডিং হাউস বানানো হয়েছে, জানে জিনা। চলার গতি বাড়ালো সে।

'ওখানেই উঠেছে নাকি?' মুসা বললো।

'বোধহয়। চলোই না, দেখি।'

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল উইল।

কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করলো দু'জনে। তারপর রাফিয়ানকে বাইরে দাঁড়াতে বলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। সারি সারি দরজায় চৌকাঠের ওপরে ধাতব ফ্রেম, তার মধ্যে কার্ডবোর্ডের টুকরো ঢোকানো। প্রতিটি টুকরোতে লেখা রয়েছে ঘরের নাম্বার, আর যে থাকে তার নাম।

নামটা পেয়ে গেল ওরা। লেখা রয়েছেঃ

ব্রেড উইল

৪/এ

'আসল নাম না নকল নাম কে জানে?' জিনা বললো। 'তবে জানা গেল, কোথায় থাকে। চলো, ওদেরকে জানাইগে।'

প্রায় একই সময়ে ঘাটে পৌঁছলো দুটো দল।

কিশোর আর রবিন জানালো, কি ঘটেছে।

জিনা জানালো, তাদের সাফল্যের কথা।

'যাক,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'অন্তত একজনের ঠিকানা জানা গেল।'

দশ

'আজ আটাশে জুলাই,' সকালে উঠেই ঘোষণা করলো মুসা। 'যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়েছি আমরা এখনও। কাল বাদে পরশু চুরি করতে যাবে উইলের দল, অথচ এখনও জানতেই পারলাম না কে ওদের শিকার। এই কিশোর, কি করবো?'

'কিছুই না,' সহজ গলায় বললো কিশোর। 'উইলকে অনুসরণ করে যাবো। তারপর যেই ওরা চুরি করতে ঢুকবে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করবো।'

'দূর, ঠাট্টা করছো,' বললো রবিন।

'তো আর কি করবো?'

'কিছুই করার নেই?' জিনা বললো। 'যদি উইল নিজে না যায়? যদি ওর সহকারীদের দিয়েই কাজটা করায়? তখন?'

'ঠিক। তখন?' কথাটা ধরলো মুসা। 'তারমানে খামোকাই এতোগুলো দিন নষ্ট করলাম। ইস্, কতো জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম এ-ক'দিনে। গোবেল বীচের আশেপাশে সব এলাকা চেনা হয়ে যেতো।'

বেনকে খুঁজে বের করতে পারলে কাজ হতো,' বললো কিশোর। 'ওকে ছাড়া অ্যাকশনে যাবে না চোরেরা। আরও দু'দিন সময় তো আছে। দেখা যাক না কি হয়? সূত্র একটা পেয়েও যেতে পারি।'

সেদিনও গোবেল বীচ বাজারে গেল ওরা। গোবেল ভিলার ঘাটে নৌকা বাঁধতেই বেরিয়ে এলেন জিনার মা। ছেলেরা বাজারের দিকে যাচ্ছে শুনে বললেন, 'জিনা, পোস্ট অফিসটা একবার ঘুরে আসিস তো। একগাদা চিঠি লিখেছে তোর বাবা। এই যে নিয়ে যা।'

পোস্ট অফিসের ডাক বাক্সে চিঠি ফেলে সবে বেরিয়েছে জিনা, এই সময় একটা ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে থামলো তার সামনে। খুব বিনীত গলায় বললো, 'আমি এখানে নতুন এসেছি, পোস্টিং হয়ে। টেলিগ্রাফ বয়। দুটো টেলিগ্রাম ডেলিভারি দিতে হবে।'

হাসলো জিনা। বললো, 'ঠিকানা চেনো না, এই তো? কি নাম লিখেছে?'

জোরে জোরে পড়লো ছেলেটা, 'বারকেনস্টিন ব্যালার্ড উইলবারসন স্মিথ, প্যাটারসন প্লেস। আরেকটা বেনজামিন উইলিয়ামস, ফ্লাওয়ার কটেজ।'

দু'জনকেই চেনে জিনা। ছেলেটাকে বললো কোনদিকে কিভাবে যেতে হবে।

ধন্যবাদ জানালো ছেলেটা। সেই সঙ্গে বললো, 'নাম কি, অ্যাঁ? বারকেনস্টিন ব্যালার্ড উইলবারসন স্মিথ। দিনে একশোবার ওই নাম আওড়ালেই দশ বছর আয়ু কমে যাবে। হাহ্ হাহ্! তবে অন্য নামটা সহজ, আমার পছন্দও। কারণ আমার নামও বেনজামিন কিনা, বেন। যাই।' আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে সাইকেলে উঠে চলে গেল ছেলেটা।

পাথর হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো যেন জিনা।

তিন গোয়েন্দা গেছে বাজারের দোকানে, কয়েকটা জিনিস কিনতে।

'ছেলেটার নাম বেন,' বিড়বিড় করে রাফিয়ানকে বললো সে। 'শুনেছিস, রাফি? আবার বললো, নতুন এসেছে। নিশ্চয় ওর কথাই বলেছে চোরেরা।'

সেই সন্ধ্যায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালালো ওরা।

'যা বোঝা যাচ্ছে,' রবিন বললো। 'বেনকে দিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে চোরেরা। যাতে মহিলা বাড়ি ছাড়েন, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। সেই সুযোগে চুরিটা সেরে ফেলবে।'

'তারমানে কি দাঁড়ালো?' বললো মুসা। 'এখন থেকে বেনের পিছে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হবে আমাদের। টেলিগ্রাম ডেলিভারি দিতে গেলেই বুঝে ফেলবো, কোন্ বাড়িতে চুরি হবে। সাবধান হয়ে যাবো তখন।'

'আমার কাছে এতো সহজ মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা,' বলেই চুপ হয়ে গেল কিশোর।

যা-ই হোক, পরদিন বেনের পেছনে লাগলো ওরা। কোথায় কোথায় টেলিগ্রাম বিলি করে দেখলো।

কয়েকটা টেলিগ্রাম বিলি করলো বেন। তবে তার একটাও ম্যানর ফার্ম কিংবা ম্যানারস হাউসের নয়। সব ক'টাই টুরিস্টদের টেলিগ্রাম, হলিডে কটেজগুলোর ঠিকানায় এসেছে, ছুটি কাটাতে এসেছে যারা তাদের কাছে। এবং সবগুলোই গোবেল বীচের সীমানার মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যায়ও নিত্যদিনের মতোই আলোচনায় বসলো ওরা।

'আগেই বলেছি, এতো সহজ নয়,' বললো কিশোর। 'প্ল্যানটা অন্যরকম।'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

জানলে কি আর এতো ঘোরাঘুরি করতাম?'

তিরিশে জুলাই।

অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হলো গোয়েন্দারা। চারজনেই উত্তেজিত, তাদের উত্তেজনা সংক্রামিত হয়েছে কুকুরটার মাঝেও।

ঝর্নার ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে এলো মুসা। বললো, 'আজ সফল হতেই হবে আমাদেরকে!'

'আশায় আছি, দেখা যাক,' তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছে রবিন। 'কি ঘটবে তা-ই জানি না। কিভাবে কি করবো?'

সকালে প্রথমেই এসে হাজির হলো ওরা পোস্ট অফিসে। অফিস তখনও খোলেনি। দাঁড়িয়ে রইলো। আগেই এসেছে, তার কারণ, বেনকে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চায় না। টেলিগ্রাম নিয়ে কোথায় কোথায় যায় দেখতে হবে।

বছরের এই সময়টায় গোবেল বীচে টুরিস্টদের ভিড় থাকে। পথেঘাটে যেখানে সেখানে লোক দেখা যায়। ফলে বেনকে অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। তার নজরে পড়লো না ওরা।

পালা করে পিছু নিলো ওরা। প্রথমে মুসা। অন্যেরা অপেক্ষা করলো বেকারির সামনে। শুধু শুধু তো আর বসে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা করে লেমোনেড নিলো। রাফিয়ানকে দেয়া হলো একটা বানরুটি।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো মুসা। হতাশ হয়ে মাথা নাড়লো। 'মাত্র একটা টেলিগ্রাম বিলি করেছে, মিসেস বেলিন নামে এক মহিলার বোর্ডিং হাউসে। আরেকটা এক জেলের বাড়িতে। ব্যাস।'

জিনা উঠে দাঁড়ালো। 'এবার আমি যাবো।'

কিন্তু সেই যে ফিরে এসে পোস্ট অফিসে ঢুকেছে বেন, আর বেরোনোর নাম নেই।

বেরোলো অবশেষে। তার পিছু নিলো জিনা।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো দু'জনে। একজন পোস্ট অফিসের দিকে চলে গেল, আরেকজন এলো বেকারির দিকে। 'একটা টেলিগ্রামই বিলি করেছে গ্রামের এক বাড়িতে,' জানালো জিনা।

রবিন আর মুসা নানা মন্তব্য করলো, কিন্তু কিশোর একেবারে চুপ। নিজের ঠোঁটে চিমটি কাটছে শুধু। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

সারাটা সকাল গেল, দুপুর পেরোলো, বিকেলের দিকেও নতুন কিছু ঘটলো না। আর কোনো টেলিগ্রাম বিলি করতে গেল না বেন। ম্যানারস হাউস কিংবা ম্যানর ফার্মের দিকে যাওয়ার দরকারই পড়লো না তার।

পোস্ট অফিস যথাসময়ে বন্ধ হয়ে গেল।

'ভুল করেছি,' বললো জিনা। 'চোরের দলে নেই বেন। নিশ্চয় অন্য কোনো বেনের কথা বলেছে ওরা। ছেলেটার পেছনে অযথাই সারাটা দিন নষ্ট করলাম, তার চেয়ে বাড়ি দুটোর ওপর চোখ রাখা ভালো ছিলো।'

'হ্যাঁ, বোধহয় ভুলই হয়ে গেল,' রবিন বললো।

'এই কিশোর,' বন্ধুর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলো মুসা, 'তুমি কিছু বলছো না কেন? সেই সকাল থেকে চুপ করে আছো। কি ভাবছো?'

'অ্যাঁ...,' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো কিশোর। 'ভাবছি, এবার যাওয়ার সময় হলো...'

'দেখো, তোমার ওসব রহস্যময় কথাবার্তা একদম ভাল্লাগছে না এখন,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা। 'খোলাখুলি কথা বলো। কোথায় যেতে হবে?'

'কেন? বাড়ি দুটোর ওপর চোখ রাখতে হবে না?' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে তার আগে একবার বোর্ডিং হাউসে উঁকি দিয়ে দেখে যেতে হবে, উইল আছে কিনা।'

উইল নেই। মুসা গিয়ে সাহস করে তার দরজায় ঘন্টা বাজালো, ধাক্কা দিলো, জবাব এলো না। পরে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, উইল একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

'জলদি চলো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'সময় খুব কম। রবিন, স্যাণ্ডউইচগুলো আছে না? তাই দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নেবো। চলো, কুইক!'

দ্রুত সাইকেল চালিয়ে চললো গোয়েন্দারা। উত্তরে।

একটা বিশেষ জায়গায় এসে দু'ভাগে ভাগ হলো, রোজই যেখানে এসে হয়। আজ মুসা আর রবিনকে ম্যানর ফার্মে পাঠালো কিশোর। জিনা আর রাফিয়ানকে নিয়ে নিজে চললো ম্যানারস হাউসের দিকে। তবে রওনা হওয়ার আগে স্যাণ্ডউইচগুলোর সদ্ব্যবহার করে নিলো সবাই।

এগারো

রবিন আর মুসা যখন এসে ম্যানর ফার্মের কাছে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকলো, গোধূলি তখন শেষ। বাড়ির গেটের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইলো ওরা।

অনেকক্ষণ পর নড়ে বসতে গিয়ে মট্ করে একটা শুকনো ডাল ভাঙলো মুসা।

'চুপ!' বললো রবিন। 'অতো শব্দ করো না। সন্দেহ করবে।'

'কারা?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'কাউকেই তো দেখছি না।'

কথাটা সত্য। ঘন অন্ধকার। মিসেস জিনজারের কর্মচারী আর শ্রমিকেরা বিদায় হয়ে গেছে অনেক আগে, পুরো বাড়িটা এখন যেন ঘুমোচ্ছে।

বসে আছে তো আছেই দুই গোয়েন্দা। ঘটছে না কিছুই। অধৈর্য হয়ে উঠছে ওরা। চোর যদি না আসে? ম্যানর ফার্মেই যে আসবে তার কি নিশ্চয়তা আছে?

'দূর, খামোকা বসে আছি!' বলে উঠলো মুসা।

এবার আর চুপ করতে বললো না তাকে রবিন।

'এই অন্ধকারে কিছু দেখা যায়?' বলে গেল মুসা। 'কিচ্ছু দেখছি না। বেশি দূরে বসেছি আমরা। দেখতে হলে আরও কাছে যাওয়া দরকার। চলো।'

'যাওয়াটা কি উচিত হবে?'

'তো কি করবো? মাছিও তো নেই এখানে যে বসে বসে মারবো।'

'বেশ, চলো।'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেটের কাছাকাছি একটা খাদে গিয়ে নামলো দু'জনে। চারপাশে ঝোপঝাড়, কেউ দেখবে না ওদেরকে। তবে ওরাও কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

'না, এখানেও হবে না,' বললো রবিন। 'দেখতে হলে ফার্মের ভেতরেই ঢুকতে হবে। চলো, মুরগীর ঘরটার কাছে চলে যাই। ওখান থেকে মিসেস জিনজারের ঘরের ওপর চোখ রাখতে পারবো…'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না মুসার। কিন্তু তর্কও করলো না। উঠে দাঁড়ালো। 'চলো।'

অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোলো ওরা।

ফার্মের গেট বন্ধ।

আগেই দেখেছে ওরা, পুরো এলাকাটাকে ঘিরে দেয়া হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। এতো ঘন করে তার লাগানো হয়েছে, কেউ ঢুকতে পারবে না।

'কোনখান দিয়ে ঢুকবো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'দেখি কোনো ছেঁড়াটেড়া আছে কিনা।'

'হ্যাঁ, তোমার জন্যে বানিয়ে রেখে দিয়েছে, যাতে ঢুকতে পারো।'

'চলোই না, দেখি। থাকতেও তো পারে। আর না থাকলে তখন অন্য উপায়ের কথা ভাববো।'

রবিনের কথাই ঠিক। এক জায়গায় দেখা গেল, কয়েকটা তার ছেঁড়া। একটা ফোকর মতো হয়ে আছে। সহজেই তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারবে ওরা।

টর্চ নিভিয়ে ঢুকে পড়লো রবিন।

তার পেছনে মুসা।

স্তব্ধ নীরবতা ফার্মইয়ার্ডের ভেতরে।

কয়েক পা এগিয়ে রবিন বললো, 'ওই যে, একটা ঠেলাগাড়ি। ওটার নিচে লুকিয়ে থাকবো।'

'ওটার তলায়!' বিড়বিড় করলো মুসা। 'নোংরা হয়ে যাবো একেবারে। সেদিন দেখেছি, ওটা দিয়ে মুরগীর পায়খানা ফেলে।'

'অতোসব বাছবিচার করতে নেই,' কিশোরের অনুকরণে গম্ভীর কণ্ঠে বললো রবিন।

'তারচে' ওই মুরগীর খোঁয়াড়ের পেছনে লুকাই না কেন? কে দেখতে…' কথা শেষ হলো না। তার আগেই ধাতব কিসে যেন পা দিয়ে বসলো। ঠন করে আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ চিৎকার করে উঠলো একটা মোরগ।

তারপর যা হয়। একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করলো সব ক'টা মোরগ-মুরগী। কান ঝালাপালা করে দিলো। এমন বিকট শব্দ, মুসার মনে হলো, মরা মানুষও বুঝি জেগে যাবে। 'খাইছে! সর্বনাশ হয়েছে! এখুনি ছুটে আসবে মিসেস জিনজার। চলো, পালাই!…এই মুরগী হারামজাদীরা! চুপ কর!'

ধমক শুনে গলার জোর আরও বাড়িয়ে দিলো পাখিগুলো।

পালানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো দু'জনেই।

কিন্তু পা বাড়ানোর আগেই জ্বলে উঠলো উজ্জ্বল আলো। দু'জন লোক ছুটে আসছে তাদের দিকে। পালানোর পথ বন্ধ।

'চোরেরা! আজ পেয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠলো একজন।

'ভেবেছিলে কেউ তোমাদের দেখে না, না?' বললো আরেকজন। 'রোজই এসে ঘাপটি মেরে থাকো ফার্মের ধারে। ভেবেছো আমরা সব কানা।'

রবিন আর মুসার হাত চেপে ধরলো দু'জনে।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো মুসা। পারলো না। তাকে যে লোকটা ধরেছে, তার গায়ে যেন মোষের জোর।

'বেড়ার মধ্যে ছেঁড়া, আহা, কি আনন্দ!' বললো প্রথম লোকটা। 'ভেবেছো, তোমাদের ভাগ্যেই ছিঁড়ে রয়েছে বেড়া, না? গাধা কোথাকার। মিসেস জিনজারকে এতো বোকা ভেবেছো? এতো বেখেয়াল যে বেড়ায় ছেঁড়া রেখে দেবেন? ছিঁড়ে রাখতে বলেছেন আমাদেরকে, তাই রেখেছি। বুঝেছো?'

'যাতে সহজেই তোমরা ভেতরে ঢুকতে পারো,' বললো অন্যজন। 'আর পাকড়াও করতে পারি আমরা। বুদ্ধিটা ভালো হয়েছে না?'

'তা কেন ঢুকেছো, বাবারা? মুরগী চুরি করতে?'

'না!' মরিয়া হয়ে বললো মুসা। 'আমরা চোর নই।'

'তাহলে কি? রাতের বেলা মুরগীর খোঁয়াড়ের কাছে কি করতে এসেছো?'

'চুরি করতে নয়।'

'তাহলে কি করতে?' পেছন থেকে শোনা গেল মহিলা কণ্ঠ। এগিয়ে এলেন মিসেস জিনজার। 'খুব কাঁচা চোর তোমরা, ছেলেমানুষ তো। সেদিন আমার সাথে কথা বলার ছুতোয় যখন ফার্মে ঢুকলে, তখনই বুঝেছি কোনো কুমতলব আছে। তারপর কয়েক দিন ধরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি ফার্মের ধারে। সন্দেহ হয়েছে আমার। তাই এদের বলে রেখেছি,' শ্রমিক দু'জনকে দেখালেন তিনি। 'বেড়ার এক জায়গায় ছিঁড়ে রাখতে। আর রাতে পাহারা দিতে। জানি, তোমরা ঢুকবেই।'

রাগে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো মুসার। কিশোরের ওপরও ভীষণ রাগ হলো। কি দরকার ছিলো এসবের? 'শয়তানের বাড়া' একেকটা বুড়ি। ওদের জিনিস চুরি যাওয়াই উচিত। গেলেই ভালো হতো। ওদের ভালো করতে গিয়ে খামোকা এখন চোর অপবাদ!

'আপনি ভুল করছেন, মিসেস জিনজার,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে রবিন। 'আমরা চোর নই। বরং চোরের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে এসেছি। একদল চোর রত্ন চুরি করার প্ল্যান করেছে। আজ রাতেই করবে ওরা। সেটাই ঠেকাতে এসেছি আমরা। সেদিন এসেছিলাম আপনাকে সতর্ক করতে। আপনি তো কথাই শুনলেন না।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ করলেন মিসেস জিনজার।

'কেন মিছিমিছি কথা বলছো, রবিন?' রাগে কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ। 'বোঝাতে পারবে না। ডিম বেচে বেচে মাথাই হয়ে গেছে ঘোলা ডিমের মতো…সব দোষ কিশোরের!'

'দেখো ছেলে, ভদ্রভাবে কথা বলো,' শীতল কণ্ঠে বললেন মিসেস জিনজার।

'নইলে কি করবেন?'

'শেরিফকে ফোন করবো। এমনিতেও করতাম…'

'যান করেন গিয়ে!' শেরিফের ব্যাপারে তেমন উদ্বিগ্ন নয় মুসা। ওরা এলে, অন্তত বোঝাতে পারবে যে চুরি করতে ঢোকেনি। আর শেরিফ বিশ্বাস না করলে ধরে হাজতে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে মুক্তির একটা ব্যবস্থা হবেই। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া জিনার বাবা তো আছেনই।

মুসার মতো মাথা গরম করলো না রবিন। সে বুঝতে পারছে, এতো কষ্ট করেও সব পণ্ড হতে চলেছে। ম্যানর ফার্মে চুরির সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, এতো সব হৈ-চৈ আর শেরিফকে আসতে দেখলে পালাবে চোরেরা। আর আসবে না। ধরা যাবে না তাদেরকে। তাই বোঝানোর চেষ্টা করলো মিসেস জিনজারকে, 'দেখুন, ম্যাডাম, আমরা চোর নই। গোয়েন্দা। আপনার লোকদের বলুন আলো নিভিয়ে ফেলতে, আর যেমন পাহারা দিচ্ছিলো, তেমনি দিতে। চোরেরা যদি ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে আসবে। আপনার সেলার থেকে রত্ন চুরি করতে।'

মুখের ওপর হেসে উঠলেন মহিলা। 'দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি তো হে তোমার, ছোকরা! তবে অপরাধ যারা করে, তাদের বুদ্ধি কিছু বেশিই হয়। তোমার এই রূপকথা শেরিফকে শুনিও। দেখো, বিশ্বাস করাতে পারো কিনা।'

'ধ্যাত্তোর, রবিন!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'কাকে কি বোঝাচ্ছো! চুপ করে থাকো।'

'এই ছেলে, এতো তেজ দেখাচ্ছো কেন?' ধমকে উঠলেন মিসেস জিনজার। 'চুরি তো চুরি আবার সিনাজুরি,' শ্রমিকদের দিকে ফিরলেন। 'ধরে নিয়ে এসো। ছুটতে না পারে। আমি শেরিফকে ফোন করছি।'

বারো

ছায়ায় লুকিয়ে বসে আছে কিশোর, জিনা আর রাফিয়ান। একেবারে চুপ।

জিনার এখনও ধারণা, মিসেস কুইল কোনো বেআইনী কাজ করেন। নইলে এতো সতর্ক থাকেন কেন? তাঁর বাড়িতে চোর আসবে না। যাবে আসলে—যদি যায়—মিসেস জিনজারের ওখানে। এখানে বসে বসে অযথা সময় নষ্ট করছে ওরা। অধৈর্য হয়ে নখ কামড়াতে শুরু করলো একসময়। কথা বলতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল

কুকুরটা। মৃদু গোঁ গোঁ করে উঠলো। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তাকে চুপ করতে বললো জিনা।

'আসছে! ওই যে!' ফিসফিস করে বললো কিশোর।

পথ ধরে আসতে দেখা গেল একটা আবছা মূর্তিকে। কিছুটা পেছনে আরও দু'জন। আরও কয়েক পা এগিয়ে একটা ঝোপে ঢুকে গেল পেছনের দু'জন।

এগিয়ে আসছে আগের মূর্তিটা। চিনতে পেরে ভুরু কুঁচকে ফেললো জিনা। বেন, বেনজামিনই, টেলিগ্রাফ বয়! ঠিকই সন্দেহ করেছিলো। এই বেনই উহল আর কিউটের সহকারী। আর মিসেস কুইলই তাহলে ওদের শিকার।

পাথরের মূর্তি হয়ে আছে যেন কিশোর আর জিনা। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরে, উত্তেজনায়। এরপর কি ঘটবে?

বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজালো বেন।

সিঁড়ির মাথার আলো জ্বললো। দরজায় দেখা দিলেন মিসেস কুইল। 'কে?'

'টেলিগ্রাম, ম্যাডাম।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগলেন মিসেস কুইল। গেটের কাছে এসে তাকালেন টেলিগ্রাফ বয়ের দিকে। চোখে সন্দেহ। ওরকম একটা ক্যাপ আর ব্যাগ যে-কেউ যোগাড় করে নিয়ে বয় সেজে আসতে পারে।

'কই, দেখি?'

'এই যে। আর এই রিসিপ্ট। সই করতে হবে।'

বয়ের হাতে টেলিগ্রামের হলুদ কাগজটা দেখলেন মিসেস কুইল, রিসিপ্ট বুকটাও দেখলেন। না, আসলই মনে হচ্ছে। ক্যাপ আর ব্যাগ জোগাড় করা যায়, কিন্তু ওই রিসিপ্ট বুক···তাছাড়া টেলিগ্রামে কি লিখেছে কে জানে? এখুনি হয়তো জবাব লিখে দিতে হতে পারে।

টেলিগ্রামের কাগজ আর রিসিপ্ট বুক বেনের হাতেই রইলো।

মিসেস কুইল বললেন, 'দাঁড়াও, চাবি নিয়ে আসি।'

আবছা অন্ধকারে একে অন্যের দিকে তাকালো কিশোর আর জিনা। মিসেস কুইলকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে নয়, দরজা খোলানোর জন্যে বেনকে ব্যবহার করছে উহল আর কিউট। আরও কারণ আছে, সেটা পরে বুঝতে পারলো গোয়েন্দারা।

কি করবে এখন, ভাবছে কিশোর। চেঁচিয়ে সাবধান করবে মিসেস কুইলকে? কিন্তু রেগে গিয়ে চোরেরা যদি ওদেরকেই আক্রমণ করে বসে তখন? অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। দেখাই যাক না, কি হয়।

চাবি নিয়ে এসে গেট খুলে দিলেন মিসেস কুইল।

তারপর এতো দ্রুত ঘটে গেল সব ঘটনা, কিশোর আর জিনাও থ হয়ে গেল।

গেটের ভেতরে ঢুকেই ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে মিসেস কুইলের মাথায় ছুঁড়ে মারলো বেন। ওর মারা দেখেই বোঝা গেল, অসংখ্যবার প্র্যাকটিস করে এসেছে।

একই সময়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলো উইল আর কিউট। জাপটে ধরলো মহিলাকে, চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে মুখ আর গলায় পেঁচিয়ে ফেললো। তারপর টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললো বাড়ির ভেতরে।

'সরি, লেডি,' শোনা গেল কিউটের হাসিহাসি কণ্ঠ। 'আর কোনো উপায় ছিলো না। আহা, এতো নড়াচড়া করছেন কেন? ইস্‌সি, লাথি মেরে আমার ঠ্যাঙই ভেঙে দিলেন যে। থামুন, থামুন।...তা কি ভেবেছিলেন? আপনার চোর ঠেকানোর ঘন্টি আমাদের থামাতে পারবে? পারতো। যদি গেট ডিঙিয়ে আপনার বাগানে ঢুকতাম। বাড়ি তো না, একটা দুর্গ বানিয়ে রেখেছেন। অন্য কোনোভাবে আমরা ঢোকার চেষ্টা করলেই টের পেয়ে যেতেন, ফোন করে দিতেন শেরিফকে। কাজেই কষ্টটা দিতেই হলো...'

'এই কিউট, থামবে?' ধমক দিলো উইল। 'যেখানেই যাও, খালি বকবক।'

মহিলাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল চোরেরা।

দ্রুত ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। 'জিনা, জলদি যাও! সোজা শেরিফের অফিসে। ওদেরকে ঠেকানোর এখন এই একটাই উপায়। কুইক!'

দ্বিধা করছে জিনা। 'তুমি কি করবে?'

'আমি আছি। রাফিয়ান থাকুবে, ভয় নেই। ও আমাকে সাহায্য করবে। তুমি আসার আগেই যদি চোরেরা বেরিয়ে যায়, পিছু নেবো।'

'ডেনজারাস...'

'সেটা তখন দেখা যাবে। যাও।'

'যদি গাড়ি নিয়ে এসে থাকে?'

'এঞ্জিনের শব্দ তো শুনিনি। ...আহ্, তর্ক করো না, যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যতো তাড়াতাড়ি পারো গিয়ে নিয়ে এসো। রাফি আছে, আমার কিছু হবে না।'

আর দেরি করলো না জিনা। সাইকেলে চেপে রওনা হয়ে গেল।

চুপ করে বসে থাকতে পারলো না কিশোর। ভেতরে কি হচ্ছে দেখার জন্য বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে, সাবধানে পা টিপে টিপে এগোলো গেটের দিকে। কান খাড়া, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কিন্তু কোনো শব্দ কানে এলো না, অন্ধকারে দেখতেও পেলো না কিছু। সিঁড়ির মাথার বাতি নিভিয়ে দিয়েছে চোরেরা। গাঢ় অন্ধকারে আবার যেন ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়িটা। ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সে। চোরেরা কাজ হাসিল করে পালিয়ে যাওয়ার আগে শেরিফকে নিয়ে আসতে পারবে তো জিনা?

জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে জিনা। এর চেয়ে জোরে আর সম্ভব না। একা রয়ে গেছে কিশোর। আর তার কথা কিছুই বলা যায় না। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে বসতে পারে। তাহলে হয়তো পড়বে ভীষণ বিপদে। ইস্, সাইকেলটা আরও জোরে চলছে না কেন!

'অফিসে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হয়,' ভাবছে জিনা। 'শেরিফকে কোনমতে

বোঝাতে পারলে, তাঁর গাড়িতে করে ফিরতে আর দেরি হবে না।'

গাঁয়ের প্রান্তে শেরিফের অফিস।

পৌঁছলো অবশেষে জিনা। দরদর করে ঘামছে। এতো জোরে হাঁপাচ্ছে, হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই তার, সাইকেল রেসে রেকর্ড টাইম ব্রেক করে এসেছে।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। কয়েকবার ঘন্টা বাজালো সে। দরজায় ধাক্কা দিলো। তারপর দমাদম কিল মারতে লাগলো।

কেউ জবাব দিলো না।

ব্যাপার কি? অবাক হলো জিনা। চেষ্টা থামালো না।

শব্দ শুনে পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিলো একটা মুখ। 'কি হয়েছে?'

'শেরিফকে ডাকতে এসেছি। জবাব নেই।'

'নেই তো কেউ, জবাব দেবে কি? এই তো খানিক আগে লোকজন নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। মনে হলো জরুরী।'

'কোথায় গেছে, বলতে পারবেন?'

'ম্যানর ফার্মে। অফিসেই বসেছিলাম। শেরিফ ছুটিতে, ডেপুটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। এই সময় মিসেস জিনজারের ফোন এলো।'

'ম্যানর ফার্ম? মিসেস জিনজার?' অস্বস্তিতে ভরে গেল জিনার মন। 'কেন?'

'দু'টো চোর নাকি ধরেছে, মুরগী চোর। বেশি জরুরী দরকার হলে ওখানে যাও, ডেপুটিকে পেয়ে যাবে। গুড লাক,' বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

স্তব্ধ হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো জিনা, যেন পায়ে শিকড় গজিয়েছে। ঠিকমতো ভাবতে পারছে না কিছু।

মাথা ঝাড়া দিলো। ঘুরে লাফ দিয়ে নামলো বারান্দা থেকে। আবার চড়ে বসলো সাইকেলে। আরেকবার রেকর্ড টাইম ব্রেক করতে হবে। দাঁতে দাঁত চেপে প্যাডাল ঘুরিয়ে চললো।

বহু যুগ পরে যেন দেখা গেল ম্যানর ফার্মের আলো। আলোকিত হয়ে আছে সারা বাড়ি। মুসা আর রবিন নিশ্চয় অন্ধকার কোনো ঝোপে ঘাপটি মেরে বসে আছে। অবাক হয়ে ভাবছে, বাড়ির ভেতরে কি হচ্ছে? কল্পনাই করলো না জিনা, যে ওরা দু'জনই ধরা পড়েছে।

গেট খোলা। সাইকেল চালিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লো জিনা। লাফ দিয়ে নামলো সাইকেল থেকে। স্ট্যাণ্ডে তুলে দৌড় দিলো সদর দরজার দিকে। কেউ বাধা দিলো না তাকে।

হলরুমের দরজায় গিয়েই চমকে উঠলো জিনা।

ডেপুটি শেরিফ আছেন ওখানে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা আর রবিন। আসামী ওরাই, কোনো সন্দেহ নেই।

'মুসা! রবিন!' বলতে বলতে ঢুকে পড়লো জিনা। 'কি হয়েছে?'

'আমরা নাকি মুরগী চোর,' জবাব দিলো মুসা। 'কি আর বলবো ওদের কথা...'

ভুরু কুঁচকে জিনার দিকে তাকালো ডেপুটি। 'তুমি কে?'

নিজের পরিচয় দিলো জিনা।

ওদেরকে বোঝাতে অনেক সময় লাগলো। পুরো গল্প শোনাতে হলো।

একটা সময় জিনা ভাবলো, মুরগী চোরের সহকারী হিসেবে তাকেও গ্রেফতার করবেন বুঝি শেরিফ। কিন্তু অবশেষে সন্দেহ দূর হলো তাঁর চোখ থেকে।

মিসেস জিনজারেরও মনে হলো, মেয়েটা সত্যি কথাই বলছে।

'প্লীজ!' কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো জিনা। 'বিশ্বাস করুন। চোরের সহকারী হলে কি ইচ্ছে করে এখানে ধরা দিতে আসতাম? জলদি যেতে হবে ম্যানারস হাউসে। আমার বন্ধু কিশোর নিশ্চয় এতোক্ষণে মহাবিপদে পড়েছে, আর মিসেস কুইলও। দেরি করলে তিন চোরকে ধরার একটা দারুণ সুযোগ হারাবেন আপনি।'

এই বিপদের মাঝেও মনে মনে হাসলো রবিন। চমৎকার একখানা লেকচার দিয়েছে জিনা।

আর দ্বিধা করলেন না ডেপুটি, দেরিও করলেন না। মিসেস জিনজারকে গুডবাই জানিয়ে তাঁর লোকজন, মুসা, রবিন আর জিনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে।

তের

একভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো কিশোর।

গেট বন্ধ করার দরকার মনে করেনি চোরেরা। খোলাই ফেলে গেছে। কিছু শোনা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না। এভাবে আর কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? রাফিয়ানকে নিয়ে পায়ে পায়ে ঢুকে পড়লো সে। দুরুদুরু করছে বুক, ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। প্রচণ্ড কৌতূহলই এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে।

বাড়ির সামান্য দূরে থামলো সে। নিচতলার একটা ঘরের জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। রাফিয়ান দাঁড়িয়ে আছে তার পায়ের কাছে। নীরব। সতর্ক।

লম্বা দম নিলো কিশোর। ফিসফিসিয়ে বললো, 'রাফি, আয়।'

জানালাটার দিকে এগোলো সে। বাগানের ঘাস এড়িয়ে রইলো। কে জানে, কোন্‌খানে তার পাতা আছে, পায়ে লেগে শব্দ হয়ে যায়! খুব সাবধানে একটা ফ্লাওয়ার বেডের ধার ঘেঁষে নিরাপদেই এসে দাঁড়ালো জানালার কাছে। উঁকি দিলো ভেতরে।

হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো। উহল, কিউট, বেন সবাই আছে ঘরে, একটা চেয়ার ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চেয়ারে বসিয়ে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে মিসেস কুইলকে।

জানালার কাচের পাল্লা বন্ধ, তবে পুরোপুরি নয়, কিছুটা ফাঁক আছে। ফলে ভেতরের কথাবার্তাও কানে আসছে কিশোরের।

'কাপুরুষের দল!' বলছেন মিসেস কুইল। 'লজ্জা করে না? অসহায় একজন মেয়েমানুষকে তিনজনে মিলে…'

'ওসব কথা বাদ দিন,' হাত নেড়ে বললো উইল। 'আসল কথায় আসুন। জিনিসটা কোথায়? বলুন। তাড়াতাড়ি করুন।'

'কি বলছো, তাই তো বুঝতে পারছি না। ভালো চাইলে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে এক্ষুণি বেরোও।'

হেসে উঠলো কিউট। 'বোকা বানাতে পারবেন না আমাদেরকে, ম্যাডাম। ভালোমতো খোঁজখবর নিয়েই এসেছি আমরা। আমরা জানি, কুইন ভিকটোরিয়ার উপহার দেয়া নেকলেসটা আপনার কাছেই আছে। আপনার এক আত্মীয়াকে দিয়েছিলো। তাতে পান্না বসানো আছে অনেকগুলো। দেখলেন তো? সব কিছু জানি। এখন বলে ফেলুন, কোথায় রেখেছেন বাক্সটা।'

'এতো কিছুই যখন জানো, বাক্সটা কোথায় আছে জেনে আসোনি কেন? যাও, থাকলে খুঁজে বের করোগে।'

'চমৎকার!' মনে মনে হাসলো কিশোর। 'মহিলার সাহস আছে। রাফিরে, কি বলবো, ব্যাটাদের চেহারা যা হয়েছে না…'

অন্ধকারে লেজ নাড়লো রাফিয়ান। খালি আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কিশোর ইশারা করলেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে চোরদের ওপর।

ঘরের ভেতরে নাটক জমেছে ভালো।

রাগে খেঁকিয়ে উঠলো উইল। 'দেখুন, ভালো চান তো বলুন। নইলে পস্তাবেন বলে দিচ্ছি।'

'কি করে কথা বলাতে হয় জানি আমরা,' বললো বেন।

'পুঁচকে ছোঁড়া, বলে কি?' নাক কুঁচকালেন মিসেস কুইল। 'বলো না, দেখি? হারামজাদা! এক চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো।' যদিও হাত নাড়তে পারলেন না তিনি।

হেসে উঠলো আবার কিউট। 'হাতই তো নাড়তে পারছেন না…যাকগে, ম্যাডাম, বলে ফেলুন কোথায় রেখেছেন।'

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না,' বললো উইল। 'এসো খুঁজে দেখি। না পেলে তখন এসে দেখাবো মজা। বলবে না আবার। হুঁহ!'

আরেক ঘরে চলে গেল তিন চোর।

খানিক পরে দোতলায় দুড়ুম-দাড়ুম শব্দ শুরু হলো।

কিশোর বুঝলো, হারটা খুঁজছে চোরেরা। 'রাফি, তুই থাক। আমি ভেতরে ঢুকছি।

ডাকলেই চলে আসবি।' বলতে বলতেই জানালার চৌকাঠে উঠে বসলো সে। ঠেলা দিয়ে খুললো পাল্লা। তার ওপর নজর পড়তেই বড় বড় হয়ে গেল মিসেস কুইলের চোখ। ঠোঁটে আঙুল রেখে শব্দ না করতে ইশারা করলো কিশোর। আস্তে করে নামলো। নিঃশব্দে এগোলো।

'যা ভেবেছিলাম,' বলে উঠলেন মিসেস কুইল। 'তখনই সন্দেহ করেছিলাম, তোমরাও আছো এর মধ্যে।'

'আস্তে কথা বলুন,' চট্ করে দরজার দিকে তাকালো কিশোর, যেটা দিয়ে গেছে চোরেরা। 'আমি ওদের দলে নেই। সেদিন হুঁশিয়ার করতেই এসেছিলাম আপনাকে, শুনলেন তো না।'

সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন মিসেস কুইল। এই প্রথম বুঝলেন, মিথ্যে বলছে না ছেলেটা। ইস্, মস্ত ভুল হয়ে গেছে ওদেরকে শত্রু ভেবে, ওদের কথা না শুনে বোকামি হয়েছে। সত্যিই সেদিন সাহায্য করতে এসেছিলো ওরা। 'হ্যাঁ, ভুলই হয়ে গেছে!' নিচু কণ্ঠে বললেন। 'শোনা উচিত ছিলো তোমাদের কথা। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমারই দোষ। তুমি জলদি পালাও। ওরা দেখলে বিপদে পড়ে যাবে।'

হাসলো কিশোর। ভয়ের লেশমাত্র নেই চেহারায়। 'ভাববেন না, কিছুই করতে পারবে না ওরা। জিনা গেছে শেরিফকে আনতে। ওই যে, যে মেয়েটাকে ধরে গ্যারেজে আটকে ছিলেন...'

'আর লজ্জা দিও না!' তাড়াতাড়ি বললেন মিসেস কুইল। কোমর থেকে আট ফলার সুইস নাইফটা খুললো কিশোর। দড়ি কাটতে গেল।

'না না,' মানা করলেন মিসেস কুইল। 'কেটো না।'

অবাক হলো কিশোর। 'মানে?'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। শেরিফকে আনতে গেছে তো? ঠিক আছে। আমি চাই চোরেরাও ধরা পড়ুক, আমার জিনিসও বাঁচুক। আমি বাঁধা থাকলে ওরা বুঝতে পারবে না যে কেউ ঢুকেছিলো। তুমি হারটা নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে যাও। ওরা সারা বাড়ি খুঁজেও পাবে না, বার বার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আমি ওদেরকে আটকে রাখবো।...কিন্তু বুঝতে পারছি না, তোমাকে বলা ঠিক হবে কিনা?'

'আমি নিয়ে পালাবো ভাবছেন?'

'না। বিপদে ফেলবো কিনা ভাবছি।'

'বলে ফেলুন। কিছুই হবে না আমার। এরকম কাজ আরও করেছি।'

তবু দ্বিধা করছেন মহিলা।

'জলদি বলুন,' অধৈর্য হয়ে বললো কিশোর। 'সময় কম। ওরা যে কোনো সময় চলে আসতে পারে।'

মনস্থির করে নিলেন মিসেস কুইল। 'বেশ। ওরা এখন শোবার ঘরে ব্যস্ত। এই সুযোগে বের করে নিয়ে পালাও। সিঁড়ি দিয়ে সোজা চিলেকোঠায় উঠে যাবে। ছাতের বাঁ দিকে বড় একটা বীম আছে। বীমের একটা খোড়লে রেখেছি বাক্সটা। যাও। খুব সাবধান। তোমার কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না কোনোদিন।'

শেষ কথাটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো না কিশোর, চলে এলো জানালার কাছে। রাফিকে বললো দরজার কাছে আসতে, হাত নেড়ে বোঝালো কোনদিকে আসতে হবে। বলেই চলে এলো সদর দরজার কাছে। পাল্লা খুলে দেখলো ঠিক হাজির হয়েছে বুদ্ধিমান কুকুরটা।

রাফিয়ান ভেতরে ঢুকতেই আবার দরজা ভেজিয়ে দিলো কিশোর। ওকে নিয়ে ছুটলো সিঁড়ির দিকে। একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙাতে লাগলো। তাকে অনুসরণ করলো রাফিয়ান।

তবে কাজটা নিঃশব্দে করতে পারলো না। একতলার পরের সিঁড়িগুলো কাঠের, পুরনো। মচমচ করে উঠলো। অনেক চেষ্টা করেও আওয়াজ না করে উঠতে পারলো না ওরা।

চিলেকোঠার দরজার কাছে পৌঁছে গেল। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললো পাল্লা। কিঁচকিঁচ করে উঠলো পুরনো মরচে ধরা কব্জা। কান পাতলো কিশোর। এখনও শোবার ঘরেই খুঁজছে চোরেরা, শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সুইচবোর্ডটা খুঁজে বের করে আলো জ্বাললো সে। পুরানো, ট্রাঙ্ক, কাঠের বাক্স, আর মলাটের বাক্সের স্তূপ হয়ে আছে। ছাতে কাঠের মোটা মোটা কড়িকাঠ। ছোট একটা টুল টেনে এনে দরজার বাঁ পাশে রেখে তাতে উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেলো কড়িকাঠটার। ওটার মাথা যেখানে দেয়ালে ঢুকেছে ঠিক তার কাছেই একটা ফোকর। ভেতরে হাত ঢুকিয়েই আনন্দে উজ্জ্বল হলো মুখ। বের করে আনলো জিনিসটা।

একটা বাক্স।

কাঁপা কাঁপা হাতে খুললো বাক্সের ডালা।

বাল্বের আলো লেগে জ্বলে উঠলো যেন সবুজ আগুন! অসংখ্য ছটা, চোখ ধাঁধিয়ে দিলো যেন। এতো সুন্দর জিনিস খুব কমই দেখেছে কিশোর। স্পেনের রানীর উপহার সে-কি আর যেমন তেমন জিনিস হবে?

টুল থেকে নামলো কিশোর। এতোই মুগ্ধ হয়েছে, রাফিয়ানকে দেখিয়ে বললো, 'দেখ রাফি, কি জিনিস! কখনও দেখেছিস এরকম?'

ঠিক এই সময় কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। উঠে আসছে চোরেরা।

ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেল কিশোর। কি করবে? নিশ্চয় ওরা তার ওঠার শব্দ শুনতে পেয়েছে। দেখতে আসছে এখন।

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো রাফিয়ান। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। চাপা গরগর করে উঠলো।

দ্রুত চারদিকে তাকালো কিশোর। হারটা লুকানোর জায়গা খুঁজছে। একটা জায়গাও পছন্দ হলো না। বেরিয়ে যাওয়ার পথ নেই, একমাত্র দরজা ছাড়া। আর মাথার অনেক ওপরে একটা স্কাইলাইট আছে, ওটার নাগালই পাবে না, এমনকি টুলের ওপর দাঁড়িয়েও না।

আর সময় নেই। চলে আসছে ওরা।

কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে!

চোদ্দ

উঠে আসছে চোরেরা। হুঁশিয়ার হওয়ার প্রয়োজনই বোধ করছে না। মচমচ করছে সিঁড়ি।

'বললাম তো ওপরে আওয়াজ শুনেছি,' বেনের কণ্ঠ। 'ওই যে দেখুন, দরজায় আলো।'

'হুম!' কিউট বললো। 'ঠিকই বলেছো। তাহলে বাড়িতে আরও লোক আছে।'

'দেখি, আমি আগে যাই,' বলে উঠলো উইল।

সে-ই প্রথম ঢুকলো চিলেকোঠায়। তার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বিশাল এক কুকুর। আরেকটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো। গাল দিয়ে উঠলো উইল, পরক্ষণেই হেসে উঠলো। 'এই, দেখে যাও তোমরা। একটা ছেলে। লুকিয়ে আছে, বোধহয় ভয়ে।'

উঠে এলো কিউট আর বেন।

ভুরু কোঁচকালো টেলিগ্রাফ বয়। 'ওকে তো চিনি আমি! মেয়েটার সঙ্গে দেখেছি। আরও দু'টো ছেলে ছিলো সঙ্গে। ...এই, তুমি এখানে কি করছো?'

'মিসেস কুইলের কেউ হবেটবে আর কি,' বললো কিউট। 'ভয়ে লুকিয়ে আছে।'

উইলের চোখ পড়লো কড়িকাঠের নিচে টুলটার ওপর। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখ। 'আরি আরি, কাণ্ড দেখো! ও মিসেস কুইলের কিছু হয় না। হার চুরি করতেই এসেছে। পেয়েও গেছে।...ওই যে, বাক্স!'

দৃশ্যটাই এমন, দেখেই বুঝে গেছে চোরেরা, যে হার চুরি করতে এসেছে কিশোর। ধুলোয় ঢাকা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে, সামনে ছোট টুল, ওটার পায়ার কাছে পড়ে রয়েছে গহনার বন্ধ বাক্সটা।

'ওই ফোকরে পেয়েছো, না?' হাত তুলে কড়িকাঠ দেখালো উইল। 'গুড। দাও।'

ছোঁ মেরে মেঝে থেকে বাক্সটা তুলে নিলো কিশোর। 'না, পাবে না,' হাত নিয়ে

গেল পেছনে। বাক্সটা আড়াল করলো।

'ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ,' হাসলো উইল। 'রাখতে পারবে? আমরা তিনজন। একজনের সঙ্গেই পারবে না। দাও।'

পিছিয়ে গেল কিশোর।

এগোলো উইল। তার দু'পাশ থেকে এগোলো অন্য দু'জন। কোণঠাসা করে ফেললো কিশোরকে।

বাক্সটা না দেয়ার অনেক চেষ্টা করলো কিশোর। কিন্তু রাখতে পারলো না। কেড়ে নেয়া হলো তার কাছ থেকে।

খুললো কিউট।

দেখার জন্যে গলা বাড়িয়ে এলো বেন।

শূন্য বাক্স!

চোখ গরম করে কিশোরের দিকে তাকালো উইল। গর্জে উঠলো, 'হারটা কোথায়? জলদি দাও। নইলে ভালো হবে না।'

'হার?' অবাক মনে হলো কিশোরকে। 'তাই তো! খালি!'

'দেখো, বেশি চালাকি করো না। দাও।'

'কি বলছেন? বাক্স খুলিইনি আমি,' ভালো অভিনেতা কিশোর, একসময় টেলিভিশনে অভিনয় করে প্রচুর নাম কামিয়েছে।

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো উইল। তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললো, 'খোঁজো। সারা ঘর খোঁজো। লুকালে এই ঘরেই কোথাও লুকিয়েছে।'

প্রথমেই কিশোরের পকেট দেখলো চোরেরা। তারপর তার শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেললো। জাঙ্গিয়ার ভেতরে হাত দিতে গেল বেন।

ঠাশ করে চড় মারলো কিশোর। 'হারামজাদা! কানা নাকি? দেখতে পাস না?'

ক্ষণিকের জন্যে থ হয়ে গেল বেন। পরমুহূর্তেই ঘুসি বাগিয়ে এগোলো।

একটানে কোমর থেকে আট ফলার ছুরিটা খুলে নিলো কিশোর। বাঁকা চোখা একটা ফলা খুলে বাগিয়ে ধরে বললো, 'আয়, চোখ গেলে দেবো।'

থমকে গেল বেন।

'এই, কি শুরু করেছো?' বেনকে ধমক দিলো উইল। 'ঠিকই তো বলেছে। জাঙ্গিয়ার মধ্যে থাকলে তো বোঝাই যেতো। খোঁজো, অন্য জায়গায় খোঁজো।'

'দেখে নেবো!' শাসালো বেন। 'কাজটা সেরে নিই আগে।'

'আরে যা যা, কতো দেখলাম তোর মতো...,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ বাঁকালো কিশোর।

সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ওরা। প্রত্যেকটা ট্রাঙ্ক, বাক্সের ভেতরে দেখলো।

উল্টে, ছড়িয়ে তছনছ করে ফেললো। ঘরের প্রতিটি খাঁজ, ফোকর, গর্ত দেখলো। হারটা থাকতে পারে, সম্ভাব্য এমন কোনো জায়গাই বাদ দিলো না।

বৃথা চেষ্টা। পাওয়া গেল না হার।

কিশোরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো উইল। 'এখনও বলো, কোথায় রেখেছো?'

'থাকলে তো পেয়েই যেতেন,' জবাব দিলো কিশোর। 'সত্যি কথা বলবো? বাক্সটা আগেই খুলে দেখেছি আমি। খালিই ছিলো।'

'ধরে ধোলাই লাগান না…' হিসিয়ে উঠলো বেন।

'এই, চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো উইল। কিশোরের দিকে ফিরলো, 'খালি ছিলো? সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, চলো আমাদের সঙ্গে নিচে,' কিশোরের হাত ধরে টানলো উইল। 'মিসেস কুইল বলবে, কোথায় রেখেছে হারটা।'

নিচে থেকেই ওপরের চেঁচামেচি শুনেছেন মিসেস কুইল। ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। চোরেরা কিশোরকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর চেহারা।

সামনে এসে দাঁড়ালো উইল। রাগে মুখ কালো। 'চিলেকোঠায় গহনার বাক্স পেয়েছে এই ছেলে। ভেতরে কিছু নেই।'

ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকে উঠলেন মিসেস কুইল, কিন্তু হজম করে নিলেন সেটা, চেহারায় ফুটতে দিলেন না। নিশ্চয় ছেলেটা কোনো চালাকি করেছে। যেভাবেই হোক, তাকে বাঁচাতেই হবে, সেই সঙ্গে হারটা।

'রাখলে তো থাকবে?' হেসে উঠলেন মিসেস কুইল। 'আমি তোমাদের মতো গাধা নাকি? তা, এই ছেলেটা কে? তোমাদের দলের নাকি? হ্যাঁ, বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছি কয়েকদিন। ইনফর্মার? সে-ই বুঝি বাড়ির কোথায় কি আছে তোমাদেরকে জানিয়েছে? ভালো। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিলো। তোমরা শোবার ঘরে চলে যেতেই জানালা দিয়ে ঢুকলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো হারটা কোথায়? এমন ভাব দেখালো যেন তোমাদের কেউ নয়। বলে দিলাম। হাহ্ হাহ্!'

'ও আমাদের দলের নয়!' চেঁচিয়ে উঠলো কিউট। 'তবে হার চুরি করতে যে এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হুঁ, বোঝা যাচ্ছে, পায়নি।'

উইল আগেই বিশ্বাস করেছে, হারটা কিশোর পায়নি, এখন শিওর হলো। তার হাত ছেড়ে দিলো। মিসেস কুইলের দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে বললো, 'দেখুন, এতোক্ষণ ভালোভাবেই বলেছি। মস্কারি করেছেন আমাদের সঙ্গে। ভালো চাইলে এখনও বলুন কোথায় রেখেছেন। নইলে সেলারে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবো। যতোক্ষণ না বলবেন, খাওয়া-পানি বন্ধ।'

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন মিসেস কুইল। শেরিফের আসতে আর কতো

দেরি? যতোক্ষণ না আসে, আটকে রাখতে হবে চোরগুলোকে।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলেন তিনি। 'যাও,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'তোমরাই জিতলে। বাক্সটা চিলেকোঠায় রেখেছিলাম শুধু তোমাদের মতো শয়তানদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে। হারটা বের করে তুলো আর পলিথিনে পেঁচিয়ে লুকিয়ে রেখেছি অন্য জায়গায়...'

'কোথায়?' অস্থির হয়ে উঠেছে কিউট। 'সেটাই তো জানতে চাইছি। অতো ভণিতা করছেন কেন?'

'যাও, মেজাজ দেখালে বলবোই না। যা খুশি করো আমার,' রাগ দেখালেন মিসেস কুইল।

অভিনয় দেখে পেট ফেটে হাসি আসতে চাইলো কিশোরের, অনেক কষ্টে সামলালো। সিনেমায় নামলে নাম করতে পারতেন মহিলা।

'এই, তুমি চুপ করো,' কিউটকে ধমক দিলো উইল। 'যা বলার আমিই তো বলছি। বলুন, ম্যাডাম, কোথায় রেখেছেন। না বললে অযথা কষ্ট পাবেন। হার না নিয়ে যাবো না আমরা। বলুন।'

'আমার শোবার ঘরের ফায়ার প্লেসের চিমনির ভেতরে,' বললেন মিসেস কুইল। 'ভেতরে ঢুকতে হবে একজনকে। হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে ঢুকবে। ডান দিকের ইঁটের সারির নিচ থেকে গুণে গুণে ওপর দিকে উঠবে, উনিশ নাম্বার ইঁটটা খুললে ছোট একটা গর্ত বেরোবে। তার মধ্যে রাখা আছে।'

'ছেনি-হাতুড়ি কোথায় পাবো?'

'চুরি করতে এসেছো, যন্ত্র নিয়ে আসোনি? আমি তো জানতাম চোরেরা যন্ত্রপাতি সব নিয়েই আসে।'

'ছেনি–হাতুড়ি কোথায় পাবো?' একই স্বরে বললো আবার উইল।

'গ্যারেজে।'

রওনা হতে যাবে কিউট আর বেন, ডেকে ফেরালো উইল। 'এই ছেলেটাকেও বাঁধো। ছেড়ে দিলে গিয়ে আবার কোন্ বিপত্তি ঘটায়। পরে শেরিফ এসে খুলতে পারবে দু'জনকেই।...ভয় নেই, ম্যাডাম, শেরিফকে আমিই ফোন করে দেবো। হাহ্ হাহ্ হা!'

মিসেস কুইলের পাশেই আরেকটা চেয়ারে শক্ত করে বাঁধা হলো কিশোরকে।

'আমাকে চড় মারার শোধটা নিয়ে নিই, মিস্টার উইল?' অনুনয় করলো বেন।

'না!' কড়া গলায় বললো উইল। 'জলদি যাও। কাজ শেষ করো।'

বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল বেন।

হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল তিন চোর। ঠুকঠাক আওয়াজ শুরু হলো।

ফিসফিস করে বললেন মিসেস কুইল, 'হারটা পাওনি?'

'পেয়েছি। ভাববেন না, নিরাপদেই আছে। কিন্তু ওদেরকে যে মিথ্যে কথা

বললেন, পাবে তো না। শেষে কি করে বসে...'

'ইতিমধ্যে হয়তো শেরিফ এসে যাবে।'

'হয়তো। আসার তো কথা ছিলো আরও আগেই। কেন যে এতো দেরি করছে?'

পনেরো

বসে আছে দুই বন্দি।

ওপর তলায় ঠুকুর-ঠাকুর চলেছে।

আর কতোক্ষণ! ইস্, আর কতোক্ষণ! এখনও আসছে না কেন শেরিফ?

দু'জনে একই কথা ভাবছে।

'খুব শক্ত,' কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন মিসেস কুইল, আসলে নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'ভাঙতে সময় লাগবে। আর যা আওয়াজ করছে, গাড়ির শব্দও শুনতে পাবে না। কিন্তু আসছেন না কেন ওরা এখনও?'

চুপ করে রইলো কিশোর। ও নিজেও বুঝতে পারছে না, এতো দেরি হচ্ছে কেন?

প্রতিটি মিনিটকে একেকটা যুগ বলে মনে হচ্ছে।

ঠকঠক থেমে গেল। বোধহয় ইঁটটা খুলে ফেলেছে।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেরিফ না এলে মুশকিল হয়ে যাবে।

এই সময় আরেকটা শব্দ কানে এলো কিশোরের, মনে হলো বাগানের দিক থেকে। ধক্ করে উঠলো বুক। তবে কি জিনা এলো!

হ্যাঁ, জিনাই। খোয়া বিছানো পথ ধরে আগে আগে হাঁটছে, পেছনে ডেপুটি আর তাঁর লোকজন। রবিন আর মুসাও আছে।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল সদর দরজার পাল্লা। নিজের লোকদের বললেন ডেপুটি, 'এসো।' ছেলেদেরকে বললেন, 'তোমরা বাইরে থাকো।'

নিচতলার বসার ঘরে ঢুকলেন ডেপুটি আর তাঁর সহকারীরা। চেয়ে রইলেন চেয়ারে বাঁধা দুই বন্দির দিকে।

'কুইক!' বলে উঠলেন মিসেস কুইল। 'আমাদেরকে পরেও খুলতে পারবেন, আগে গিয়ে ব্যাটাদের ধরুন। শব্দ শুনছেন না? ওপর তলায়, আমার শোবার ঘরে।'

পিস্তল হাতে নিয়ে দৌড় দিলেন ডেপুটি। পেছনে সহকারীরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন শোবার ঘরে।

আইনের লোক দেখে থমকে গেল কিউট আর উইল। যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে। হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো তাদের হাতে।

চিমনির ভেতর থেকে বের করে আনা হলো বেনকে। কালিঝুলি মাখা ভূত যেন একটা।

বাইরে ওদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে মুসা, রবিন আর জিনা।

'কিশোর কই?' বললো জিনা। 'আমি শিওর, ভেতরে ঢুকেছে। নইলে এতোক্ষণে চলে আসতো এখানে। চলো, ঢুকে পড়ি।'

সদর দরজায় উঁকি দিয়েই কিশোর আর মিসেস কুইলকে দেখতে পেলো সে। 'ওই তো।'

তিনজনেই ঢুকে পড়লো ঘরে।

মুসার কাছে ছুরি আছে। বাঁধন কাটতে শুরু করলো।

'ওহ্, মাই ডিয়ার!' চোখ ছলছল করছে মিসেস কুইলের। 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো তোমাদেরকে! আর সেদিন কি অপমানটাই না করলাম...'

চারপাশে তাকাচ্ছে জিনা। 'রাফি কোথায়, কিশোর? ওকে মারেটারেনি তো?'

জবাব দেয়ার সময় পেলো না কিশোর। তার আগেই তিন চোরকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন শেরিফ আর তাঁর লোকেরা।

'এই যে,' মিসেস কুইলের দিকে চেয়ে বললেন ডেপুটি, 'সাহেবদের ধরে নিয়ে এলাম। ছেলেগুলোকে ধন্যবাদ দিন, ম্যাডাম। ওদের জন্যেই ধরতে পারলাম।'

কিশোরের দিকে চেয়ে আছে তিন চোর। বিস্মিত। বাঁধন কাটা, মিসেস কুইলের পাশের চেয়ারেই আরাম করে বসে আছে।

ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরে হেসে মাথা নাড়লো কিশোর, 'না, ভাইয়েরা, আমি চোর নই। গোয়েন্দা,' রবিন, মুসা আর জিনাকে দেখালো। 'এরাও গোয়েন্দা, আমার বন্ধু।'

বিষ ঝরছে বেনের চোখ থেকে।

ব্যর্থতার গ্লানিতে কালো হয়ে গেছে কিউটের চেহারা। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'হারটা কি করেছো?'

মুচকি হাসলো কিশোর। নাটক করার সুযোগ পেয়ে গেছে। বললো, 'আমার কাছে নেই মিসেস কুইলের হার...'

'কি বলছো...,' প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন যেন মিসেস কুইল। 'তুমি না বললে...'

'এই বাড়িতেই নেই,' মিসেস কুইলের কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর।

প্রায় একইসাথে কথা শুরু করলো সকলে। নানারকম প্রশ্ন। কিন্তু জবাব পেলো না।

হাসতে শুরু করলো কিশোর। কোলাহল থামানোর জন্যে রাজনৈতিক নেতার ভঙ্গিতে হাত তুললো। তারপর মিসেস কুইলের দিকে ফিরে বললো, 'এ-বাড়িতে নেই বটে, তাই বলে চুরিও হয়নি। তখনই তো বলেছি, নিরাপদে আছে।'

কিশোরের স্বভাব ভালোমতোই জানা আছে তার বন্ধুদের। নাটক করা আর লেকচার দেয়ার সুযোগ পেলে সহজে তা মিস করে না গোয়েন্দাপ্রধান। চুপ করে রইলো ওরা।

'হারটা আছে গোবেল ভিলায়,' বোম ফাটালো যেন কিশোর। 'আর মিসেস কুইল যদি কিছু মনে না করেন, আপনার গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে চলুন। জিনিস ফেরত নিয়ে আসবেন।'

কিছুক্ষণ পর অন্ধকার গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চললো দুটো গাড়ি। আগেরটা পুলিশের, পেছনেরটা মিসেস কুইলের।

গোবেল ভিলার সামনে এসে থামলো দুটো গাড়িই। এতো রাতে পুলিশের গাড়ি দেখে অবাক হলেন মিস্টার আর মিসেস পারকার। তারপর তিন গোয়েন্দা আর জিনাকে পেছনের গাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে বুঝলেন, কিছু একটা ঘটিয়েছে।

টর্চ হাতে রাফিয়ানের ঘরের দিকে এগোলো কিশোর। ডাকলো, 'রাফি, বেরিয়ে আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো রাফিয়ান। জিনাকে দেখে লাফ দিয়ে গিয়ে দুই পা তুলে দিলো তার কাঁধে। গাল চেটে দিতে লাগলো আনন্দে। কিশোর ছাড়া, অবাক হয়ে দেখলো সবাই, কুকুরটার গলায় পরা হার। টর্চের আলোয় সবুজ দ্যুতি ছড়াচ্ছে পান্নাগুলো।

হারটা খুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিলো কিশোর, 'আপনার হার, মিসেস কুইল। আর কোনো উপায় না দেখে রাফির গলায়ই পরিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে। রাফি আমাদের খুব ভালো বন্ধু। যা বলি, তাই শোনে।'

'হুফ!' মাথা নাড়লো রাফিয়ান।

এরপর আর কি?

ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে জুটলো অনেক ধন্যবাদ আর প্রশংসা।

আসামীদের নিয়ে চলে গেলেন ডেপুটি।

মিসেস কুইল চলে গেলেন তাঁর বাড়ির দিকে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার পারকার, 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে কতোবার মানা করেছি, কানেই যায় না। কোন দিন বিপদ বাধাবে···মরতেও পারে! হুঁহ্!' দুপদাপ পা ফেলে চলে গেলেন তিনি।

'কি করবি এখন?' জিজ্ঞেস করলেন জিনার মা। 'বাড়ি তো মেরামত হয়ে গেছে। ঘরেই থাকবি?'

'না, মা,' জবাব দিলো জিনা। 'আমাদের মালপত্র সব রয়ে গেছে দ্বীপে, ওখানেই বরং চলে যাই। দু'তিন দিন আর আসছি না। বাবা একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক, তারপর ফিরবো।'

– ঃ শেষ ঃ–